বিদ্রোহী প্রাচ্য

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় লাভের পর সমস্ত এসিয়াতে একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে। জাপানের জয়ের পরই তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া, চীন ও ফিলিপাইন পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত এসিয়াটিক জাতির মধ্যেই একটা বিদ্রোহের আবহাওয়া দেখা দেয়। তুরস্ক, পারস্য, ভারত, চীন, ফরাসী হিন্দু-চীন, ফিলিপাইন, যাভা প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী দলের জন্ম হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। বৃদ্ধ এসিয়ার জীর্ণ দেহে নব যৌবনের লক্ষণ দেখা দিল—দুনিয়ার শ্বেত জাতি সমূহের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। আজ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে এসিয়ার উপর ইউরোপের প্রভুত্বের দিন অবসানের পথে।

এই সময় শ্বেত জাতির মধ্যে এসিয়া সম্বন্ধে নানা আলোচনা দেখা দিল। একদল নানাভাবে এসিয়াবাসীর নিন্দা ও অযোগ্যতা প্রচারে রত হইল। চিরোল, সিডেনহাম প্রভৃতি এই দলের। আমেরিকার গ্রাণ্ট (Madison Grant), ইংল্যাণ্ডের ম্যাক ডুগাল (Mac Dougal) প্রভৃতি লেখকগণ বিজ্ঞানকে বিকৃত করিয়া ইহাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, শ্বেত জাতিই দুনিয়ার প্রভু হইবার উপযুক্ত। ম্যাক ডুগালের ভাষায় 'Nodric race'

বা উত্তরীজাতি ও গ্রাণ্টের ভাষায় 'Great race' মহান জাতি,—এরাই বিশ্বের মালিক থাকা উচিত। অ-শ্বেত জাতি সবই গ্রাণ্টের ভাষায় 'the little dark man'.

অপরদিকে Dean Inge, Lothrop Stoddard, Upton Close কাঁদুনি আরম্ভ করিলেন,—অ-শ্বেত জাতির এই জাগরণের ফলে দুনিয়ার সভ্যতা বিপন্ন হইল—যে করিয়া হউক, এ সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া দুনিয়ার চরম অমঙ্গলকে রোধ করিতেই হইবে। পীত জাতির হাতে আমেরিকার আসন্ন বিপদের দুর্ভাবনায় সমাজবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া Ross অস্থির হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে Bertrand Russel জননবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া জাপানকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, হয় জাপানকে প্রজনন হ্রাস করিয়া সাম্রাজ্য-লিপ্সা বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা শ্বেত জাতির প্রাচ্য প্রাধান্যে আঘাত দিলে তাহাদের সহিত সংঘর্ষে তাহার বিনাশ অনিবার্য্য। হাইণ্ডম্যান (Hyndman), পুটনাম উইল (Putnam Weale) এবং অধুনা প্রকাশিত 'Asia Reborn' গ্রন্থের লেখক হ্যারিসন, এসিয়ার এই নব জাগরণের প্রতি কতকটা সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

কিন্তু ঐ সব গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ইউরোপীয় দৃষ্টিতে লেখা। ইউরোপীয় জাতিসমূহ Pan-Islam, Yellow-peril প্রভৃতি বুলির সৃষ্টি করিয়া একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সব দিক দিয়া দেখিলে আজি জগত সভ্যতার প্রকৃত বিপদ হইল White-peril। সমস্ত দুনিয়া আজ শ্বেত জাতিসমূহের

পদানত; বিশ্বের সমস্ত সভ্যতার দ্বার আজ তাহারা রোধ করিয়া, তাহাদের ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতাকে সজীবতার মুখোস পরাইয়া সর্ব্বত্র চালাইতে চাহিতেছে; এক কথায় সমস্ত দুনিয়াটাকে তাহারা শ্বেত জাতির বাসভূমি করিতে ব্যস্ত।

আজ আমরা একটা যুগ-সন্ধিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যুগে যুগে সভ্যতার বিবর্ত্তন হইয়াছে—৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে এসিয়ার সভ্যতাকে উচ্ছেদ করিয়া ইউরোপ তাহার সভ্যতার পত্তন করে। তাহাতে জগতের মঙ্গলই হইয়াছিল। কিন্তু আজ আবার জগতের কল্যাণের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতাকে উচ্ছেদ করা দরকার—ইউরোপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ভিন্ন আজ জগত-সভ্যতার উন্নতি অসম্ভব। এসিয়াকে আজ নূতন সভ্যতার পত্তন করিতে হইবে – তারই সূচনা নানা ভাবে দেখা দিতেছে।

এই যে বিদ্রোহ, ইহা আজ এসিয়ার বা সমস্ত প্রাচ্যের মর্ম্ম কথা। এই বিদ্রোহই নূতন সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করিয়া কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে বলিয়া জানি না। অনেক দিন যাবতই এই জাতীয় একখানা বই লেখার ইচ্ছা ছিল। তাই ১৯২৩ অব্দে 'বিদ্রোহী প্রাচ্য' নামে একখানা বই লিখিতে আরম্ভ করি। সে বই ২।১ ফর্ম্মা ছাপা হওয়ার পরই জেলে যাইতে হয়। কাজেই বই ছাপা বন্ধ থাকিল। জেলে যাইয়া বইখানা আবার নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করি। জেলে

নানা অসুবিধার মধ্যেও অবসর ছিল যথেষ্ট, তাই পুস্তকের আয়তন পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা বড় হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া বইখানাকে স্থানে স্থানে অদল বদল করিয়াছি এবং ছাপাইবার মুখে বইখানিতে ১৯২৯ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।

এসিয়ার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা জ্ঞানস্পৃহা ও মমত্ব বোধ জাগানো আজ বিশেষ দরকার বলিয়া মনে করি। এসিয়ার জাতিসঙ্ঘ গঠনের জন্য এটা অপরিহার্য্য। 'বিজয়ী প্রাচ্য' ও 'ভাবী এসিয়া' নামক দুই পুস্তকে এসিয়ার অতীত ও ভবিষ্যত লইয়া আলোচনা করিয়াছি; এ পুস্তকে এসিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনের নবোন্মেষের পরিচয় যথাসাধ্য দিয়াছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আরও আলোচনা হওয়া উচিত। সে রকম একটা স্পৃহা জাগাইতে পারিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

সূচী পত্র

মানচিত্র

চিত্র
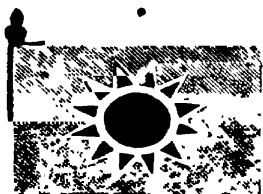
বিদ্রোহী প্রাচ্য

প্রাচীন ইতিহাস

জগতের প্রাচীনতম সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে চীন অন্যতম। বাবিরুস (Babylon) ও অসুর (Assyria) সভ্যতার ইতিহাস আজ নিতান্তই প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। মিশর ও পারস্য তাহাদের নিজ নিজ প্রাচীন সভ্যতার ধারা হারাইয়া ও আরবের অনুকরণ করিতে গিয়া, নিতান্তই অর্ব্বাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীনই তাঁহাদের নিজ নিজ প্রাচীন সভ্যতার ধারা বাহিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মিশরের 'Book of the Dead' বা পারস্যের জেন্দাবেস্তার সহিত মিশরীয় বা পারসিকদের জীবন-

গতির কোন যোগই আজ নাই। কিন্তু চীনের লোটসা বা কনফুসীয়াস আজও চৈনিকদের জীবনগতি নিয়মিত করেন; ভারতের বেদ-পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, বেদব্যাস-বুদ্ধ আজও ভারতবাসীর হৃদয়-মন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

তাই বর্ত্তমান চীনকে বুঝিতে হইলে, প্রাচীন চীনের ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটা কথা জানা দরকার।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দীতে য়াও এবং শান (Yao & Shun) নামে দুইজন আদর্শ সম্রাট চীনে রাজত্ব করিতেন। অবশ্য তখনকার চীন বর্ত্তমান চীনের মত এত বড় ছিল না। সিন্ধু ও গঙ্গার তীর যেমন ভারতীয় সভ্যতার আদিভূমি, তেমনি চৈনিক সভ্যতার আদিভূমি ছিল পীতনদী (Yellow River)। জগতের আদিমতম সভ্যতার বিকাশ হয় বড় বড় নদীর তীরে—মিশরে নীল নদীর পারে, বাবিরুষ ও এসিরিয়াতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, ভারতে হয় সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে এবং চীনে হয় পীত নদীর তীরে। পারসিক সভ্যতা ইহাদের অনেক পরে এবং গ্রীস, রোম আরও পরে।

এই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলিয়া বিশেষ লাভ নাই—চীনের সঠিক ইতিহাস আরম্ভ হয় খৃঃ পূঃ সহস্রাব্দীর শেষভাগ হইতে। এই সময় চাও (Chou) বংশ (খৃঃ পূঃ ১১২২—২৪৯) চীনে রাজত্ব করিত। এই সময় সম্রাটদের ক্ষমতা খুবই কম ছিল—তাঁহাদের অধীন সামন্ত ভূস্বামীদের হাতেই

প্রকৃত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সম্রাটের অন্যদিকে পদগৌরব যথেষ্টই ছিল —তিনি ছিলেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্র (son of Heaven)। সম্রাট ভিন্ন আর কেহ ঈশ্বরের (টেইন—Tien) পূজা করিতে পারিতেন না—তিনি ছিলেন যজ্ঞের হোতা। কনফুসিয়াসের পূর্ব্ব হইতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং শেষ মাঞ্চু সম্রাটের আমলে (১৯১১ খৃঃ অব্দ) গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এবং তাহার পরও কিছুদিন, ইহা প্রচলিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ২২১ অব্দে শিহহুয়াঙ্গটি (Shih-Huang-Ti) সম্রাট হন। তিনটী কাজের জন্য তিনি বিশেষভাবে বিখ্যাত হইয়াছেন—(১) হূণ আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষা করার জন্য বিখ্যাত চৈনিক প্রাচীর নির্ম্মাণ। এই প্রাচীর আজও জগতের একটা দেখিবার বস্তু। (২) সামন্ত ভূম্যধিকারীদের আধিপত্য ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। (৩)নিজকে চীনের প্রথম সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিবার ইচ্ছায়, তিনি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দেন। অবশ্য তাঁহার এই আদেশ পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয় নাই; কিন্তু তবুও বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি নষ্ট হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ ২০৬ হইতে ২২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হান বংশ (Han) রাজত্ব করেন। হান-আমলে চৈনিক সাম্রাজ্যের অনেক বিস্তৃতি হয়। ভারত, পারশ্য ও রোমীয় সাম্রাজ্যের সহিত চীনের যোগও এই সময় স্থাপিত হয়। ইহার পর কয়েকটি স্বল্প-কালস্থায়ী রাজবংশের পর, টাঙ্গ বংশ ৬১৮ হইতে ৯০৭ খৃঃ

অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। এই রাজবংশের শাসনে চীন সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি হয় এবং সাহিত্য ও শিল্পাদির অনেক উন্নতি হয়।

ইহার পর মোগলগণ চীনদেশ জয় করে। সুঙ্গবংশীয় ৯৬০—১২৭৭) রাজাদের পরাজিত করিয়া চেঙ্গিস খানই মোগলবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চীন, পারশ্য, রুষিয়া প্রভৃতি দেশ তিনি জয় ও লুণ্ঠন করেন। চেঙ্গিস যে দেশ জয় করিয়াছেন, সেখানেই অত্যাচারের স্রোত বহাইয়াছেন।

তিনি মার্ভ * (Merv) জয় করিয়া, সেখানে ৭ লক্ষ লোক হত্যা করেন। অনেক লোক মৃতদেহের নীচে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাই নিশাপুর † (Nishapur) জয় করিয়া তিনি হুকুম দেন যে, প্রত্যেক নগরবাসীর মাথা কাটিয়া স্তূপ করিতে হইবে। মস্কো ও কিয়েফেও § এইপ্রকার অত্যাচার হইয়াছে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী জয় করিয়া, সেখানেও তিনি বড় সদয় ব্যবহার করেন নাই।

এই সব অত্যাচারের কাহিনী পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অত্যাচারে ও নর-হত্যায় চেঙ্গিস খাঁর জোড়া পাওয়া যায় না। আলেকসন্দর (Alexander), পিজারো, কার্টেস,

* বর্ত্তমান তুর্কিস্তানের অন্তর্গত।

† নিশাপুর বর্ত্তমান পারস্যের অন্তর্গত।

§ কিয়েফ বর্ত্তমান উক্রেনের অন্তর্গত।

ভাস্কোডিগামা বা বর্ত্তমান যুগের ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যাচারে বা নর-হত্যায়, চেঙ্গিসের চেয়ে ছোট নয়। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বার্ট্রেণ্ড রাসেল এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The times of Genghis Khan remind one of the present day, except that his methods of causing death were more merciful than those that have been employed since the Armistice."—Problems of China P. 29

পোপ ও ফরাসীরাজ সেণ্টলুই (St. Louis) পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে তাহার সহিত সন্ধি ও মিত্রতা স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ১২২৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার নাতি কাব্লুই খানই মোগলবংশের প্রথম চৈনিক সম্রাট বলিয়া মান্য হন। কাব্লুই মোঙ্গালিয়া হইতে পিকিংএ নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু চেঙ্গিস মঙ্গোলিয়া হইতেই চীন শাসন করিতেন। কাব্লুইও পিতামহের মত একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি দুইবার জাপান জয় করার চেষ্টা করেন—কিন্তু কতকটা ঝড়ে এবং কতকটা জাপানীদের বীরত্বে তিনি ব্যর্থকাম হন। তিনি শুধু বীর ছিলেন না—রাজ্যের উন্নতির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। পিকিংএ তিনি এক প্রাচীর নির্ম্মান করেন। ঐ প্রাচীরের উপর তিনি এক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত

দুইটি জ্যোতিষিক যন্ত্র এই মান-মন্দিরে ছিল—বক্সার বিদ্রোহের পর জার্ম্মেণগণ এই দুইটী নিজদেশে লইয়া যায়। ভার্সেল সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে এই যন্ত্র দুইটি বোধ হয় ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

চৈনিকদের একটা বিশেষ গুণ এই যে, সহজে তাহারা অন্যের নিকট নিজেদের সভ্যতাকে বিসর্জ্জন দেয় না, বরং অপরকে অতি সহজেই তাহাদের সভ্যতার বশ করিতে পারে। মোগলগণ বিজয়ীভাবে আসিয়াও শীঘ্রই চৈনিক সভ্যতা গ্রহণ করিল। পরবর্ত্তী যুগে মাঞ্চুগণও কিছু দিনের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে চৈনিক হইয়া গিয়াছে।

মাঞ্চুদের চীন জয়

১৩৬৮ খৃঃ অব্দে শেষ মোগল সম্রাটকে পরাজিত করিয়া চু-য়িয়েন-চাং সম্রাট হইলেন। ইনি একজন চৈনিক কৃষকের পুত্র। এই ভাবে বিখ্যাত মিঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। চৈনিকগণ এই রাজবংশকে সব চেয়ে আপনার ও গৌরবের মনে করে।

বহু বৎসর গৌরবের সহিত রাজত্ব করার পর, মিঙ্গ-রাজাদের পতন আরম্ভ হয়। ১৬৩৫ অব্দে মাঞ্চুগণ মঙ্গোলিয়া জয় করিল। মিঙ্গ রাজাদের ও তাহাদের অনুগৃহীত খোজা (eunuch) সরদারদের অত্যাচারের ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। তার উপর আবার দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন দেখা দিল।

১৬৪৪ অব্দে সেন্নি প্রদেশের লি-ঝু-সেঙ্গ শেষ মিঙ্গ-রাজকে পরাজিত করিলেন এবং তিনি পিকিং দখল করিয়া সম্রাট হইলেন। সম্রাটের এক প্রিয় খোজার বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই পিকিং সহজেই বিদ্রোহীর হাতে গেল। দুঃখ ও অপমানে তিনি আত্মহত্যা করিলেন; কিন্তু তাহার সেনাপতি উ-সান-কুই মাঞ্চুদের সহিত যোগ দিয়া লি-ঝু সেঙ্গকে পরাজিত করিলেন। লি-ঝু-সেঙ্গ ছিলেন জাতিতে চৈনিক ও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত করার পর উ-সান-কুই বুঝিলেন, বিদেশী মাঞ্চু-শাসন মানিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। মাঞ্চুগণ রাজা হইয়াই চৈনিকদিগকে দাসের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। এই সময় হইতে মাঞ্চুদের অনুকরণে, চৈনিক পুরুষগণও সমস্ত মাথা কামাইয়া, মাথায় বেণী রাখিতে বাধ্য হয়। চৈনিক রমণীরা বরাবরই ছোট বয়স হইতে পা বাঁধিয়া রাখিত; মাঞ্চুগণ হুকুম দিল, সেই প্রথা রহিত করিতে পারিবে-না। প্রকৃত পক্ষে প্রথম মাঞ্চু সম্রাট শান চিহ (Shan Chih) ১৬৬১ অব্দে সম্রাট হন। এই সময় হইতে মাঞ্চু অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই অত্যাচার চরম সীমায় পৌছিল রাণী-মাতার আমলে (১৮৭৫-১৯১২)। রাজ-অত্যাচারের উপর বিদেশীদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন চীনকে মৃত্যুর পথে লইয়া চলিল। তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার-স্বরূপ চীনে বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হইল।

বৰ্ত্তমান চীন

১৯১২র বিদ্রোহ।

জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় চীনের মত এত বিদ্রোহ হয় নাই। চীনের প্রাচীন ধৰ্ম্মগ্রন্থ মতে কেবল ধৰ্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিই রাজা হন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহারা বিশ্বাস করিত যে, "যে সম্রাটের সংগুণ নাই, ভগবান তাঁহাকে সিংহাসনে রাখিবেন না।" এই বিশ্বাসের বশবৰ্ত্তী হইয়া, চীনেরা অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে অন্যূন ২৪ বার বিদ্রোহ করিয়াছে। কিন্তু চীন বরাবরই "মানুষের শাসনে" (rule of men) অভ্যস্ত—আইন কানুনের শাসন ((rule of Law) চীন বুঝিত-না। তাই সব বিদ্রোহই হইয়াছে অত্যাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে, শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে নহে। বিদ্রোহ করিয়া যিনি সফল হইতেন, তিনিই সম্রাট হইতেন এবং তিনি তাঁহার

অপ্রতিহত ক্ষমতা লইয়াই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন প্রয়াসই হয় নাই। চীনের জনসাধারণ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চাহিত না এবং বিদ্রোহও জনসাধারণ করিত না। বিদ্রোহ করিত কোন শক্তিশালী পুরুষ। এই নূতন সম্রাট প্রায়ই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন এবং কনফুশীয় শাস্ত্র অনুসারে দেশ শাসন করিতেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যাইত তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাঁহার মত উপযুক্ত হইতেন না।

১৯১২ খৃঃ এর বিদ্রোহকেও ঠিক জনসাধারণের বিদ্রোহ বলা যায় না। 'ফরাশী বিপ্লব' বা 'বলসেভিক বিদ্রোহের' মত ইহাকে অনুগৃহীত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর (bourgeois) বিরুদ্ধে, নিগৃহীত নিম্ন ও শ্রমিক শ্রেণীর (proletariat) বিদ্রোহ বলা যায় না। বরং ইটালীয় বিদ্রোহের সহিত ইহার তুলনা করা চলে ; অর্থাৎ এই বিদ্রোহের কারণ জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা নয়—এই বিদ্রোহের কারণ রাজশক্তির অত্যাচার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চৈনিক বিপ্লব হইতে এই বিপ্লবের পার্থক্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লব-নেতাদের মত এই বিপ্লবের নেতা সম্রাট পদাভিলাষী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নহে ও মাত্র একজনও নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত গণতন্ত্র-আদর্শী কতিপয় লোক এই বিপ্লবের মূল। অবশ্য মাঞ্চু রাজারা তাঁহাদের অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সমস্ত জনসাধারণেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় নেতার উত্তেজনায় বহু লোক

বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু এই বিপ্লবকে তাহারা তাহাদের আপনার জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আরও দুইটি কারণ ছিল :—(১) বিদেশী বলিয়াও চৈনিকগণ মাঞ্চুদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল (২) কিন্তু অন্য একটি প্রধানতম কারণ ছিল, মাঞ্চুদের অকর্ম্মণ্যতার ফলে ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ ক্রমে চীনের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিতেছিল। যুবক ও শিক্ষিত চৈনিকগণ দেখিল মাঞ্চুগণের নিকট হইতে বিদেশীরা যে ভাবে নানা অধিকার ও দাবী আদায় করিতেছে, তাহাতে হয়ত শীঘ্রই একদিন স্বাধীন চীন-রাষ্ট্রের অস্তিত্বই লোপ পাইবে। তারপর, যে দিন ক্ষুদ্র জাপান বিরাট রাষিয়াকে পরাজিত করিল, সেদিন চীনও ভাবিল "তবে ত' নিজের ঘর সামলাইতে পারিলে, আমিও বিদেশীদের পরাজিত করিতে পারি।" কিন্তু মাঞ্চু রাজশক্তি খর্ব্ব করা ভিন্ন কোন জাতীয় সংস্কারই সম্ভব না। তাই মাঞ্চু-সরকার উচ্ছেদের জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সান-ইয়াৎ-সেনই বিপ্লববাদী তরুণ দলের নেতা ছিলেন। সান গুপ্ত সমিতি করিয়া যড়যন্ত্র ও বিপ্লবের বার্ত্তা জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে ছড়াইতে লাগিলেন। বহুবার বিদ্রোহ-চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া, ডাঃ সান আমেরিকায় আত্মগোপন করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় ১৯১১ খৃঃ অক্টোবর মাসে উচাঙ্গে-হু প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে গোপনে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু এই ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সরকার

বিপ্লববাদী ষড়যন্ত্রকারীদের বন্দী করিয়া হত্যা করে। নেতাদের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরই অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা বেপরোয়া হইয়া সহর আক্রমণ ও দখল করিল। শাসনকর্ত্তা (Viceroy) বিপদ দেখিয়া পলায়ন করিলেন এবং সেই প্রদেশের অধিকাংশ সৈন্যগণও বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিল। পেকিন হইতে হইতে সম্রাট সেনাপতি ইন চেঙ্গকে (Yin Chaing) ৩০০০ হাজার সৈন্য সহ বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত হুপে প্রদেশ বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিল। অন্যান্য প্রদেশও এই বিদ্রোহে ক্রমে ক্রমে যোগ দিল।

অনেকের ধারণা আছে, গুপ্ত সমিতি করিয়া বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ইটালী, চীন, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিপ্লবের মূলে সেই সেই দেশের গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টা। দেশের জনসাধারণ যখন দেশ সম্বন্ধে উদাসীন এবং সরকার 'আইন ও শৃঙ্খলার' (Law and order) দোহাই দিয়া যখন জাতি বা দেশের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করে, তখন স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীদের উদ্বোধিত করিতে গুপ্ত সমিতি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। গুপ্তভাবে থাকিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের যুবক ও জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বার্ত্তা ও অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করে। গোপনে পুস্তিকা ও লিপিকা (leaflet) দ্বারা বা মৌখিক আলাপে, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রচার করে.

এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে রাজশক্তির হাতে নিজেদের লাঞ্ছনা, লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত ও রাজশক্তির দ্বারা অতিরঞ্জিত, তাহাদের অসমসাহসিক কার্য্যাবলীর কাহিনী, নিজেদের চরিত্র-বল, ত্যাগ, লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি দ্বারা রাজশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা ও নিজেদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীরা দেশবাসীদিগকে আস্তে আস্তে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্ত্তে টানিয়া আনে। অবশ্য ইহা অতি সত্য যে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব ও কার্য্য গোপন রাখা সম্ভব বা দরকার নয়। বরং বিদ্রোহের প্রথম প্রয়াসের (তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হয়) সহিতই তাহাদের প্রকৃত গোপন ভাব চলিয়া যায়। একবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর সরকারের চক্ষুকে সর্ব্বদা ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় এবং সর্ব্ব ব্যাপারে জনসাধারণের চক্ষু এড়াইয়া চলা উচিত নয়। প্রায়ই একবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর জনসাধারণের ভয় অনেকটা দূর হয় এবং তাহারা স্বাধীনতার মর্ম্ম অন্ততঃ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করে। গোপনতাকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা সঙ্গত না, কিন্তু তখন জনসাধারণের সহিত মিশিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বাধীন ভাব আদর্শ প্রচার করাও বিশেষ দরকার হয়—নতুবা চিরকাল গোপনতার আশ্রয়ে থাকিলে জন-সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কখনও উগ্র হইয়া উঠে না ; তাহারা কেবল অল্প ত্যাগে স্বাধীনতা পাইবার সুযোগ তালাস করে এবং ইহার ফলে নানা অনাচার দ্বারা জাতীয় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে। প্রকাশ্য আন্দোলনের

উন্মত্ততার ভিতর দিয়া গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীরা বা অন্য স্বাধীনতা-বাদী নেতারা জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া ঠিক বিদ্রোহের মাঝে লইয়া যাইতে পারে এবং তাহাই সহজ ও সমীচীন। গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের নির্য্যাতন,নিজেদের সাহসিকতা,আদর্শ, ত্যাগ, চরিত্রবল প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীর চিত্ত জয় করিবে— রাজশক্তিকে জয় করিবে পরে দেশবাসীরা। দেশে যদি একবার গুপ্ত বিপ্লবের প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং তারপর যদি একবার উদ্দাম প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন জাতীয় কর্ম্মশক্তিকে গোপনতার পথে চাপিয়া রাখার অর্থ তাহার বিকাশে বাধা দেওয়া, জাতীয় শক্তিকে খর্ব্ব করা। অবশ্য তখনও হয়ত বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী করার জন্য মুষ্টিমেয় লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করিবে কিন্তু প্রকাশ্য আন্দোলনের সহিত যদি যোগ না থাকে, তবে তখন গুপ্ত সমিতির বিশেষ কিছু করিতে পারে না।

যাক্, এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক্। প্রদেশের বিপ্লব ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল, সম্রাট অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া দেশে এক প্রতিনিধি-সভার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন এবং এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিলেন। তিনি ইয়ান-সি-কাইকে আবার ডাকিয়া প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। ইয়ান-সিই নব্য চীন সৈন্যদলের প্রতিষ্ঠাতা। তাই সম্রাট আশা করিলেন, অন্ততঃ ইয়ান-সির খাতিরেও হয়ত সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিবে না।

ইয়ান বহু প্রদেশের লোকপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। সম্রাট ইহাও আশা করিলেন অন্ততঃ কয়েকটা প্রদেশ ইয়ানের খাতিরে বিদ্রোহী নাও হইতে পারে। কিন্তু ইয়ান আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধেক চীন অর্থাৎ ১৩টা প্রদেশ বিদ্রোহী হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই জনসাধারণ বিদ্রোহী-দের অভিনন্দন করিতেছে। কার্য্যতঃ উত্তর-বাহিনী সম্রাটের দলে রহিল এবং দক্ষিণ-বাহিনী বিদ্রোহীদের দলে আসিল। সম্রাটের সৈন্যদল শিক্ষায়, অস্ত্রেশস্ত্রে দক্ষিণের বিদ্রোহী সৈন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। তাই বিদ্রোহীরা ইয়ান-সি র নিকট হারিতে লাগিল।

কিন্তু তবু সম্রাট-পক্ষ সন্ধির প্রস্তাব করিল। অনেকে মনে করেন যে, ইয়ান যে বিদ্রোহীদের দমন না করিয়া সন্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, তাহার কারণ ইযানের ইচ্ছা ছিল ক্রমে নিজেই সম্রাট হন। ইয়ানের পরবর্ত্তী আচরণ হইতে, এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক বলা যায় ন। কিন্তু ইয়ান এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এই বিদ্রোহে বালক চীন-সম্রাটের ব্যবহার বেশ প্রসংশার্হ। প্রজাদের রক্তস্রোতে দেশকে ভাসাইবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। গণতন্ত্রী-দলও তাঁহার প্রতি সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে থাকার অনুমতি ও বাৎসরিক ৪০ লক্ষ টেল পেন্সন দিল।

চীনের বৈদেশিক সম্পর্ক

(১) হান বংশের সময় রোমক সাম্রাজ্যের সহিত চীনের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। রোমকগণ চীন হইতে রেশম নিত এবং সেই হইতে এই সম্পর্কের আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য জগতের সহিত চীনের এই সম্পর্ক বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের উদ্ভবের পর পথ-ঘাট বেশ নিরাপদ না থাকায়, এই ব্যবসায় ক্রমে কমিতে থাকে। কাব্লুই খানের আমলে ভিনিসীয় দূত মার্কো পলো (Marco Polo) চীনে আসিয়া অনেকদিন থাকেন এবং চীন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইহার পর আবার চীনের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে নেষ্টোরিয় (Nestorian) খৃষ্টধর্ম্ম চীনে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকিতে পারিল না।

জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য রোমান কেথলিক পুরোহিত-গণও চীনে বেশ একটু সমাদৃত হইত।

(২) ভাস্কোডিগামা যখন সমুদ্র-পথে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিল, তখন হইতেই বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লোলুপ হইয়া উঠিল। তখন হইতেই ভারত ও চীনের ধনরত্ন শোষণের জন্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহ রক্ত-পিপাসু রাক্ষসের ন্যায় তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ করে। পর্ত্তুগিজগণই চীনে প্রথম যায় এবং ১৫৫০ খৃঃ অব্দে মেকাও দ্বীপ দখল করিল। ফিলিপাইন দ্বীপ অধিকার করিয়া স্পেনীয়গণও চীনে প্রবেশের চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পর্ত্তুগিজদের জন্য তাহারা বিফল-মনোরথ হইল। ১৭শ ও ১৮ শতাব্দীতে রুষিয়ার সহিত চীনের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উভয়ের সীমা-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দুইটি সন্ধি হয়।

কিন্তু চীনের সব দুঃখের মূলে বড় বড় পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ। তাহারা ১৮ শ শতাব্দীতে চীনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজরাজ তৃতীয় জর্জ্জ চীন সম্রাট চিয়েন লাঙ্গের (Chien Lung) নিকট দূত পাঠান। চীন-সম্রাট তাঁহাকে জবাব দেন "আমাদের রাজ্যের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার জন্য, তুমি নম্রভাবে অনুমতি চাহিয়াছে সেই সঙ্গে তুমি কিছু উপঢৌকনও পাঠাইয়াছ। আমি তোমার দরখাস্ত পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের দেশের রেশম ও চীনাবাসন তোমাদের দরকার,—বেশ, সেই সবটা তোমরা ক্রয়

করিয়া নিতে পার; কিন্তু তোমার দেশের কোন দ্রব্যের আমাদের দরকার নাই। আমাদের আবশ্যকীয় সব দ্রব্যই দেশে হয়। তোমাদের গরীব সাগরবেষ্টিত দ্বীপটীর দুরবস্থার কথা মনে করিয়াই এই অনুমতি দিলাম।" পরিশেষে সম্রাট জানাইলেন "Tremblingly obey & show no negligence."

হায়, সেই একদিন গিয়াছে, যখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ প্রাচ্য দেশের রাজদরবারগুলিতে ভিখারীর বেশে আসিয়াছিল! আর আজ একদিন—এখন তাহারা প্রাচ্য জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রাচ্য দেশবাসীরা তাহাদের পদ লেহন করিয়া আজ কৃতার্থ হয়। অদৃষ্টের চাকা কি আবার ঘুরিবে না! আজ প্রাচ্যের এই অধঃপতন কেন? Bertrand Russel ইহার উত্তর দিয়াছেন "It is easier for an Englishman to kill a Chinaman than for a Chinaman to kill an Englishman. Therefore our civilisation is superior to that of China" Problems of China P. 52.

বিজ্ঞানের বলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নরহত্যার কায়দা-গুলি যেমন আয়ত্ত করিয়াছে, প্রাচ্যজাতিসমূহ তেমন পারে নাই। তাই প্রাচ্য বর্ব্বর ও অধঃপতিত। ইহার ব্যবস্থাও তিনি বাতলাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্যের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে একমাত্র পথ আছে 'to fight him with his own weapons' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, 'unless they (the Chinese) adopt some of our views to

some extent, we shall not respect them and they will be increasingly, unceasingly oppressed by foreign nations" অস্যার্থ—পাশ্চাত্যের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে, তাহার অস্ত্র দিয়াই তাহার সহিত লড়িতে হইবে এবং তাহার কতকগুলি দোষ আয়ত্ত করিতে না পারিলে, পাশ্চাত্যরা প্রাচ্যকে শ্রদ্ধা করিবেনা বা অত্যাচার করিতেও বিরত হইবে না।

তামাকের মত করিয়া আফিং খাওয়ার প্রথা চীনে প্রচলিত ছিল না। জাভার ওলন্দাজরা প্রথমে এই প্রথা চৈনিকদের শিখাইবার পরই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ চীনে এই বিষ চালান দিতে আরম্ভ করে। প্রথমে পর্টুগিজগণ ইহা আরম্ভ করে, কিন্তু ইংরেজেরা এই ব্যবসায়ে শেষে অগ্রণী হইয়া দাঁড়ায়।

ইংরাজদের ইতিহাসের দুইটী চরম কলঙ্ক নিগ্রো-দাস ব্যবসায় ও চীনের আফিং ব্যবসায়। দাস প্রথার প্রবর্ত্তক অবশ্য ইংরাজরা নয়; কিন্তু তাহারাই এই ব্যবসায়ে সব চেয়ে বেশী লাভ করিয়াছে এবং সব চেয়ে বেশী দাস চালান দিয়াছে। তাহারা যত নিগ্রোকে অপহরণ করিয়াছে এবং যত অত্যাচার করিয়াছে, বোধ হয় অন্য সব জাতি একত্র হইয়াও তাহাদের সমান করে নাই। ধনী, সম্ভ্রান্ত, ধর্ম্মযাজক এবং রাণী এলিজাবেথ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের ভাগী হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। চীনের আফিং ব্যবসায় ইংরেজের একচেটিয়া। প্রথমই ইংরেজগণ

আফিং লইয়া চীনে উপস্থিত হয়। চীনের আইন অনুসারে তখন চীনে আফিং খাওয়া বা চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ইংরাজবণিক এই আইন মানিল না। চীন সরকার কেণ্টনের ইংরাজ বণিকদের সব আফিং জোর করিয়া বাজেয়াপ্ত করিল। সুসভ্য খৃষ্টভক্ত খৃষ্টান ইংরাজগণ তরবারির জোরে চীনকে আফিং খাইতে বাধ্য করিল। দুই বৎসর যুদ্ধের পর (১৮৪২) ইংরাজ প্রভূত ক্ষতিপূরণ আদায় করিল। তাহারা হংকং দ্বীপ পাইল এবং আরও পাঁচটি বন্দরে ব্যবসায় করিবার অধিকার আদায় করিল। ফ্রান্স, সুইডেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও ইংরাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের নানাবিধ সুবিধা আদায় করিল।

১৮৫৬ অব্দে কতকগুলি চৈনিক দস্যু, চীনের আইন এড়াইবার জন্য ইংরাজদের নিশানে এরো (Arrow) নামক একখানা জাহাজে সমুদ্রে বেড়াইতেছিল। এই দস্যু-দের শাস্তি দিবার জন্য চীন-সরকার জাহাজখানা বন্দী করে। ইংরাজগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সেই জাহাজ ফেরৎ চায়। চীন-সরকার অগত্যা সেই জাহাজ ফেরৎ দিতে রাজী হয়, কিন্তু ইংরাজগণ আবার কতকগুলি নূতন দাবী করে। চীন-সরকার তাহাতে রাজী হয় না। প্রথমে ইংরাজগণ একা এবং পরে ইংরাজ ও ফরাসী একত্র হইয়া চীনকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধের ফলে ইংরাজ ও ফরাসী আবার কতকগুলি নূতন অধিকার আদায় করিল। এই যুদ্ধের

ফলেই তাহারা Extra territorial rights * এবং most favoured nation treatment আদায় করিল। সুসভ্য ইউরোপীয়দের বর্ব্বরতার ইহাতেই শেষ হইল না। পি-হো (Pei-ho) নদীতে চৈনিক জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিবে না—ইহাই ছিল সন্ধি-সর্ত্ত। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীগণ, এই সন্ধি পাকা করিবার জন্য পিকিনে যাইতে এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চৈনিক দুর্গ-প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া দেয়। নদীর তীর হইতে চীনসৈন্যগণও তাহাদের বাধা দিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপ হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া পিকিন দখল করিল—প্রজাদের ধন সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিয়া, সম্রাটের গ্রীষ্মাবাসে আগুন লাগাইয়া, নানা বহুমূল্য মণিমাণিক্য, প্রাচীন মূর্ত্তি, চিত্র চুরি করিয়া, তাহারা এক বীভৎস

* { অ-শ্বেতাঙ্গ জাতিদের সহিত শ্বেতাঙ্গ জাতিদের সম্পর্কের ইতিহাসে, 'extra-territotial rights' একটা বিশেষ কলঙ্কের বিষয়। ভিখারীর বেশে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে যাহারা প্রাচ্য দেশসমূহে ঢুকিয়াছিল, দুদিন পরে, প্রাচ্যদেশবাসীদের রক্ত শোষণ করিয়া যখন তাহারা বলসঞ্চয় করিল, তখন তাহারা দাবী করিল—প্রাচীরা অসভ্য বর্ব্বর, তাহাদের আইন কানুনের শাসন শ্বেতাঙ্গজাতির পক্ষে অসহ্য, তাই প্রাচ্যদেশে বাস করিয়া তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দেশের আইন কানুন, আদালত ও বিচারকের শাসন মানিয়াই চলিবে। মারণ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ প্রাচীরা বিদেশী কামান বন্দুকের চাপে পড়িয়া এই অপমানজনক ব্যবস্থাও মানিতে বাধ্য হয়। ইহাই extra-territorial rights. }

কাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সম্রাটের গ্রীষ্মাবাসের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত শিল্প-সংগ্রহ (art collection) সবই সুসভ্য ইউ-রোপীয়গণ আগুনে পোড়াইল। ইংরেজ ও ফরাসীর এ বর্ব্বরতার তুলনায়, জার্ম্মাণীর রেইম গীর্জ্জা (Reims cathedral) ধ্বংস অনেক কম নিন্দার্হ। সম্রাট রাজধানী ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। আরও বহু সুবিধা ও আরও সাতটি বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার আদায় করিয়া এই সভ্য দস্যুগণ সন্ধি করিল।

রুষিয়া যদিও যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তবুও চীনকে লুণ্ঠন করিতে সে কসুর করিল না। সীমা-নির্দ্দেশের অজুহাতে রুষ মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের অনেকটা যায়গা দখল করিল। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে চৈনিক তুর্কিস্তানে বিদ্রোহ হয়। রুষিয়া তুর্কিস্তানের ২।৩টা স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিল এবং কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলিল যে, সীমান্তে শান্তিরক্ষার জন্য সে ইহা করিয়াছে। চৈনিকগণ বিদ্রোহ দমন করিলে (১৮৭৮) রুষিয়া বাধ্য হইয়া নিজ সৈন্য তুলিয়া নিল, কিন্তু এই সব সামরিক কার্য্যের ব্যয় বাবদ চীনের নিকট হইতে ৯০ লক্ষ রুবল (rouble) ক্ষতি-পূরণ আদায় করিল।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে একজন ইংরাজ দূতকে চৈনিক দস্যুরা হত্যা করে। দণ্ড-স্বরূপ ইংরাজ আরও কতকগুলি ব্যবসায়ের সুবিধা আদায় করিল। চীন ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু অর্থও দিল। আনাম বহুকাল যাবৎই চীনের সামন্ত রাজ্য ছিল। চীনের দাবী ও অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া ফরাসীরা আনাম

অধিকার করিল। ঠিক এই সময় ইংরাজ ব্রহ্মদেশ দখল করিতে লাগিল। আনামের মত ব্রহ্মদেশও চীন-সম্রাটকে কর দিত। (১৮৭৭-১৮৯৪)। জাপানও সুযোগ দেখিয়া কোরিয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিল। কোরিয়াও চীনের করদ রাজ্য ছিল।

প্রধানতঃ কোরিয়ার ব্যাপার নিয়া জাপানে ও চীনে ১৮৯৪ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চীন সরকারের খুবই আশা ছিল, জাপানকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে। কিন্তু চীনের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সেনাপতিদের ঔদাসীন্য ও অকর্ম্মন্যতার জন্য চীন প্রতিপদে পরাজিত হইল। প্রায় সমস্ত চৈনিক নৌবহর ধ্বংস হইল। চীন বাধ্য হইয়া সন্ধির চেষ্টা করিল। কোরিয়ার উপর সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল। জাপানের কোরিয়া অধিকারের ইহাই প্রথম ধাপ। এই সন্ধি অনুসারে ফরমোসা দ্বীপ ও লাইওটাং উপদ্বীপ (Liao-tung) জাপানের হইল; কতকটা চীনেরই প্ররোচনায় রুষিয়া ও ফ্রান্স জাপানের লাইওটাং অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি করিল। জার্ম্মেণীও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এই সব শক্তির সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া, জাপান লাইওটাং চীনকে ফিরাইয়া দিল। ভবিষ্যৎ রুষ-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত এই খানেই হইল। রুষিয়া চীনের প্রতি অহৈতুকী প্রেম করিতে ব্যস্ত নয়, এই দয়ার বিনিময়ে সে মাঞ্চুরিয়াতে রেল লাইন ও খনি সম্বন্ধে অনেক সুবিধা আদায় করিল। ফ্রান্স ও

জার্ম্মেণীর উদ্দেশ্য ছিল, বর্ত্তমানে রুষিয়ার স্বার্থসাধনে তাহাকে সাহায্য করিয়া, ভবিষ্যতে চীনের বুকের রক্ত পানের সময় রাষিয়ার সাহায্য পাওয়ার পথ পরিষ্কার করা।

এতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মেণী চীনের দিকে নজর দিবার অবসর পায় নাই। ইউরোপে জার্ম্মেণীর শক্তি ও অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিসমার্ক জার্ম্মেন কেথলিক মিশনারীদের মুরব্বী ভাবে চীনে প্রবেশ করে। বিসমার্কের পর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম কিয়াচুতে একটি পোতাশ্রয় (harbour) নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন।

১৮৯৭ অব্দে দুই জন জার্ম্মেন মিশনারী সাংটাংএ নিহত হয়। জার্ম্মেণী ঠিক এমনি একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার একটা আড্ডা বিশেষ দরকার, নতুবা ইংরাজের সহিত টক্কর দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়; এবং পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মেন বিশেষজ্ঞগণ এই জন্য কিয়াচু পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। দুই জন জার্ম্মেন মিশনারীর জীবনের বিনিময়ে, জার্ম্মেণী কিয়াচু দখল করিল এবং রেল ও খনি সম্বন্ধে কতকগুলি অধিকার আদায় করিল। ক্রমে কিয়াচুতে তাহারা একটি সুরক্ষিত দুর্গ গড়িয়া তুলিল। ইংরাজের সহিত রেষা-রেষি করিয়া জার্ম্মেণী যখন ক্রমাগতই তাহার নৌবহর বাড়াইতেছিল, তখনও রিস্টগে (Reichstog) নৌ-বিভাগের জন্য টাকা মঞ্জুর করাইতে, নিহত মিশনারীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইত যে, নৌবহর বৃদ্ধি না করিলে প্রাচ্য

ভূখণ্ডে জার্ম্মানদের জীবন ও সম্মান নিরাপদ নহে। কাজেই একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই দুইজন নিহত জার্ম্মেন মিশনারীই গত মহাযুদ্ধকে এত সকালে ঘটাইল।

অনেকের অনুমান যাহাতে জার্ম্মাণীর অনুকরণে সেও এইরূপ কতকটা জমি দাবী ও অধিকার করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রুষিয়াই জার্ম্মেণীকে এই দুষ্কর্ম্ম করিতে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয় এবং ঠিক সেই বৎসরই রুষিয়া লাইওটাং উপদ্বীপস্থিত পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নি দাবী ও অধিকার করিল। রুষিয়া কারণ দেখাইল, জার্ম্মেণীর হাত হইতে মাঞ্চুরিয়াতে রুষিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য এই দুইটি স্থান তাহার দরকার। জাপানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়া, রুষিয়া লাইওটাং উপদ্বীপ গ্রাস করিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রুষিয়া ইহা হজম করিতে পারে নাই এবং রুষ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানকে আবার ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। "ক্ষমতার সাম্য রক্ষার" (Balance of Power) দোহাই দিয়া, ফরাসী ও ইংরাজ নিজ নিজ দাবী করিতে দেরী করিল না। ইংরাজ নিল উই-হৈ-উই (Wei-hai-wei) ও কাউলুন (Kowloon) এবং ফরাসী নিল কোয়াং-চাও-ওয়ান (Kwang-Chow-wan)

ইহার ২।১ বৎসর পরই (১৯০০ খৃঃ অব্দে) বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rising) আরম্ভ হইল। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বিজয়ী মিত্র সৈন্য ৪৫ কোটি টেল (tel) আদায় করিল। এই যুদ্ধের সময় রুষিয়া মাঞ্চুরিয়াতে যে সব সৈন্য আনিয়াছিল, তাহাদের

সাহায্যে সে চীনের নিকট হইতে মাঞ্চুরিয়ায় অনেক নূতন অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে। ইংল্যাণ্ড ও জাপান, রুষিয়ার এই চেষ্টায় একটু বেশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল এবং তাহারা উভয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য এক সখ্য সন্ধি করিল। যখন রুষিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে তাহার সৈন্য উঠাইয়া নিল না, তখন জাপান তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৯০৪)।

কিন্তু এই যুদ্ধে চীনের স্থান কোথায় ? তাহারই বক্ষের উপর বসিয়া দুই যুদ্ধমান জাতি লড়াই করিবে, তাই চীনকে ঠিক নিরপেক্ষ (neutral) বলা যায় না ; অথচ তাহার পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াও সম্ভব নয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরামর্শ মত ইহা ঠিক হইল, যে লাইও-হো (Liao ho) নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া যুদ্ধের ক্ষেত্র এবং ঐ নদীর পশ্চিমে কোন পক্ষই যাইতে পারিবে না। এই মীমাংসা হওয়ার পরই জাপান কোরিয়ার সহিত এক সন্ধি করিয়া কোরিয়াকে কার্য্যতঃ জাপানের সামন্ত রাজ্য (Protectorate) করিয়া লইল। এই যুদ্ধের পর রুষিয়ার পোর্ট আর্থারও ডাল্‌নি জাপানের পাইল এবং রুষের কতক রেল লাইন ও জাপান পাইল। চীন (১৯০৫) জাপানের এই সব অধিকার স্বীকার করিয়া জাপানের সহিত সন্ধি করিল।

জাপানের উন্নতি এই হইতেই আরম্ভ হইল। ১৯১১ খৃঃ অব্দে জাপান কোরিয়া উদরসাৎ করিল।

এদিকে ইংরাজগণ তিব্বতে এক অভিযান পাঠাইয়া লামা ও তিব্বতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

চীনে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার পর কোন পাশ্চাত্য জাতি আর চীনের কোন স্থান আত্মসাৎ করে নাই। কিন্তু তখনও নানাভাবে তাহারা চীনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে ক্রুটি করে নাই। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে আমেরিকা চীনের প্রতি একটু সদয়; যখন ইউরোপীয় জাতিসকল চীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল, তখন (১৮৯৯ অব্দে) আমেরিকাই প্রথম "খোলা দরজা" (Open door policy) মত প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকার অনুরোধে ও চক্ষুলজ্জায় অন্যান্য জাতিও রাজী হইল যে, চীনে সকল জাতিই সমানভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পারিবে এবং একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রকৃত পক্ষে আমেরিকার এই কার্য্যটির জন্যই চীন শেষ পর্য্যন্ত মানচিত্র হইতে লোপ পাইয়া, বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন উপনিবেশে পরিণত হয় নাই। রুষ-জাপান যুদ্ধের পর, আমেরিকা চীনের নিকট প্রাপ্য বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণের টাকা মাপ দিয়া এই সর্ত্ত করিল যে, সেই টাকা দিয়া চৈনিক যুবকদের বর্ত্তমান শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠান হইবে (১৯০৮)

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে জাপানই সবচেয়ে বেশী জুলুম চীনের উপর করিয়াছে। সে কাহিনী পরে বিবৃত হইবে।

সানইয়াৎ সেন ও চৈনিক বিদ্রোহ

যখন ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জ নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থায় ছিল, যখন রোমীয় সভ্যতার পত্তনও হয় নাই, সেই সুদূর অতীতে চীন সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া রাষ্ট্রে, দর্শনে, কলায় সর্ব্ববিষয়েই জগতের বরেণ্য হইয়াছিল। পরিশ্রমী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সৌভাগ্যশালী অধিবাসীরা উর্ব্বর, শস্যশ্যামল, ধন-রত্নপূর্ণ চীন দেশে বাস করিত। পার্শ্ববর্ত্তী দেশের লোলুপ দৃষ্টি স্বভাবতঃই চীনের উপর পড়িল। ক্রমাগত বিদেশী আক্রমণে চীন বিব্রত হইয়া পড়িল। অসভ্য প্রতিবাসীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া, সে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মাঞ্চুদের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। মাঞ্চুরাজারা চীন-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ;—ক্রমে বিদেশী বিজেতা

বিজিতের সহিত প্রায় এক হইতেছিল, কিন্তু মাঞ্চু রাজার অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা সমানেই চলিতেছিল। প্রাচীন চীনে বৈধ রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু মাঞ্চু আমলে স্বেচ্ছা-চারী আমলাতন্ত্র প্রচলিত হইল।

এই অবস্থায় চীন ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে চীনের নিশ্চিত ও আশু ধ্বংসের কথা ঘোষণা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, কোন ক্রমেই আর চীনের পুনর্গঠনের আশা নাই। প্রাচীন গ্রীস, রোম, বেবিলন, এসিরিয়া, মিশরের মত চীনও প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় হইবে। কিন্তু এ সময় চীনে হঠাৎ নবজীবনের লক্ষণ দেখা গেল। ১৮৯৮ খৃঃ সম্রাট কাউঙ্গ-হসু (Kaung-Hsu) দেশের উন্নতিকামী কয়েকজন পণ্ডিতকে লইয়া এক পরিষদ গঠন করেন। কাঙ্গ-যু-উই (Kang-yu-wei) এই দলের প্রধান ছিলেন। তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; লোকে তাঁহাকে "আধুনিক ঋষি" (Modern sage) বলিত। তাঁহার পরামর্শে সম্রাট কয়েকটা নূতন আদেশ প্রচার করেন। সেই আদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে দেশের অবস্থা অনেক উন্নত হইত। কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ। রাজমন্ত্রী ও রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইল। রাণীমাতা (Empress Dowager) রক্ষণশীলদের সাহায্যে সম্রাটের হাত হইতে সকল ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। সম্রাট কার্য্যতঃ অধিকারচ্যুত

হইলেন। সংস্কারেচ্ছুদলের অনেকেই উহাদের হাতে প্রাণ হারাইলেন ;—কাঙ্গ-যু-উই অতিকষ্টে ইংরাজের সাহায্যে হংকংএ পলাইয়া গেলেন।

কিন্তু এই রক্ষণশীল দলের কর্তৃত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তাহারা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে সম্পূর্ণ অপটুতা দেখাইল। চীনের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ও নিশ্চিত ধ্বংসের আশায় কিছুদিন হইতেই ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ একের পর একে আসিয়া চীন সাম্রাজ্যের অংশ দাবী করিতেছিল। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মেণী, রুষ ক্রমে ক্রমে চীনকে ভাগ করিয়া গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল। এই বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের অত্যাচারও কম ছিল না। বক্সার-বিদ্রোহের একজন নায়ক এক ঘোষণাপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন "বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচারের অজুহাতে এই বিদেশীরা আমাদের দেশ, খাদ্য ও বস্ত্র অপহরণ করিতেছে। আমাদের ঋষিদের শিক্ষা ও সভ্যতা নষ্ট করিয়া, আফিং ও ব্যাভিচার দ্বারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহারা রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে ভয় দেখাইয়া রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতেছে, আমাদের জাতীয় ঋণ পর্ব্বত-প্রমাণ করিয়াছে, আমাদের বাড়ী, ঘর, প্রাসাদ পোড়াইয়া দিয়াছে, আমাদের করদ রাজ্যসকল বিধ্বস্ত করিয়াছে, সাংহাই, ফোরমোসা, হংকং, কিয়াংচু লুণ্ঠন ও দখল করিয়াছে ;—আজ আবার তাহারা সমস্ত চীন দখল করিতে উৎসুক।"

এই চিত্র মোটের উপর ঠিক। এই অত্যাচারে জর্জ্জরিত

হইয়া চীনবাসীরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাণী কতকটা বাধ্য হইয়া এবং জয়ের দুরাশায় এই বক্সার-বিদ্রোহীদের কার্য্যে অনুমতি দিলেন (১৯০০ খৃ :) কিন্তু বিদেশীদের সম্মিলিত শক্তির নিকট চীনা-বিদ্রোহীরা টিকিতে পারিল না।

বিজয়ী বিদেশী শক্তিপুঞ্জ চীনকে পরাজিত করিল। চীনের সহিত সম্মিলিত শক্তির সন্ধি হইল। ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ চীনের নিকট হইতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অর্থ ও নূতন অধিকার আদায় করিল। এই বিদ্রোহের উদ্যোগী ও কর্ম্মীদিগের ফাঁসীর বা নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল। সম্মিলিত বিদেশী সৈন্য রাজধানী আক্রমণ করিলে পর রাণী ও তাঁহার পরিষদ-বর্গ রাজধানীত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং একবৎসর পরে আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

এই পরাজয়ের পর রাণীমাতা (Empress Dowger) বুঝিলেন, এই ভাবে চলিলে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি বিখ্যাত য়িয়ান-সি কাইকে (Yuan-Shik-Kai) রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। য়িয়ান-সি-কাই উদার ও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারে এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্থলে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রাণীমাতা এই স্বদেশভক্ত কর্ম্মী বীরের সাহায্যে শাসন ও শিক্ষায় সংস্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। য়িয়ান-সি-কাই কয়েকজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোক নিযুক্ত করিয়া এই সব সংস্কার-কার্য্য

আরম্ভ করিলেন। দলে দলে ছাত্র তাঁহার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে লাগিল, দলে দলে ছেলে বিদেশে শিক্ষার জন্য যাইতে লাগিল। দেশে দেশীয় সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। মোটের উপর দেশের লোক য়িয়ান-সি-কাইর এই সংস্কার-প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা বুঝিল যে জগতে বাঁচিতে হইলে সেই সনাতন ও পুরাতনকেই লইয়া থাকিলে চলবে না।

এমন সময় রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র জাপান যখন বিশাল রুষকে ক্রমাগতই পরাজিত করিতে লাগিল, জাগ্রতোন্মুখ চীন তখন বিস্ময়ে তাহা দেখিতেছিল। যদি ক্ষুদ্র ও অসভ্য জাপান শ্বেতাঙ্গদের পরাজিত করিতে পারে, তবে তাহারাই বা কেন পারিবে না—এ প্রশ্ন তখন তাহাদিগকে উতলা করিয়া তুলিল। এদিকে চীন-যুবকগণ বিদেশে শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিতে লাগিল। সাম্য ও স্বাধীনতার বার্ত্তা তাহারা দেশে প্রচার করিতে লাগিল। এই "তরুণ চীন সঙ্ঘ" (Young China Party) বিদেশী রাজ্যাপহারী বণিক ও দুর্ব্বল অক্ষম রাজশক্তি, এই দুয়ের উচ্ছেদ চাহিল। তাহারা দেশের লোককে বলিত, দেখ, আমদের দেশের কি দুর্দ্দশা!—বিদেশী বণিকগণ ধর্ম্ম প্রচারের ভণ্ডামী করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশ ভাগ করিয়া গ্রাস করিতেছে, আর রাজশক্তি তাহাদিগকে বাধা দিতেছে না। মোটের উপর দেশে তখন তিনটা দল ছিল। (১) রক্ষণশীল কর্ম্মচারীগণ, (২)

সংস্কারেচ্ছু কর্ম্মচারিগণ—য়িয়ান-সি-কাইর নেতৃত্বে এবং (৩) পূর্ণবিপ্লববাদী "তরুণ চীন-সঙ্ঘ।"

এই "তরুণ চীন সঙ্ঘের" (Young China Party) নায়ক ছিলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (Dr. Sun-Yat-Sen)। এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ মৃতপ্রায় চীন জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন; তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার অনন্যসাধারণ সততা তাঁহাকে তরুণ চীনাদের চোখে জাগ্রত দেবতার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১৭ জন সঙ্গী লইয়া এক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। একে একে তাঁহার ১৭ জন সঙ্গী মাঞ্চু অত্যাচারের কবলে প্রাণত্যাগ করিল,—একা তিনি ১৮ বৎসর স্বদেশে-বিদেশে পলাইয়া পলাইয়া মৃত্যুদণ্ড মাথায় লইয়া মৃত্যুর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিলেন; কতবার মাঞ্চু গুপ্তচরগণ তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। বিলাতেও তিনি নিরাপদ ছিলেন না;—লণ্ডনে মাঞ্চু গুপ্তচরগণ একদিন তাঁহাকে ধরিয়া লুকাইয়া রাখে; চীনে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছিল, এমন সময় তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণ খবর পাইয়া প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিস্‌বরীর (Lord Salisbury) নিকট দরবার করেন। প্রধান মন্ত্রী খবর পাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। একটী ইংরাজ ঝি, সানের গ্রেপ্তারের খবর তাঁহার বন্ধু ডাঃ কেণ্টলিকে প্রথম জানায়। যদি সময় মত খবর দেওয়া না হইত, তবে সানকে চীনে পাঠাইয়া হত্যা করা হইত। সর্ব্বদা গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতক

তাঁহার পিছনে পিছনে ফিরিত। জীবিত বা মৃত তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, বহু পুরস্কার দিবে বলিয়া মাঞ্চু সরকার ঘোষণা করিয়াছিল।

সান ইয়াৎ কখনও মৃত্যু-ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন না,—তিনি দেশের নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচার করিতেন। নানা দেশে ঘুরিয়া তথাকার প্রবাসী চীনাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করিতেও তিনি বিরত ছিলেন না। জাপান, মালায় উপদ্বীপ, প্রণালী উপনিবেশ,—যেখানে যেখানে চীনা লোকের বাস আছে, সেখানেই তিনি স্বাধীনতার বার্ত্তা লইয়া যাইতেন। তিনি ছদ্মবেশে চীনের গ্রামে-গ্রামে, পর্ব্বতে-কান্তারে, নিরীহ চীনাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিতেন—অথচ তাহার মস্তকের জন্য মাঞ্চু সরকার প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। অকুতোভয়ে তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন।

পলায়নের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে সান নৌ-গৃহে বাস করিতেন। একদিন নান্‌কিংএ হঠাৎ একটি লোক তাঁহার নৌ-গৃহে প্রবেশ করিয়া বলে যে, সে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবে, কেননা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিতে পারিলে ৫০০০ ডলার (এক ডলার আমাদের ৩৷৹ টাকার সমান) পুরস্কার পাইবে। সান নির্ব্বিকারভাবে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন—হঠাৎ গুপ্তচরটি সানের পা জড়াইয়া ধরিল এবং আত্ম-

গ্লানিতে কাঁদিতে লাগিল। সান সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চ চরিত্রের প্রভাবে,—তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে,—সেইবার তিনি রক্ষা পাইলেন। সেই চরটী অনুতাপে ও লজ্জায় গৃহে যাইয়া আত্মহত্যা করিল। এই রকম ঘটনা সানের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে।

এই সময় তিনি এক জালিয়ার নৌকায় লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিতে মাঞ্চু সরকার সেই সময় কয়েকজন পুলিশ পাঠায়। জালিয়াটি নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, সানকে তুইদিন পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখে। সানের বন্ধুগণ খবর পাইয়া সেই পুলিশ কয়টীকে গুলি করিয়া মারিলে পর, সান নৌকা হইতে বাহির হন। একবার এক গৃহে তিনি ছয়মাস লুকাইয়া ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি সেই বাড়ীর বাহিরে যান নাই! আর এক-বার তুইটী উচ্চ কর্ম্মচারী ১২ জন সৈন্যের সহিত তাঁহাকে বন্দী করিতে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। সান তাহাদের আসিতে দেখিয়া জোরে জোরে একখানা ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কর্ম্মচারী তুইটী ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু সময় তাঁহার পাঠ শুনিলেন এবং তাহাতে এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহারা সেই পুস্তক সম্বন্ধে সানের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর তাঁহারা সানের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী না করিয়াই ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে সান বহুবার অব্যাহতি পাইয়াছেন। মৃত্যু বহুবার তাঁহার চুল ঘেসিয়া গিয়াছে;—কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে

নাই। এক সময় মাঞ্চু সরকার তাঁহার মস্তকের জন্ম ১০,০০০০০ পাউণ্ড (এক পাউণ্ডে আমাদের ১৫৲ টাকা।) পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল! যে কেহ তাঁহাকে ধরিতে বা হত্যা করিতে পারিবে, সেই এই পুরস্কার পাইবে। এত বিপদ সত্ত্বেও, সান দেশের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত হন নাই।—দেশের জন্মই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সান-ইয়াৎ-সেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কেণ্টন নগরের নিকট এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সানের পিতা একজন খৃষ্টান ছিলেন এবং এল্, এম্, (London Missionary) সোসাইটীর মধ্যে কার্য্য করিতেন। এক ইংরাজ মহিলা সানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার যত্নে সান ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী হন। তিনি কেণ্টনে মিসনারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য দেখিয়া ডাক্তারী শিখিবার জন্ম উৎসুক হন, এবং কুড়ি বৎসর বয়সে হংকংএ নবপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তারী বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তি হন। তিনিই এই বিদ্যালয় হইতে প্রথম পাশ করেন। প্রায় ৫ বৎসর পরে তিনি এখান হইতে সার্টিফিকেট পান। তখনও চীনাগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসায় বিশেষ আস্থাবান ছিল না। তবুও মেকাও (Portu gese colony Macao) নগরের একটী চীনা চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সানকে পাশ্চাত্যমতে সেখানে চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজ সার্টিফিকেট না থাকিলে তাহাদের রাজ্যে চিকিৎসা করিতে না দেওয়ায়, সান কিছুদিন পরে কেণ্টনে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মেকাও থাকার সময়ই প্রথম

তিনি "তরুণ চীন সঙ্ঘের" (Young China Party) সন্ধান পান।

সান কেণ্টনে যাইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছু-দিনের মধ্যেই "তরুণ চীন সঙ্ঘের" কার্য্যের প্রসার হইতে লাগিল। তিনি সেই দলের কার্য্যে এত ব্যাপৃত থাকিতেন যে নিজের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টি ও সময় দিতে পারিতেন না। সান তখন দেশের উদ্ধারের জন্য বিপ্লবের আয়োজনে লিপ্ত ছিলেন। এই তাঁহার প্রথম প্রয়াস।

তখন দেশের অবস্থা অনেকটা শান্ত। বিপ্লববাদীরা কিছু-দিন চুপ করিয়া আছে, কারণ সম্রাট ঘোষণা করিয়াছেন যে, নূতন শাসন-সংস্কার শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ, তখন চীন-জাপান যুদ্ধ চলিতেছে; সেই সময় সম্রাটকে বিব্রত করার অর্থ জাপানের নিকট চীনের পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। কিন্তু পরাজয় চীনের হইলই। সমস্ত চীনজাতি লজ্জায়, দুঃখে মর্ম্মাহত হইল। ক্ষুদ্র অসভ্য জাপান চীনের মত বিরাট প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে পরাজিত করিতে পারে, ইহার পূর্ব্বে কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সমস্ত জাতি সংস্কারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল; দেশে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈন্যগণ পরাজয়ের লজ্জায় ক্ষুব্ধ; তার উপর তাহারা বেতন পায় না, খাবার নাই, কতক পঙ্গু হইয়া ঘরে বসিয়া আছে। কেণ্টন নগরে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল—লুঠ-তরাজ আরম্ভ করিল। পুলিশগণ বেতন পায় নাই, তাই তাহারাও

সৈন্যদের সহিত যোগ দিল। নাগরিকদের এক সভায় ৫০০ লোক নির্ব্বাচিত হইল, তাহারা শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া নিজেদের সমস্ত অভিযোগ জানাইল। শাসনকর্ত্তা সব শুনিয়া সকলকে বন্দী করিতে আদেশ দেন। সানও ঐ দলে ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া গেলেন। নিজেকে রক্ষা করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না। পরে তাঁহার সঙ্গীদের মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

সেই সময় কেণ্টনের কিছু উত্তরে, স্বাতাও (Swataw) নগরের কতকগুলি লোক বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছিল। তিনি তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ঠিক করিলেন যে, স্বাতাও ও কেণ্টনবাসী বিদ্রোহীরা একত্র হইয়া কেণ্টন দখল করিবে এবং সেইখানে যে সব অস্ত্র-শস্ত্র পাইবে তাহা দ্বারা অন্যত্র বিপ্লবের চেষ্টা করিবে। বিপ্লবের সমস্ত ঠিক ;—একজন লোক হংকংএ যাইয়া কিছু বন্দুকাদি অস্ত্র-শস্ত্র ও কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া আনিবে। এদিকে স্বাতাও হইতে বিদ্রোহীরা সশস্ত্র হইয়া আসিবে। দুই দিক হইতে একই সময় আক্রমণ করিয়া অনায়াসে কেণ্টন দখল করিয়া লইবে। কিন্তু হঠাৎ খবর পাওয়া গেল স্বাতাওবাসীরা সময়মত আসিতে পারিবে না ; কারণ সরকার বিদ্রোহের খবর পাইয়াছে। স্বাতাওর লোকদের উপরই ভরসা ;— তাহারা না আসিতে পারিলে, বিদ্রোহে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে। সান হংকংএ অমনি টেলিগ্রাম করিলেন, যেন তাহারা না আসে। যখন সেখান হইতে ৩০০।৪০০ লোক ও অস্ত্রাদি লইয়া জাহাজ

ছাড়িবে, তখন টেলিগ্রাম তাহাদের হাতে আসিল ;—কিন্তু তাহারা টেলিগ্রামের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, কেণ্টন অভিমুখে রওনা হইল। তাহারা কেণ্টনে আসিলে পরই, সরকার সকলকে গ্রেপ্তার করিল। সান তখন কেণ্টনেই ছিলেন ;—তিনি পালাইয়া ছদ্মবেশে নানাপথ ঘুরিয়া মেকাও যান। সেখান হইতে হংকং, হংকং হইতে হনোলুলু এবং পরে আমেরিকা হইয়া বিলাত যান। বিলাতে তাঁহাকে চীনাদূত গোপনে বন্দী করিয়া, চীনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে ; কিন্তু তাঁহার বন্ধুদের চেষ্টায় তিনি সেবার মুক্ত হন।

ক্যাণ্টনের বিপ্লব-চেষ্টা ব্যর্থ হইল—সানের বহুদিনের সাধনা বিফল হইয়া গেল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "দশ বৎসরব্যাপী স্বদেশ ও বিদেশে আমার সকল কার্য্য এই পরাজয়ে পণ্ড হইয়া গেল।" কিন্তু পরাজিত হইয়াও হতাশ হইবার লোক তিনি নন। 'বাক্‌সার-বিদ্রোহের' সময় তিনি জাপান গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা রফা করেন। জাপান অস্ত্র দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সহসা জাপানের মন্ত্রীপরিষদের পরিবর্ত্তন হয়, তাই জাপানের নিকট কোনরূপ সাহায্যই তিনি পান না। এই দ্বিতীয়বার পরাজয়ে এই লাভ হয় যে, চীনের অনেকেই ডাক্তার সানের অনুরাগী হইয়া উঠেন। আগে তাহারা মনে করিতেন যে, ডাক্তার সান ও তাঁহার দলের লোকেরা "সাপের মতই খল, আর পশুর মতই হিংস্র।" কিন্তু এবার তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ডাক্তার সান চীনের হিতাকাঙ্ক্ষী।

ছেলেরা সব দলে দলে ডাক্তার সানের নিকট মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। ডাক্তার সান পরাজিত হইয়াও জয় লাভ করিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সান ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরিয়া নিজের সঙ্কল্প সিদ্ধির আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইউরোপে আর জাপানে যে সব চীনা ছাত্র ছিল, তাহারা বিদ্রোহের জন্ম প্রস্তুত হইল। ডাক্তার সান এইবার ফরাসী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেন, এইবারও সমস্ত আয়োজন ঠিক—জয় নিশ্চিতপ্রায়। কিন্তু মাঞ্চু গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় একজন ফরাসী কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিল—আবার সব শ্রম পণ্ড হইয়া গেল। এমনি বারবার পরাজিত হইয়াও ডাক্তার সান মাঞ্চু-শাসন উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিলেন—আর বারবারই তাঁহাকে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যাইতে হইল।

কিছু দিন সিঙ্গাপুর হইতে আন্দোলন চালাইয়া, ডাক্তার সান অর্থ সংগ্রহের জন্ম আবার ইউরোপে গেলেন। মাঞ্চু গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিল, জীবিত বা মৃত সান-ইয়াৎ-সেনকে যে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে। ডাক্তার সান তখন লণ্ডনে। তাঁহার এক বন্ধু ঘোষণার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন সাহসে এমন প্রকাশ্যভাবে, তিনি লণ্ডনের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান ?

ডাক্তার সান হাসিয়া জবাব দেন—"আজ আর এ মাথা

পাঁচাইবার জন্য আমার তেমন আগ্রহ নাই, দশ বছর আগে যতটা ছিল। আজ চীনে হাজার হাজার লোক তৈয়ারী হইয়াছে, যাহারা চীনের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত।”

আরো একবার ডাক্তার সানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। দশম বারে তিনি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন বলিয়া বিপুল আয়োজনে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার সমস্ত সহকর্ম্মী ক্যাণ্টনে সমবেত হইলেন—সমস্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁহারা মাঞ্চু-গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু এবারও সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। বাহাত্তর জন প্রধান কর্ম্মী মাঞ্চু-রোষানলে প্রাণ আহুতি দিল। ডাক্তার সান আমেরিকায় পালাইয়া গেলেন। তাঁহার লোকের অভাব পূর্ণ হইয়াছে, বাহাত্তর জন দেশ-প্রেমিকের আত্মদান চীনাদের চিত্তে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে: উপযুক্ত অর্থ পাইলেই ডাক্তার সান চীনকে মাঞ্চুর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। ডাক্তার সান অর্থ-সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় গেলেন, আর তার সহযোগীরা চীনে থাকিয়া অন্য সব আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অপরদিকে রক্ষণশীল মাঞ্চুগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিল, যাহাতে কোন সংস্কার না হয়। এদিকে বিপ্লববাদীদেরও ক্রমাগতই চেষ্টা ছিল, দেশময় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া এবং আমেরিকাতে আড্ডা স্থাপন করিয়া মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদের আয়োজন করা। মাঝখানে য়িয়ান-সি-র চেষ্টা ছিল, যাহাতে

দুইপক্ষের দাবীই কতকটা রক্ষা করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে দেশের সংস্কার করিতে পারেন।

এই ভাবে তিনটী দলের প্রভাব ও কার্য্য সমানে চলিতে লাগিল। য়িয়ান-সি-কাইর সাহায্যে রাণীমাতা সংস্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে রাণীমাতা এক ইস্তাহার জারি করেন। জনসাধারণকে একটু শান্ত ও সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি প্রচার করেন যে, শীঘ্রই দেশের শাসন-কার্য্যের সংস্কার করিয়া এক পার্লিয়ামেণ্ট বা প্রতিনিধি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাণীমাতা য়িয়ান-সি-কাইকে পরিষদ-সভায় (Grand council) এক পদ দিলেন। প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের পূর্ব্বে এক 'জাতীয় সমিতি,' (National Assembly) স্থাপন করা হইল। প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সভার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেওয়া হইল।

১৯১০ খ্রীঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর জাতীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। এই জাতীয় সমিতিতে ২০০ সভ্য ছিল; এই সব সভ্য সম্রাট এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত হইল। তিন বৎসর পরে পুনরায় নূতন সভ্য মনোনীত হইবে। এই সব সভ্যের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না; তাহারা দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহে। এমন কি, তাহারা সাধারণ শ্রেণীর দেশবাসীও নহে—প্রায় সবাই অভিজাত বংশীয়। এই সভ্যগণ আট ভাগে বিভক্ত ছিল (১) রাজবংশ সম্ভূত অভিজাতবর্গ ১৬ জন; (২) মাঞ্চু ও চীনীয় অভিজাতবর্গ ১২ জন; (৩) মোগল, তিব্বতীয় ও মুসলমান অভিজাতবর্গ ১৪ জন; (৪) রাজবংশের

বিভিন্ন শাখা হইতে ৬ জন ; (৫) পিকিংএর উচ্চ শ্রেণীর রাজ-কর্ম্মচারী হইতে ৩২ জন ; (৬) বিখ্যাত সাহিত্যিক, গ্রন্থকার, অধ্যাপক ১০ জন ; (৭) বিশেষ ভূম্যধিকারী ১০ জন ; (৮) প্রাদেশিক সমিতির সভ্য হইতে ১০০ জন। এই সভ্যগণ কেবল সম্রাটকে পরামর্শ দিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহাদের পরামর্শ বা মত কার্য্যে পরিণত করার কোন ক্ষমতাই ছিল না।

এই জাতীয় সমিতিও জাতীয় সম্মান বজায় রাখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল—তাঁহারা সংস্কার দাবী করিল। আমাদের দেশের সরকারী মনোনীত সভ্যগণের মত ইহারা সরকারের মতেই মত দিত না। প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় সমিতি এক পক্ষ এবং পরিষদ-সভা (Grand council) অপর পক্ষ। পরিষদ সভার সভ্যেরা অনেকেই সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী নয় ; তাহারা প্রধানতঃ সম্রাটের আওতায় থাকিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। কিন্তু প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় সমিতি তাহাদের আন্দোলন চালাইতে লাগিল। প্রতিনিধি-সভা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় সমিতি প্রস্তাব পাশ করিল। নানাদিকের চাপে পড়িয়া, সম্রাট শেষে বাধ্য হইয়া ঘোষণা করিলেন "তিন বৎসর পর প্রতিনিধি-সভা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহার জন্য যোগাড় ও আয়োজন করিতেও সময় লাগিবে, কাজেই এখনই ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আমরা নূতন আইন প্রণয়ন, শাসন সংস্কার এবং প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়ম ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিব, কিন্তু রাজ্যের কর্ম্মচারী ও জনসাধারণ যেন এই সময়টা

বৃথা নষ্ট না করেন ; তাহারা যেন এই দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হয়।" দুই মাস পরে সম্রাট আর এক ইস্তাহার জারী করিলেন— মধ্যের তিন বৎসরে কি ভাবে কি আয়োজন করিবেন, তাহাই এই ইস্তাহারে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইল।

জাতীয় সমিতি প্রথম অধিবেশনেই আর তিনটি প্রস্তাব পাশ করেন—(১) বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আফিং চাষ বন্ধ করা হউক ; (২) দাসত্বের চিহ্ন-স্বরূপ মাথার বেণী কাটিতে স্বাধীনতা দেওয়া হউক , (৩) ১৮৯০ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ চেষ্টায় দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হউক।

যখন এইভাবে ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন আগুন জলিয়া উঠিল—মাঞ্চুবংশ তাহাতে লোপ পাইল। চীনে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল ; তাহারা দেশের লোককে দেশের বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইতে লাগিল। দেশবাসী বুঝিল, তাহাদের দুর্দ্দশার দুইটা কারণ · মাঞ্চুবংশের অত্যাচার ও বিদেশীর অত্যাচার। একদিকে যেমন মাঞ্চুবংশ উচ্ছেদ করা দরকার, অপর দিকে তেমনি বিদেশীদের শক্তি খর্ব্ব করা দরকার। আফিংএর যুদ্ধে (Opium War) বিদেশীর মনোভাব পরিষ্কার দেখা গেল। এই বিদেশী ! বিদ্বেষ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 'বক্সার-বিদ্রোহে' (Boxer Rising) আত্মপ্রকাশ করিল। চীনাগণ পরাজিত হইল, কিন্তু শক্তিপুঞ্জ পরাজিত চীনকে শাস্তি দিতে ও অপমান করিতে মোটেই ত্রুটি করিল না। ফলে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল।

এদিকে রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়ী হইল। পরাজিত চীন নিজের পরাজয় ও দুর্ব্বলতা আরও তীব্রভাবে অনুভব করিল। তাহারা শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্য-দের শিক্ষা ও অস্ত্র শস্ত্র দিতে লাগিল। বিপ্লববাদী যুবকদল দলে দলে নানা দেশে যাইয়া, নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা বিদেশী কেতাবী শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট রহিল না—বিদেশে তাহারা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত শিক্ষাও পাইতে লাগিল।

এই সময় তিনটি ঘটনায় বিদ্রোহ সম্ভবপর করিয়া তুলিল। (১) ১৯১০-১১ সালে উত্তর চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়—দলে দলে লোক দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আত্মাহুতি দিতে লাগিল। দেশবাসীদের এই শোচনীয় দশায়, সমস্ত চীন তীব্র বেদনা অনু-ভব করিল।

(২) চীনাদের বিদেশী-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়া, সরকার, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও যুক্তরাষ্ট্রর নিকট হইতে ১০০,০০০,০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে। আন্তর্জাতিক বিধানে এই প্রকার ঋণ দেওয়া বা লওয়ার অর্থ সকলেই জানিত—প্রকারান্তরে এই সব জাতির নিকট দাসত্বকেও ঋণের সহিত মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সমস্ত চীনা জাতি ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু সরকার ইহাতেও নিরস্ত হইল না।

পূর্ব্বোক্ত ঋণ গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরে মাঞ্চু সরকার ছি-ছোয়ান, কেণ্টন ও হেকাও প্রদেশে রেল লাইন প্রস্তুত করার

জন্য বিদেশীদের, বিশেষতঃ ইংরাজদের নিকট হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের বন্দোবস্ত করে। ছি-ছোয়ানের ধনী প্রজারা সকলে মিলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই লাইন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু জনসাধারণের সমবেত উদ্যম ও ইচ্ছাকে পদদলিত করায়, তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ বিদেশীদের প্রভাব বৃদ্ধিটা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। ছি-ছোয়ানবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। সরকারপক্ষ প্রলোভনে, ভয়ে ও অস্ত্রের সাহায্যেও তাহাদের বশ করিতে পারিল-না।

(৩) এই সময় এই বিদ্রোহের বার্ত্তা অন্যান্য প্রদেশেও প্রচারিত হইতে লাগিল। সকল প্রদেশেই অসন্তোষ অন্তরে অন্তরে ছিল। ছি-ছোয়ানবাসীদের কৃতকার্য্যতায় তাহারাও সাহস পাইল।

এই সময় মাঞ্চু সরকার এক বিষম ভুল করে। যে সব সৈন্য বিদেশী ধরণে শিক্ষিত হইয়াছিল, সরকার ক্রমে তাহাদের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। গুপ্ত সমিতির যুবক সভ্যগণ এই সব সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লব ও স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিতে কসুর করে নাই—ইহার ফলে অন্তরে অন্তরে এই সব সৈন্যরা দেশগতপ্রাণ স্বাধীনতাকামী হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, যদি পরাধীন জাতি তাহার সৈনিকদের বিদ্রোহভাবাপন্ন না করিতে পারে, তবে তাহার বিদ্রোহের চেষ্টা দুরাশা মাত্র। তাই সব দেশেই গুপ্ত সমিতির একটা প্রধান কার্য্য হয়, সৈন্যদের হাত করা। গত

যুদ্ধের সময়, ভারতের নানা প্রদেশে যে বিপ্লবের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতেও বিপ্লববাদীরা সৈন্যদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার চেষ্টা ও আশা করিয়াছিল।

চীনা সরকার এই সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করিতে মনস্থ করিল। তাহাদের এই চেষ্টার ফলেই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। প্রথমে হুপে প্রদেশে এবং ক্রমে অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। তখন চীনের বিপ্লব-যজ্ঞের হোতা সান-ইয়াৎ আমরিকায়।

বিপ্লব ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপ্লবের এই অপ্রত্যাশিত জয়ের প্রধান কারণ সৈন্যদের সহানুভূতি—বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যদল কোন উৎসাহ দেখাইত-না; অনেক সময় প্রকাশ্যে তাহাদের সহিত যোগ দিত। তখনও পেকিন বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই—পেকিনবাসীরা বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজিতেছিল। এমন সময় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের এক কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহারা কর্ম্মচারীদের নিয়োগ-পত্র স্বাক্ষর করিয়া উচ্চমূল্যপ্রদানকারীদিগকে বিক্রয় করিতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের এই কাণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। তখন পেকিনবাসীরা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সম্রাটপক্ষ বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিলেন। সেই উদ্দেশ্যে সম্রাট, ইয়ান-সি-কাইকে বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি-স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ইয়ান-সি-কাইকে সকলেই একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এবং সম্রাট পক্ষ ও দেশবাসী উভয়েই মনে করিত, ইয়ান-সি-কাই অন্তরে অন্তরে বিপ্লববাদীদের সমর্থন

করেন। ইয়ান-সি-কাই, ঠাং-সাওইকে সাংহাই এ বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধির আলাপ করিতে পাঠান। বিদ্রোহীদলের সেনা-পতি লি-ইউন-হুং, ডাঃ উ-টিং-ফাংকে সন্ধির আলোচনার ভার দেন। এই আলোচনার ফলে ঠাং-সাওই গণতন্ত্র সমর্থ করিলেন, এবং যাহাতে সম্রাটও গণতন্ত্রের পক্ষে মত দিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন, সেই অনুরোধ করিয়া ইয়ানকে খবর দেন।

এদিকে ১৯১২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী গণতন্ত্রীদল নানকিঙ্গে গণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রবাসী ডাঃ সান ইয়াং সেনকে প্রথম রাষ্ট্রনায়ক (President) নির্ব্বাচিত করিয়া, আমেরিকায় তাঁহাকে টেলিগ্রাম করে। সান প্রথমে এই পদ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই, কিন্তু পরিশেষে জাতির কল্যাণের জন্য তিনি রাজী হইলেন। আমেরিকা হইতে তিনি লুকাইয়া বিলাতে আসেন এবং সেখান হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া দেশে ফিরেন। আজ তাঁহার ৮ বৎসরের সাধনা সফল হইল। সিঙ্গাপুর, হংকং ও অন্যান্য বন্দরে চীনা নরনারী দলবদ্ধ হইয়া জাহাজঘাটে আসিয়া তাহাদের জাতির নির্ব্বাচিত নেতাকে অভিনন্দন করিয়া গেল। সান ১৮ বৎসর লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরিয়াছেন, আজ তিনি বিজয়ীবেশে সগর্ব্বে দেশে ফিরিলেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চিং সম্রাটকে বুঝাইলেন, জাতির এই আন্তর্ব্বিবাদ মোটেও শুভ নহে। হয় ত সম্রাট তাঁহার সৈন্য-বলের জোরে পরিণামে জয়ী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না, বরং জাতি আরও দুর্ব্বল হইবে। ইহাতে বিদেশী শত্রুদের প্রকারান্তরে সাহায্য করা

হইবে। এই অবস্থায় সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগ করাই উচিৎ; সম্রাট তাহাই অনুমোদন করিলেন। সান-ইয়াৎ-সেনকে ও বিদ্রোহী সেনাপতি লি-ইয়ান হুংকে, ইয়ান-শী-কাই এই খবর জানাইলেন। সান ইয়ান-শীকে রাষ্ট্রনায়ক (President) হইতে অনুরোধ করিয়া উত্তর দিলেন।

সান রাষ্ট্রনায়কের পদ ত্যাগ করিলেন এবং আবার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন। এই নির্ব্বাচনের ফলে ইয়ান-শী-কাই রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু চীনা গণতন্ত্রীদল পাশ্চাত্যের অনুকরণে সম্রাটকে হত্যা করিল না। একমাত্র শাসন-ক্ষমতা ভিন্ন, তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই রহিল, এমন কি সম্রাট উপাধিও রহিল। সম্রাট বৎসরে ৪০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন, ঠিক হইল।

সান রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাতেই দেশের সমস্ত দুঃখ ও অযোগ্যতা দূর হইবে না—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করায়, দেশের দুঃখ ও অযোগ্যতা দূর করার প্রথম ও প্রধান অন্তরায় দূর হইল মাত্র। এখন তিনি দেশের নৈতিক, মানসিক ও অন্যান্য উন্নতি সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। দেশবাসীর অজ্ঞতা দেখিয়া, তিনি বড় কষ্ট পাইতেন, তাই লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল।

এদিকে ইয়ান-শী-কাই, কিছুদিন গণতন্ত্র চালাইবার পর, নিজেই সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন। আবার সান তাঁহার

অনাড়ম্বর জীবন ছাড়িয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সানের চেষ্টায় ও দেশবাসীর উত্তেজনায় ইয়ান-শী কে সম্রাট উপাধি ত্যাগ করিতে হয়; নূতন কোন ব্যবস্থা করার পূর্ব্বেই ইয়ান-শী মারা যান। অনেকের অনুমান তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ইয়ান-শী র বহু দোষ ছিল, কিন্তু তাঁহার গুণও অনেক ছিল। তিনি নিজের দেশকে ভালবাসিতেন এবং নিজের বিশ্বাস অনুসারে দেশের অনেক হিতও করিয়াছেন। তিনি ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন—রাজপক্ষ ও গণতান্ত্রিক পক্ষ উভয়েই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সময় পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত যে দেশে রক্তগঙ্গা বহিয়া যায় নাই, তাহাও অনেকটা ইয়ান-শীর জন্য।

নানা গোলমালের মধ্যে চীনা গণতন্ত্র সন্তোষজনক উন্নতি করিতে পারে নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লব ও অন্তর্যুদ্ধ প্রায়ই চলিতেছিল। অনেকে হয়ত ইহাতে চীনাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে—কিন্তু প্রত্যেক দেশেই বিপ্লবের পর গৃহবিবাদ হইয়া থাকে। ফরাসী বিপ্লব, ইংরাজদের বিপ্লব, বলসেভিক বিপ্লব, সর্ব্বত্রই এই গৃহবিবাদ দেখিতে পাই। গৃহবিবাদ কেবল চীনের ভাগ্যেই জুটিয়াছে এমন নহে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এই গৃহবিবাদের জন্য প্রস্তুত থাকাই স্বাভাবিক। একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর দেশের শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্বসম্মানিত করিতে সময় লাগে। কিন্তু সেই ভয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে বিরত হওয়া বীরত্ব বা সঙ্গত নহে। অবশ্য বিপ্লববাদীদের

লক্ষ্য থাকা উচিৎ, যাহাতে দেশবাসীর অনর্থক রক্তপাতে তাহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত না হয়। ফ্রান্স ও রুষিয়ার তুলনায় চীনের গৃহবিবাদ উল্লেখযোগ্যই নহে।

১৯১৭ খৃঃ অব্দে চাং হুছুন নামে এক ব্যক্তি বালক সম্রাটকে আবার সিংহাসনে বসান। কিন্তু ২।৪ দিনের বেশী তাঁহাকে সিংহাসনে বসিবার সুযোগ দেওয়া হইল না—টুয়ান ও য়ু-পাই-ফু নামক দুই ব্যক্তির সামরিক বলের নিকট শীঘ্রই সম্রাটপক্ষকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্রমে চীনের অন্তর্বিরোধের ফলে, উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন অল্প অল্প করিয়া ভিন্ন হইতে লাগিল। দক্ষিণ চীন সান-ইয়াৎ-সেনের অধিনায়কত্বে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বদেশী ভাবাপন্ন। উত্তর চীন অনেকটা রাজতান্ত্রিক ও জাপানী প্রভাবে প্রভাবিত। ইতিমধ্যে ইউরোপের মহাযুদ্ধের ঢেউ এসিয়ায় লাগিল—চীনের বুকের উপর বসিয়া জাপান ও মিত্রশক্তিরা জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিল। মিত্রশক্তি জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, জার্ম্মেণগণ বেলজিয়মের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ (neutral) চীনের বুকের উপর বসিয়া কামান দাগা ও নররক্ত লইয়া হোলি-খেলা, কি করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিধান-সঙ্গত, বুঝা যায় না।

উত্তর চীন মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিল—সান-ইয়াৎ-সেন ও দক্ষিণ চীন তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন।

লড়াই চলিল, এবং ক্রমে শেষও হইল। জাপান জার্ম্মেণীর কিয়াচু প্রভৃতি বন্দর দখল করিল। প্রথম প্রথম জাপান বলিত, লড়াইয়ের পর সেই সব স্থান চীনাদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হইবে; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত নানা অজুহাতে সে তাহা ফিরাইয়া দেয় নাই। জাপানের সহিত চীনের সদ্ভাব বহু দিন যাবৎই ছিল না—ক্রমে প্রায় সমগ্র চীনাজাতি জাপান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিল—বিশেষ কোরিয়ায় জাপানী শাসনের ও জাপানী চরিত্রের যে নমুনা তাহারা দেখিয়াছে, তাহাতে তাহারা আরও অধিক জাপান-বিদ্বেষী হইল এবং জাপানের ভয়ে কতকটা ভীতও হইল।

এই সময় চীনে আর এক শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি য়ু-পাই-ফু। ১৯১৭ সালে বালক সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিতে, তিনিই প্রধান নেতা ছিলেন এবং সেই হইতে য়ু ক্রমে ক্রমে দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইতেছিলেন। তিনি নানাস্থানে নানাভাবে চীনের ঐক্য ও মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ খৃঃ অব্দের জয়ের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাপান নানা ভাবে চীনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। চীনের বহু উচ্চ কর্ম্মচারী জাপানের উৎকোচভোগী ছিল। 'আনফু সঙ্ঘ' (Anfu club) নামে নানাস্থানে জাপান-পক্ষপাতী বহু সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সব সংঘ আমাদের দেশের সংঘ বা clubএর মত নিরীহ প্রকৃতির ছিল না---তাহাদের সামরিক সরঞ্জামও ছিল।

১৯২০ অব্দে য়ু, জাপান-পক্ষপাতী এই সব ক্লাবগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গী সেনাপতি টুয়ান এই জাপভক্ত সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন। ইহার পর এই সব সঙ্ঘের সভ্যগণ পেকিনে জাপ মন্ত্রীর আশ্রয়ে (Japanese Legation) কোন প্রকারে লুকাইয়াছিল। য়ু-পাই-ফুর দৃঢ় ধারণা যে, বর্ত্তমানে জাপানই চীনের ঐক্য ও উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।

এই জয়ের পর য়ু র প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উত্তর চীনের সরকার তখনও চীনের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী ও রাজ-তান্ত্রিক। বাস্তবিক উত্তর চীনের সরকারই বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের দ্বারা স্বীকৃত -দক্ষিণ চীন যদিও উত্তর চীনকে মানে না এবং নিজেকে স্বাধীন মনে করে, তথাপি বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ দক্ষিণ চীনকে স্বাধীন সরকার বলিয়া স্বীকার করে না। উত্তর চীন কার্য্যতঃ রাজতান্ত্রিক চাং-ছো-লিনের দ্বারা চালিত ও শাসিত হয়—চীনের রাষ্ট্রনায়ক (President) ও মন্ত্রীসভা কার্য্যতঃ তাঁহারই নির্ব্বাচিত ও তাঁহারই আদেশে চালিত। দক্ষিণ চীনে সান-ইয়াৎ-সেন এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। এই সময় য়ু-পাই-ফু চীনের ঐক্য সাধনের জন্য এবং চীনকে জাপ-প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১৯২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি মধ্য-চীনকে উত্তর-চীন হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিয়া এক সৈন্যদল গঠন করেন। চাংএর ৩ লক্ষ

সুশিক্ষিত সৈন্য য়ু-পাইর বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে লাগিল। জাপান তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। রাজতান্ত্রিক চাং-হ্সুন (যিনি ১৯১৭ খৃঃ অব্দে বালক সম্রাটকে সিংহাসনে বসাইয়া, পরে য়ু-র নিকট পরাজিত হন) ও জাপ-ভক্ত সেনাপতি টুয়ান (যিনি ১৯১৭ অব্দে রাজতান্ত্রিকদের বিপক্ষে য়ু-র সঙ্গী ছিলেন এবং যিনি ১৯২০ অব্দে 'আনফু সংঘে'র নেতা-ভাবে য়ু-র নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন), চাং-ছোলিনের সহিত য়ু-পাইর বিরুদ্ধে যোগ দিলেন। চাং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, সানকে হাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সান ও চাংএর মধ্যে বহুদিন হইতেই শত্রুতা ছিল। সানও জাপান-বিদ্বেষী—তিনি চীনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চান। চাং-ছোলিন ইহাতে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু চাং তাঁহাকে বুঝাইলেন, যে য়ু-পাই-ফু তাঁহাদের উভয়ের সমান শত্রু। মোটের উপর সানের ধারণা হইল যে, য়ু-পাই চীনের উন্নতি ও মুক্তির পরিপন্থী। তাঁহার বোধ হয় আশঙ্কা ছিল যে, চতুর ও শক্তিশালী য়ু-পাই হয়ত বা জয়ী হইয়া ইয়ান-শী-কাইর মত নিজেই সম্রাট হইবেন। তাই তিনি চাংএর সহিত যোগ দিলেন। উত্তরে ও দক্ষিণে সমস্ত চীন য়ু-পাইর বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে লাগিল। শক্তিহীন রাষ্ট্রনায়ক (President) দূর হইতে এই সব শক্তির পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এক ফতোয়া জারী করিলেন, কেহ যেন যুদ্ধ না করে। কে তাঁহার আদেশ শুনে? তাঁহার শান্তি-স্থাপনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পিকিনের নিকটেই প্রধানতঃ লড়াই চলিল। য়ু যুদ্ধে জয়যুক্ত হইলেন। চাং পলাইয়া মাঞ্চুরিয়ায় যান এবং সেখানে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ইহাতেও কৃতকার্য্য হন নাই।

উত্তরে চাং পরাজিত হইলে পর, দক্ষিণে সান-ইয়াৎ-সেন, য়ু-পাই-ফুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। কিন্তু সানের সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ সৈন্য সেনাপতি চেন-চিয়াং-মিংএর পক্ষে রহিল। সেনাপতি চেন, য়ূ-পাই-ফুর সহিত যোগ দিলেন। সানের প্রধান ভরসা চেন ও তাহার সৈন্য-দের উপর। কাজেই যুদ্ধে সানের পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত এবং হইলও তাই। চেনের সহিত য়ূ-পাইর সর্ত্ত হইল যে আপাততঃ ১৯১২ অব্দের অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্ত চীনকে এক শাসনাধীন করিতে হইবে—পরে শাসন ব্যবস্থার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা যাইবে।

যুদ্ধের পর য়ু ও চেন শাসন-সংস্কারে মন দিলেন। রাজ্যের সমস্ত সৈন্য কেন্দ্রীয় সরকারের (Central Government) অধীনে থাকিবে। ট্যাক্স ধার্য্য ও আদায় করার ভারও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে। তবে অন্যান্য বিষয়ে, বিভিন্ন প্রদেশ-গুলির স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা (Provincial Autonomy) থাকিবে। পূর্ব্বের মত আর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের সামরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে না—তাহারা কেবল শাসনকর্ত্তাই

(Civil officers) থাকিবে। এই সব শাসনকর্ত্তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হিসাব দিতে বাধ্য ও দায়ী থাকিবে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, রাস্তাঘাট সকলের উন্নতিবিধান করিতে হইবে।

চাং এর পলায়নের পর হইতে উত্তর ও মধ্য চীন য়ু র অধীনে একরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সানের পরাজয়ের ২।৩ মাস পরে দক্ষিণ চীনও ইহাতে যোগ দিল—তাহাদের প্রাদেশিক সমিতি (Provincial Assembly) এক প্রস্তাব পাশ করিল যে, কেণ্টনের ভিন্ন রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থা লোপ করিয়া, তাহারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সহিত যোগ দিবে।

যুদ্ধ জয়ের কিছুদিন পরেই য়ু রাজনীতি পরিহার করিবার ইচ্ছায় নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থা (constitution) ঠিক করিবার জন্য, তাঁহাকে আবার রাজনৈতিক আবর্ত্তে আসিতে হইল। রাষ্ট্রনায়ক হসু (Hsu) নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া রাজ্যভার হইতে অব্যাহতি চাহিলেন এবং পদত্যাগ পত্র দিলেন। অস্থায়ী ভাবে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। কিছুদিন পরেই, লি-ইউন-হুংকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল। লি-ইউন-হুং ১৯১২ অব্দের বিদ্রোহের সেনাপতি ছিলেন ; বিদ্রোহের সময় তিনি সানকে রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া আহ্বান করেন এবং বিদ্রোহের পর, ইয়ান-সি-কাইর মৃত্যুর পর তিনি রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত হন।

সান তাঁহার এই নির্ব্বাচনে আপত্তি করেন এবং বাধা দেন। কিন্তু তিনি আবার পরাজিত হইয়া কেণ্টন হইতে পলায়ন

করেন। তিনি কিছুদিন জাপানে ছিলেন; পরে য়ু-পাই-ফু তাঁহাকে আবার দেশে আহ্বান করিয়া আনেন। সান আবার ধীরে ধীরে জাতির প্রাণে তাঁহার পূর্ব্বস্থান দখল করিতে লাগিলেন। এদিকে ওয়াসিংটন বৈঠকে (Washington Conference) চীন সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা হইল। ঠিক হইল যে ছয় মাসের মধ্যে জাপান কিয়াচু ফেরত দিবে। ১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে জাপান তাহা ফেরৎ দিয়াছে। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ সকলেই চীনের স্বাধীনতা ও নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে চীনের একাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু কার্য্যতঃ, তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার পালন করিল না। যত প্রকারে সম্ভব চীনকে শোষণ করিতে তাহারা ত্রুটী করিল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় চীন মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল। চীনদেশের কুলি ও মজুর যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্রশক্তির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পথে বা যুদ্ধক্ষেত্রে এই সব চীনা কুলি অতীত কালের নিগ্রোদাসদের মতই ব্যবহার পাইয়াছে। মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া সাগর পারে লইয়া যাওয়ার পথে ও পরে তাহাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু সন্ধির সময় চীনাদের কোন দাবীই মিত্রপক্ষ শুনিল না। ফলে ভার্সেল সন্ধিপত্রে চীনাদূতের স্বাক্ষর হয় নাই; কারণ কিয়াচু সম্বন্ধে কোন মীমাংসাই না হওয়াতে চীনাগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিল না। যুদ্ধের পরও বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনের উপর অত্যাচার করিতে কসুর করে

নাই। এই সব কারণে চীনের সাধারণ অধিবাসীদের মনে বিদেশীর প্রতি হিংসা ও দ্বেষের ভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহারই ফলে নানাস্থানে দলবদ্ধ চীনারা বিদেশীর উপর অত্যাচার ও তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই অজুহাতে বৈদেশিক শক্তিরা চীনের উপর নিজেদের অধিকার আরও দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিল। চীনের এমন শক্তি নাই যে, এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিরোধ সে করে। চীনে তখনও কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রশক্তি গড়িয়া উঠে নাই।

চারিদিক হইতেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু কেহই সে দিকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে নাই। এমন সময় ছাও-কুন (Tsao kun) রাষ্ট্রনায়ক (President) নির্ব্বাচিত হইলেন। গুজব যে ছাও কুন বহুমুদ্রা উৎকোচ দিয়া এই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ছাওকুন বহুদিন যাবৎই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে চাং-হছুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৯২০ খৃঃ অব্দে জাপানীদের পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠ-পোষিত আনফু ক্লাবগুলি ধ্বংস করিতেও তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে চীনে একচ্ছত্র শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয়।

এদিকে নব্য চীনের দীক্ষা-গুরু ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কেণ্টনের 'কাষ্টমস্ হাউস' দখল করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা কেণ্টন বন্দরের শুল্ক ও বন্দরের উপর বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া চীন সরকারের প্রাধান্য স্থাপন করা। নয় খানা বৈদেশিক যুদ্ধ জাহাজ তাঁহাকে বাধা দিতে কেণ্টনে সমবেত হয়—ই াদের মধ্যে ইংরেজ অগ্রণী। সান-ইয়াৎ-সেন বলেন, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে একা চীনের লড়াই করা সহজ নহে। কিন্তু যে করিয়াই হউক এখনই বৈদেশিক প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইবে। দরকার হয় ত এই জন্য রুশিয়ার সাহায্য লইতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

চীনের শাসন-পদ্ধতি

চীনের শাসনযন্ত্রের তিনটী প্রধান অঙ্গ :—রাষ্ট্রনায়ক (President) ; মন্ত্রীসভা (Cabinet) ও প্রতিনিধি-সভা (Senate)। প্রতিনিধি সভার দুইটি অঙ্গ—উচ্চ ও নিম্ন সভা। এই প্রতিনিধি-সভার উভয় অঙ্গের সম্মিলিত সভ্যদের ভোটে রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত হন।

প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়ার স্বাভাবিক অর্থ এই হয় যে, রাষ্ট্রনায়ক সেই সভার অধীন ও সেই সভার নিকট জবাব-দাহী। কিন্তু ইয়ান্-শী-কাইর আমল হইতে রাষ্ট্রনায়কই কার্য্যতঃ প্রতিনিধি-সভার প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রনায়কগণ বহুবার এই সভাকে নিজের খেয়াল অনুসারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রতিনিধি-সভার মত লইয়া রাষ্ট্রনায়ক সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু উহার মত না লইয়া পারেন না। এই হইল আইনের কথা,

কিন্তু কার্য্যতঃ এই আইন মানা হয় না। ইয়ান-শী-কাই অন্ততঃ দুইবার এই আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। ১৯১৭ খৃঃ তৎকালীন রাষ্ট্র-নায়ক প্রতিনিধি সভার মত না লইয়াই জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রতিনিধি-সভা কেণ্টনে সম্মিলিত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করে।

রাষ্ট্রনায়কের সাহায্যার্থে এক মন্ত্রী-সভা আছে। মন্ত্রিগণ প্রতিনিধি-সভার নিকট দায়ী। কিন্তু প্রথম হইতেই রাষ্ট্রনায়কের সহিত মন্ত্রীসভার ঝগড়া আরম্ভ হয়। ইয়ান-শী-কাই প্রতিনিধি-সভা ও মন্ত্রীসভা উভয়ই ভাঙ্গিয়া দেন। মন্ত্রীসভার মধ্যে এক এক বিভাগের জন্য এক একজন মন্ত্রী আছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯১২ খৃঃ এক শাসন-পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ১৯:৮ খৃঃ আবার পুরাতন শাসনপদ্ধতি (Constitution) পরিবর্ত্তিত হইয়া, এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, এই পরিবর্ত্তনের ফলে প্রতিনিধি-সভা ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা বাড়ান হয়।

চীন গণতন্ত্রকে ঠিক যুক্তরাষ্ট্র (Federal republic) বলা যায়-না, অথচ পূর্ণ কেন্দ্ররাষ্ট্রও (Unitary state) বলা যায় না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই চীনের আত্ম-কলহের মূল। প্রত্যেক প্রদেশেই একটী করিয়া প্রাদেশিক সভা আছে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই একজন সামরিক নায়ক আছেন। আইনতঃ কেহ কাহারও অধীন নয়, কিন্তু সামরিক নায়করা নিজেদের সামরিক ক্ষমতার

অপব্যবহার করিয়া শাসনকর্ত্তাদের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিয়াছিল। অবশ্য বর্ত্তমানে ঐ সব সামরিক শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা খর্ব্ব হইতেছে। ১৯২৬-২৭ অব্দের বিপ্লবের পর দক্ষিণের জাতীয়দল কেন্দ্ররাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়াছেন। জাতীয়দলের নেতা চাঙ্গ-কাই-সেক এখন রাষ্ট্রনায়ক এবং পেকিন হইতে নানকিঙ্গে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছে। ক্রমে চাঙ্গ-কাই সেকের আমলে সব প্রদেশেই কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, আশা করা যায়।

চীনে ২১টী প্রদেশ আছে। ইহা ভিন্ন মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও চীনা তুর্কিস্তানও চীনের অন্তর্গত। কিন্তু এই তিনটী প্রদেশ ও প্রদেশের শাসন-পদ্ধতি ও অন্য নানা ব্যবস্থায় বহু প্রভেদ আছে।

বর্ত্তমানে জাতীয় দল সান-ইয়াৎ-সেনের কুমিঙ্গটান দলের পন্থা ও উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছে। কুমিঙ্গটান দলের তিনটী মূলনীতি ছিল—জাতীয় স্বাধীনতা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র। রাষ্ট্রশাসনের পাঁচটি অঙ্গ তিনি নির্দ্দেশ করেন—কার্য্যনির্ব্বাহক (Executive), বিচার (Judiciary), ব্যবস্থাপক (Legislative), দণ্ড (Punishment) এবং পরীক্ষা (Examination)। কুমিঙ্গটাঙ্গ দল যে আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, আজ সমস্ত রাষ্ট্র সেই আদর্শে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। সে সব কথা পরে আলোচিত হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণ চীন

উত্তর ও দক্ষিণ চীনের দীর্ঘকালব্যাপী কলহই চীনের সমস্ত জাতীয় জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইয়াংসি নদীর উত্তরে ও দক্ষিণে দুই দলে বহু বৎসর যাবৎই বিবাদ চলিতেছে। খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত চীন পীত নদীর উত্তরেই ছিল; এই নদীর দক্ষিণের লোকদিগকে উত্তরের লোকেরা বর্ব্বর ও অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিত। খৃঃ পূর্ব্ব ২২০ অব্দে সম্রাট চ'ইন (Ch'in) দক্ষিণ দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। ক্রমে দক্ষিণ দেশেও উত্তর চীনের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচলিত হয়। এই দীর্ঘকালের একত্র বাসের ফলে, এই দুই প্রদেশের মধ্যে ভাবের ও আদর্শের অনেক ঐক্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে অনৈক্যও আছে বহু। উত্তর চীন প্রধানতঃ কৃষিজীবী, কিন্তু দক্ষিণ চীন

হইল প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যজীবী। সমুদ্রকূলবর্ত্তী দক্ষিণের লোকেরা সাধারণতঃ নৌ-চালনায় বিশেষ পটু। বহু বিদেশী, বিশেষতঃ পর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়াতে, দক্ষিণীগণ সহজেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ পায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা দক্ষিণের বেশী হয়। বিপ্লববাদীদের গুপ্ত সমিতিও দক্ষিণেই বেশী প্রতিপত্তি লাভ করে। দক্ষিণীগণই বিপ্লব আনিয়াছে এবং তাহারাই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরীগণ প্রায়ই সম্রাটের পক্ষে ছিল।

উত্তরের প্রত্যেক প্রদেশেই বেশ সুশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ধরণে গঠিত এক একদল সৈন্য ছিল। এই সব সৈন্য দ্বারাই সাম্রাজ্যতান্ত্রিকগণ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই উত্তরী সৈন্যই গণতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে ইয়ান-সি-কাই ও টুয়ানকে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহারা দক্ষিণী সৈন্যদল বরখাস্ত করিয়া দক্ষিণে ঐ উত্তরীয় সৈন্য লইয়া বসাইয়াছিলেন এবং ঐ সৈন্য দক্ষিণীদের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে।

কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণের ঝগড়ার অন্যতম প্রধান কারণ উত্তর প্রদেশসমূহের শাসনকর্ত্তাগণ। এই সব শাসনকর্ত্তারা নিজেদের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানেন-না। বাস্তবিক কেন্দ্র সরকার (Central Govt.) উত্তরীয়দের হাতে; যদি সম্মিলিত উত্তরীয়গণ একত্র হইয়া চেষ্টা করিত, তবে সামরিক হিসাবে দক্ষিণকে পরাজিত করা বিশেষ

চিয়াং কাই সেক।

কঠিন হইত না। কিন্তু কেন্দ্র-সরকারকে এই সব বিভিন্ন শাসন-কর্ত্তাদের মন যোগাইয়া চলিতে হইত। আবার দক্ষিণের অবস্থাও ঠিক তাই। যদিও দক্ষিণ প্রদেশই গণতন্ত্র আন্দোলনের জন্মভূমি, কিন্তু তথায়ও বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কলহ লাগিয়াই ছিল। এই সবটার ফলে এই হইল যে, উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রমাগতই যুদ্ধ চলিতেছিল। আজ আশা হয়, দীর্ঘকালের পরে ইহার একটা নিবৃত্তি হয়ত হইয়াছে।

এই বিবাদ মিটাইবার প্রধান উপায়—যদি একজন শক্তিমান পুরুষ কেন্দ্র-সরকার হাত করিয়া, সমস্ত প্রাদেশিক সৈন্য উঠাইয়া দিয়া, কেন্দ্র সরকারের হাতে সব সৈন্যের ভার ন্যস্ত করে। বর্ত্তমানে চিয়াঙ্গ-কাই-সেক তাহা করিতেছেন। সমস্ত যুক্ত-রাষ্ট্রেই (federal state) এই নিয়ম। যথা, জার্ম্মেণী, আমেরিকা, সুইজার্ল্যাণ্ড। এই বিরোধ দূর করিবার দ্বিতীয় উপায়—উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যাওয়া-আসার সুবিধা করিয়া পরস্পরে মেলা-মেশার ফলে, একের অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ব-বোধ জাগান। কিন্তু এই সব করে কে? একটা শক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার না থাকিলে, এই সব করা যে অসম্ভব। বহুদিনের বিরোধের পর আজ উত্তর ও দক্ষিণ চীন একটা কেন্দ্র-সরকারের অধীন হইয়াছে। রাষ্ট্রনায়ক চিয়াঙ্গ-কাই-সেক সৈন্যদের নিকট খুবই জনপ্রিয়, তিনি শক্তিমানও বটে। তাই আশা করা যায়, তাহার শাসনে চীনের এতদিনের গলদ দূর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ চীনের বিরোধও তিরোহিত হইবে।

চীন ও মহাযুদ্ধ।

১৯১৪ অব্দে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহার ঢেউ সুদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল। জাপান যখন যুদ্ধে যোগ দিল, তখন চীনকেও যুদ্ধে নামান কষ্ট হইত না। ইটালী, রুমেনিয়া প্রভৃতি জাতিকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য মিত্রপক্ষ যে সব প্রলোভন ও উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়াছিল, চীনের সম্বন্ধে তাহা করারও দরকার হইত না। মিত্রপক্ষ যদি তাহাদের অন্যায় দাবীগুলির অন্ততঃ কয়েকটাও রহিত করার ভরসা দিত, তবেই চীন যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তাহাদের সহিত যোগ দিত। কিন্তু প্রধানতঃ জাপানের আপত্তিতে চীনকে যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য প্রলোভিত করা হইল না। জাপানের ইচ্ছা ছিল, জার্ম্মানীর কিয়াচু দুর্গ ও সাংটাংএর সম্পত্তি দখল করার পূর্ব্বে চীনকে যুদ্ধে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না। জাপান জার্ম্মানীকে লিখিল, "প্রাচ্যে শান্তি-

রক্ষার জন্য ৭ দিনের মধ্যে কিয়াচু দুর্গ আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" জার্ম্মানী ইহার কোন জবাব দিল না, কিন্তু জার্ম্মান সম্রাট কাইজার কিয়াচু দুর্গে টেলিগ্রাম করিল—"It would shame me more to surrender Kiaochow to the Japanese, than Berlin to the Russians". ১৯১৪ সনের নভেম্বরে জাপান কিয়াচু দুর্গ দখল করিল। কিয়াচু ও সাংটাং দখল করিয়া জাপান রুষিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত গোপন চুক্তি করিল যে,কিয়াচু ও সাংটাং জাপানের অধিকারেই থাকিবে। মিত্রশক্তির তরফ হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া, কিয়াচু দখল করার পরই জাপান চীনের উপর চাপ দিতে লাগিল। সে চীনের উপর ২১ দফা দাবী করিল। এই ২১ দফা দাবীর ফলে চীন প্রায় জাপানের সামন্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইল। মিত্র শক্তিরা জাপানকে সন্তুষ্ট রাখিতে এতই ব্যস্ত ছিল যে, তাহারা ইহাতে একটুও প্রতিবাদ করিল না। তাহারা জানিত যে জাপান প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে আর বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে না। কিন্তু জাপান যাহাতে জার্ম্মেনীর সহিত ভিন্ন সন্ধি না করে অথবা বিপক্ষতা না করে, সেই জন্যও জাপানকে সন্তুষ্ট করা দরকার। লেঙ্গফোর্ড (J. H. Langford) তাহার 'Evolution of New Japan' গ্রন্থে পরিষ্কারই লিখিয়াছেন যে, গত যুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তিকে কতটা সাহায্য করিয়াছে তাহা বিচার্য্য নহে, ইচ্ছা করিলে সে মিত্রশক্তিদের কতটা অনিষ্ট করিতে পারিত অথচ তাহা করে নাই, তাহাই হইল বিচার্য্য; বাস্তবিক

কিয়াচু দখল করার পর, জাপান প্রায় নিরপেক্ষই (neutral) ছিল।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই চীনকে এই সব দাবী স্বীকার করিতে হইল। ২১টা দাবী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল মাত্র। তখনও আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তাই জাপানকে তুষ্ট রাখিতে সে তত ব্যস্ত ছিল না। সে প্রতিবাদ করিয়া জাপানকে জানাইল যে,এই সব দাবীর বৈধতা সে মানিবে-না। কিন্তু আমেরিকাও যুদ্ধে যোগ দিবার পর কার্য্যতঃ চীনের উপর জাপানের দাবী স্বীকার করিল। সেই সময় জাপান ও ইয়াঙ্কির মধ্যে ইষাই-লেনসিং (Ishii-Lansing agreement) স্বাক্ষরিত হইল।

ইহার পর জাপান দেখিল, এখন চীন যুদ্ধে যোগ দিলে তাহার বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই। নানা চুক্তির দ্বারা মিত্র ও সম্মিলিত শক্তিসমূহের হাত পা বাঁধিয়া লইয়াছে, এখন সে সব চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চীনের উপর তাহার দাবী অমান্য করা তাহাদের পক্ষে কষ্ট।

আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিবার পর, চীনের আমেরিকান দূত মিঃ রিন্‌ষ (Reinsch) চীনকেও যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈদেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে আমেরিকাকেই চীন সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করিত। মিঃ রিন্‌ষ চীনকে কিছু আশাও দিল, কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে-সব আশা তিনি চীনকে দিতেছেন তাহা পূরণ করার ক্ষমতা

তাঁহার নাই, কারণ জাপানকে সন্তুষ্ট রাখিতে মিত্রশক্তিরা চীনের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার জাপানের নিকট বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমেরিকা যখন না জানিয়া চীনকে নানা আশা দিতেছিল, মিত্রশক্তিরা তাহার কোনই প্রতিবাদ করিল-না। এই মৌনভাবের দ্বারা তাহারা কার্য্যতঃ আমেরিকা ও চীনকে প্রতারিত করিল এবং 'ভার্সেল সন্ধি'র সময় এই প্রতারণা ধরা পড়িল: তখন চীন ও আমেরিকা সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল না। যা'ক, প্রতারিত চীন যুদ্ধে যোগ দিল (১৯১৭, ১৪ই আগষ্ট)।

এই যুদ্ধে চীন মিত্রশক্তিদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। অবশ্য মিত্রশক্তিরাও তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য আশা করে নাই। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, চীনে জার্ম্মান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা ও চীন হইতে জার্ম্মানদের প্রতিপত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সমূলে নষ্ট করা। মিত্রশক্তিরা চীনের জার্ম্মানদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল—সরকারী সম্পত্তি ত' করিলই, এমন কি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও (Personal property) তাহারা বাজেয়াপ্ত করিল। ইহার ফলে চীনে জার্ম্মানদের আর্থিক দুর্দ্দশার একশেষ হইল। অথচ যুদ্ধ-বিরতি পর্য্যন্ত এই সব জার্ম্মানদিগকে চীনেই থাকিতে হইল। যুদ্ধের পর অতি বর্ব্বর ও নিষ্ঠুরভাবে জাহাজ বোঝাই করিয়া তাহাদের দেশে পাঠান হয়। *

* The confiscation of German property was duly carried out—not only public property but private property also, so that

দক্ষিণ চীনের নেতা সান-ইয়াৎ-সেন যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। প্রতিনিধি-সভার মত ভিন্ন চীনরাষ্ট্র কোন যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে না, ইহাই ছিল চীনরাষ্ট্রের নিয়ম। কিন্তু প্রতিনিধি-সভা মন্ত্রী-সভার এই প্রস্তাবে মত দিল না। যুদ্ধবাদী দল ভয় দেখাইয়াই তাহাদের মত পাইবার চেষ্টা করিল। তখন বহু প্রতিনিধি দক্ষিণ চীনে পালাইয়া গেলেন। সেখানে তাহারা পিকিনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সেখানে ডাঃ সানের নেতৃত্বে দক্ষিণের জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

যুদ্ধ শেষ হইল। সন্ধির সময় মিত্রপক্ষ চীনকে 'অষ্টরম্ভা দেখাইল'। চীন অনেক চেষ্টা করিয়াও কিয়াচ্ পাইল না। আমেরিকাও চীনের পক্ষ সমর্থন করিল। কিন্তু মিত্রশক্তিরা পূর্ব্বে জাপানকে কিয়াচ্ দান করিয়াছে, আজ ন্যায়ের খাতিরে

the Germans in China were suddenly reduced to beggary.... .. They were sent home through the tropic in over-crowded ships with only 24 hours' notice : no degree of hardship was sufficient to secure exemption. The British authorities insisted on expelling delicate pregnant women, whom they officially knew to be very likely to die on the voyage. All this was done after the armistice, for the sake of British trade. The kindly Chinese took upon themselves to hide Germans, in hard cases, from the merciless persecution of the allies : otherwise the miseries inflicted would have been much greater.

Problems of China. pp—141—142.

মিত্রবর জাপানকে রুষ্ট করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার পুরস্কার হইল কিয়াচু-বিয়োগ ও জাপানের ২১ দফা দাবী।

চীনের প্রতি যে অন্যায় করা হইল, তাহা সংশোধনের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক মিঃ হার্ডিং ওয়াসিংটনে এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক আহ্বান করেন। আমেরিকা, বেলজিয়াম, চীন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ইটালী, ফ্রান্স, জাপান, হল্যাণ্ড ও পর্ত্তুগেল এই নয়টি জাতির প্রতিনিধি ১৯২১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াসিংটন নগরে সমবেত হইয়া, চীন ও সুদূর প্রাচ্য সমস্যার আলোচনা করে। এই সভায় ঠিক হয় (১) সকল জাতিই চীনের ভৌগোলিক ও শাসনিক অখণ্ডত্ব (territorial & admimis-trative integrity) মান্য করিবে।

(২) চীনে এক স্থায়ী ও শক্তিশালী কেন্দ্র-সরকার প্রতিষ্ঠায় কেহই কোন বাধা না দিয়া বরং সে বিষয়ে চীনকে সাহায্য করিবে।

(৩) চীনে সকল জাতির পক্ষেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমান সুযোগ ও সুবিধা থাকিবে।

(৪) কেহই চীনের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কোন বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারিবে না।—কারণ তাহাতে অন্য দেশের প্রজাদের সুযোগ ও অধিকার খর্ব্ব করা হইবে।

অন্যান্য যে সব আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে কেবল চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের (territorial

integrity) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এইবারে সেই সঙ্গে শাসনিক অখণ্ডত্বের (administrative integrity) কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। চীনের কোন প্রদেশই কেহ আত্মসাৎ না করিয়াও বৈদেশিক শক্তিসমূহ, তাহার শাসনকার্য্যে এত রকমে হস্তক্ষেপ করিত যে, তাহাতে চীনের স্বাধীনতা প্রায় লোপ পাইবার মত হইয়াছিল। বৈদেশিক সৈন্য, বৈদেশিক ডাকবিভাগ extra-territorial rights, বাণিজ্য ও লবণ শুল্কের উপর বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব, রেল লাইনের ও খনির উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব—প্রভৃতি নানা উপায়ে বৈদেশিক শক্তিগুলি চীনের স্বাধীন রাষ্ট্রত্ব লোপ করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যার উদয় হইল। চীনের প্রনিনিধিরা আশঙ্কা করিল যে এই সব প্রস্তাবে বর্ত্তমান বৈদেশিক প্রভাব ও বিশেষ সুবিধার উল্লেখ নাই। কাজেই তাহারা মনে করিতে পারে যে, এই প্রস্তাবগুলি বর্ত্তমানকে মান্য করিয়া কেবল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অপরদিকে শক্তিসমূহ মনে করিল, ভৌগোলিক ও শাসনিক অখণ্ডত্ব (Territorial and administrative integrity) মানিয়া লওয়ার অর্থই হয়ত এই যে, তাহাদের বর্ত্তমান প্রভাব ও বিশেষ সুবিধাগুলি আপনা হইতেই নাকচ হইয়া গেল। বাস্তবিক হওয়াও উচিত ছিল তাহাই। অনেক আলোচনার পর ঠিক হইল যে বর্ত্তমানকে চিরস্থায়ী বলিয়া মানাও হইবে না, আবার আপনা হইতেও বর্ত্তমান নাকচ হইবে না। এই প্রস্তাবগুলিকে মূলনীতি বলিয়া মানিয়া ভবিষ্যতে চীনের

সহিত কাজ কারবার চালাইতে হইবে এবং দরকার মত বৈদেশিক শক্তি সমূহ ক্রমশঃ তাহাদের প্রভাব ও দাবী প্রত্যাহার করিবে।

চৈনিক প্রতিনিধি Extra-territorial rights উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। উহা উঠাইবার পক্ষে তিনি নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন :—

(১) ইহা চীনের স্বাধীনতা ও জাতীয় সম্মানের হানিকর।

(২) এই প্রথার ফলে একই স্থানে একাধিক বিচারালয় ও আইন থাকায় বিচারকার্য্যের অসুবিধা হয়।

(৩) বৈদেশিকদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে বহুদূরে সেই বৈদেশিক অভিযুক্তের স্বজাতীয় দূতাবাসের (consular) বিচারালয়ে যাইতে হয় বলিয়া, অনেক সময় চৈনিকগণ বৈদেশিকদের অত্যাচার সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকে। দূরে যাইয়া নালিশ করা সব সময় সম্ভব নয়।

(৪) চীন প্রজারা যে সব কর ও শুল্ক দেয়, এই প্রথা থাকায় অনেক সময় বৈদেশিকরা তাহা এড়াইয়া চলে। ইহাতে একদিকে রাজ্যের আয় কমে, অপরদিকে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় চীনাদের ঠকা হয়।

১৯২৪ সনের জেনেভার সর্ব্বজাতি বৈঠকেও (League of Nations) চীনাদূত বলিয়াছিলেন যে, যতদিন Extra-territorial jurisdiction রহিত না হইবে, ততদিন চীন হইতে আফিং এর প্রচলন বন্ধ করা যাইবে না। কারণ বৈদেশিকদের

উপর চীন সরকারের প্রভাব না থাকায়, বৈদেশিকরা নির্ব্বিবাদে আইন ভঙ্গ করিয়া, এই বিষ গোপনে চীনে আমদানি করে। ইহার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই চীন সরকারের নাই।

ওয়াশিংটন বৈঠকে এক প্রস্তাব হইল যে, সকল জাতির এক-একজন প্রতিনিধি লইয়া এই সম্বন্ধে এক তদন্ত সভা বসান হউক। কিন্তু এই তদন্ত সভার অভিমত মানা কি না মানা তাহা প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ খুসী; এই বিষয়ে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে-না। এই প্রকার তদন্ত সভা বসাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য, চীনকে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য ঠাণ্ডা রাখা। ইহা প্রতারণারই নামান্তর। আজও চীন হইতে এই প্রথা উঠে নাই এবং সামরিক বলে শক্তি-মান না হওয়া পর্য্যন্ত চীন এই অপমান হইতে অব্যাহতি পাইবে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের সভ্যতার মাপকাঠিই হইল নরহত্যার কৃতিত্ব—যুদ্ধে যে যত শীঘ্র ও বেশী মানুষকে হত্যা করিতে পারিবে, সেই তত সভ্য। জাপান তাহা করিয়াই সভ্য-সমাজে স্থান পাইয়াছে—চীন এখনও তাহা পারে নাই বলিয়াই সভ্য সমাজে স্থান পায় নাই।

ইহার পর চীনে বৈদেশিক অধিকারের আলোচনা হয়। চীনদূত বলিলেন—ইংরাজ, ফরাসী ও জাপানীরা চীনের কয়েক স্থানের মালিক, চীনের territorial integrity রক্ষা করিতে হইলে, সেই সব স্থান ফেরৎ দেওয়া দরকার। ফরাসী দূত বলিলেন, যদি অন্যান্য সব জাতি তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহারাও কোয়াঙ্গ চুয়ান (Kwang Chouwan) ফেরৎ

দিতে রাজী আছে। ইংরাজরা বলিল, তাহারা ওয়াইহেওয়ে ফেরৎ দিতে রাজি আছে, কিন্তু কাউলুন (Kowloon) ফেরৎ দিবে না। কারণ কাউলুন ফেরৎ দিলে হংকং নিতান্তই অরক্ষিত হইয়া পড়িবে *, যে কেহ ইচ্ছা করিলে কাউলুন হইতে হংকং এ কামান দাগিতে পারিবে। জাপান বলিল, সে চীনের নিকট হইতে কোন স্থান দখল করে নাই। বহু জীবন ও অর্থের বিনিময়ে সে রুসিয়ার নিকট হইতে পাইয়াছে পোর্টআর্থার এবং জার্ম্মেণীর নিকট হইতে পাইয়াছে কিয়াচু। ইহার মধ্যে কিয়াচু সে প্রত্যার্পণ করিতে রাজী আছে এবং সেই সম্বন্ধে চীনের সহিত তাহার কথাবার্ত্তাও চলিতেছে; কিন্তু পোর্ট আর্থার সে ফেরৎ দিবে না। পোর্ট আর্থার ফেরৎ দিলে জাপানের অনেক স্বার্থ-হানি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।

১৮৯৮ অব্দে রুসিয়া যখন ২৫ বৎসরের জন্য পোর্ট আর্থার পত্তন নিল, তখন ইংরাজ ৯৯ বৎসরের জন্য কাউলুন এবং যত দিন পোর্ট আর্থার রুসিয়ার হাতে থাকিবে ততদিনের জন্য ওয়া-হৈওয়া পত্তন নিল। কাজেই ন্যায়তঃ রুস-জাপান যুদ্ধের

* হংকংকে সুরক্ষিত করার জন্য হংকংএর নিকটবর্ত্তী মূলভূমির কাউলুন প্রদেশ হস্তগত করা দরকার মনে করিয়া, ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কাউলুন প্রদেশের কতকাংশ ইংরাজ দখল করিল এবং ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে বাকি অংশ ৯৯ বৎসরের জন্য পত্তন নিল। অবশ্য এই কথা বলাই বাহুল্য যে চৈনিকগণ স্বেচ্ছায় ইংরাজকে এই পত্তন দেয় নাই—বাধ্য হইয়াই দিয়াছে। কাউলুন ও হংকং এর মধ্যে যে সমুদ্র আছে, তাহা প্রস্থে মাত্র আধ মাইল।

পরই ওয়াইহেওয়া চীনকে ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল। ২৫ বৎসরের পত্তন ধরিলেও ১৯২৩ অব্দে ওয়াইহেওয়া ফেরৎ দেওয়াব সময়। ১৯২২ অব্দে ইংরাজ তাহা ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় উদারতার ভাণ আছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত উদারতা নাই *। ইংরাজের মনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল কাউলুন ফেরৎ দিতে অস্বীকার করায়। ইংরাজ ও জাপানীরা তাহাদের পত্তনী স্থান ছাড়িতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ফরাসীরা বলিল কেহই যখন নিজ নিজ দাবী ছাড়িতেছে না, তখন তাহারাই বা কেন ছাড়িবে? ফরাসী-দূত পরিশেষে বলিলেন, অন্য জাতিরা নিজ নিজ অধিকার না ছাড়িলেও, কতকগুলি সর্ত্তে ফ্রান্স কোয়াঙ্গচুওয়ান ছাড়িতে পারে —এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে ফ্রান্স চীনের সহিত আলোচনা করিবে। এক জাপানের কিয়াচ় প্রত্যাহার করার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন চীন কিছুই পাইল না। ১৯২২ অব্দের নবেম্বর মাসে জাপান কিয়াচ় চীনের হাতে প্রত্যর্পণ করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আজ পর্য্যন্ত ওয়াইহেওয়া এবং কোয়াঙ্গচুওয়ান প্রত্যর্পণ করে নাই।

চীনের একটা মস্ত অসুবিধা, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক সে ইচ্ছামত হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে না। চীনদূত কু (Koo) বলিলেন, "এই ব্যবস্থায় চীনের প্রতি ভয়ানক অপমান ও অন্যায় করা হইতেছে। আমরা কাহারও উপর শতকরা ৫৲ টাকার বেশী শুল্ক আদায় করিতে পারি না,

* কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ইংরাজগণ ওয়াইহেওয়া ফেরৎ দেয় নাই।

কিন্তু অন্যান্য জাতিরা তাহাদের সুবিধামত আমাদের রপ্তানীর উপর শুল্ক আদায় করে। ইংল্যাণ্ডে চীনের 'চা'র উপর ২৫ % টাকা শুল্ক, জাপানে চীনের তামাকের উপর ৩৫ % টাকা, জাপানে চীনের কাচা রেশমের উপর ৩০% ও আমেরিকায় চীনের রেশমী দ্রব্যাদির উপর ৩৫% হইতে ৬০% টাকা শুল্ক আদায় করা হয়। অনেক যুক্তিতর্কের পর তিনি বলিলেন, "এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলেও, চীনকে অন্ততঃ ১২৷৷০ টাকা হারে শুল্ক আদায় করিবার অধিকার দেওয়া হউক।" কিন্তু কেহই তাহার এই কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না।

চীন হইতে বৈদেশিক সৈন্য তুলিয়া লইবার একটা প্রস্তাবও হইয়াছিল—কিন্তু তাহারও কোন ফল হয় নাই। প্রায় দুই মাস ব্যাপী এই সভার কার্য্য ঠিক "পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের" মত। এই বৈঠকের পূর্ব্বেও চৈনিকগণ যেমন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী', ইহার পরও ঠিক তাই।

চীনের বাণিজ্য-শুল্ক

এই সব বিদেশীয় সুসভ্য জাতিগুলি চীনের উপর যে কত অত্যাচার করে, চীনের উন্নতির পথে যে ইহারা কত প্রকার বাধা দেয়, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চীনের বাণিজ্য-শুল্কের ব্যাপারে। ১৮৪২ অব্দের সন্ধি অনুসারে ঠিক হয় যে. বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী বা রপ্তানীর উপর ৫% টাকার বেশী শুল্ক বসাইতে পারিবে না। ১৮৫৮ অব্দের সন্ধিতে কতকগুলি দ্রব্যের দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর শুল্ক বসাইতে হইবে। সেই সময় এইরূপ কথা হয় যে, প্রতি ১০ বৎসর অন্তর মূল্য-তালিকা সংশোধিত করা হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার পর ১৯০২ ও ১৯১৮ অব্দে, এই দুইবার মাত্র ঐ তালিকা সংশোধন করা হইয়াছে। ধরিয়াই লইলাম যে, ১৮৫৮ অব্দের মূল্য-তালিকায় ঠিক ঠিক দামই ধরা হইয়াছিল। অবশ্য

ইহাতে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে), কিন্তু এই কথা ভুলিলে নিতান্তই অন্যায় হইবে যে ১৮৫৮ অব্দ হইতে ১৯০২ অব্দে দ্রব্যাদির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অথচ ১৮৫৮ অব্দের নির্দ্ধারিত দামের উপরই ১৯০০ অব্দেও শুল্ক হিসাব করা হইত। ১৯০২ হইতে ১৯১৮ অব্দে যে দ্রব্যাদির মূল্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই ব্যবস্থায় চীনের প্রতি নানাভাবে অবিচার করা হইয়াছে। (১) প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রই নিজ সুবিধা ও আবশ্যকমত আমদানী-রপ্তানী শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধি করে। জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায় রক্ষা করার পক্ষে ইহা নিতান্তই দরকার। কিন্তু চীনকে সেই অধিকার দেওয়া হয় নাই। (২) প্রকৃত মূল্য হইতে কম মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াতেও শুল্ক হইতে চীনের আয় অনেক কম হইয়াছে। এভাবে চীন সরকারের অর্থের অনটন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলেই বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) এই ব্যবস্থায় আর একটা মস্ত অন্যায় করা হইয়াছে। নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও চীন আফিংএর উপর শুল্ক বেশী করিতে পারে নাই। আফিংএর আমদানী একেবারে বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু ইংরাজের কামানের গুতায় সে তাহা পারে নাই। চীনের পক্ষে অপর উপায় ছিল আফিংএর উপর শুল্ক বেশী করিয়া, ইহার দাম চড়ান এবং কাজেই কাটতি কমান। কিন্তু সেই পথও তাহার নিকট রুদ্ধ ছিল। ইহাই হইল খৃষ্টীয় সভ্যতার নিদর্শন।

(৪) সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ইচ্ছামত বৃদ্ধি করাই হইল আয়বৃদ্ধির একটা পথ। চীনের নিকট সেই পথ রুদ্ধ হওয়ায়, চীন অন্যভাবে আয় বৃদ্ধির পথ করিল। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে দ্রব্যাদি চালানের উপর, একটা শুল্ক আদায় করা হইতে লাগিল। কিন্তু বিদেশ হইতে আনীত বা বিদেশে প্রেরিতব্য দ্রব্যাদির উপর এই শুল্ক বসান যায় না। ইহার ফলে স্বদেশী দ্রব্যাদির উপরই এই শুল্ক আদায় করা হয় এবং তাহার ফলে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। চীন একবার প্রস্তাব করিয়াছিল, বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্কের হার কিছু বাড়াইতে দিলে, সে আন্তর শুল্কের প্রথা রহিত করিয়া দেয়। জাপান, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিল—কারণ বোধ হয় এই যে, অন্য ১০টী জাতি রাজী হইবে না, কাজেই ইহাও কার্য্যে পরিণত হইবে না। কার্য্যতঃও তাহাই হইল।

আমেরিকার 'খোলা দরজা প্রথা' (Open-door Policy) একদিকে চীনকে ইউরোপীয় জাতিসমূহের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই মতের ফলে চীনকে বাস্তবিকই জাতি হিসাবে দাঁড়াইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ইউরোপীয় জাতির মত আমেরিকার কাঁচা মালের (Raw materials) অভাব নাই। তেল, কয়লা, লোহা ও তুলা এই হইল বর্ত্তমান Industrial civilisationএর খোরাক। এই সবই আমেরিকার আছে। কাজেই ইউরোপীয় জাতি সমূহের মত চীন হইতে এই সব কাঁচা মাল লুঠ করিবার কোন আবশ্যকতাই তাহার নাই। সে চায়

তাহার দ্রব্যাদি যেন চীনে বিক্রি হয়। তাই 'খোলা দরজা'ই তাহার পক্ষে সুবিধা—ইহাতে কোন জাতিই চীনে কোন বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারিবে না এবং সকলেই সমানভাবে ব্যবসায় করিবে। এই ব্যবস্থার কথা বলিতে যাইয়া Bertrand Russel লিখিয়াছেন, যদি কোন সহরের শাসনভার একদল চোরের হাতে থাকে এবং তাহারা ব্যবস্থা করে যে, সকলকেই রাত্রে দরজা খোলা রাখিতে হইবে,* তবে নাগরিকগণ যেমন এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয় না, চীনও আমেরিকার এই ব্যবস্থায় ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সুবিধা এই পর্য্যন্ত, চোরেরা গৃহীদের হত্যা বা মারধর করিল না; যাহা নিল, তাহা ভদ্রভাবেই নিল।

শুল্ক সম্বন্ধে, পাশ্চাত্যদের অনাচারের এইখানেই শেষ নয়। সমস্ত শুল্ক বিভাগ কার্য্যতঃ ইংরাজদের হাতে। শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী (Inspector General) ইংরাজ অফিসার হইবে। সে-ই অন্যান্য সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে। উপরন্তু কর্ম্মচারী প্রায় সবই বিদেশী। এই সব বিদেশী কর্ম্মচারীরাই শুল্ক আদায় করে। এই টাকার উপরও চীন সরকারের কোন

* If you lived in a town where the burglars had obtained possession of the town council, they would very likely insist upon the policy of open door, but you might not consider it wholly satisfactory.

Problemes of China P.56.

অধিকার নাই। এই টাকার বেশীর ভাগ নানা ঋণের জন্য বিদেশী-দের নিকট বন্ধক দেওয়া আছে। টাকা আদায় করিয়া তাহারা ঋণ বাবদ টাকা কাটিয়া লয় এবং বাকি যৎকিঞ্চিৎ টাকা চীন সরকারকে দেয়। তাই চীন-সরকারের আর্থিক অভাব কোন কালেই দূর হয় না। চীন-সরকারের হাতে বাকি টাকা দিতেও এই সব বৈদেশিক কর্ম্মচারীরা নানা গোলমাল তোলে। কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণ চীনের শুল্ক চীন সরকারকে দেওয়া হইত না।—কারণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, সেখানে আইনতঃ (*dejure*) কোন সরকার নাই। সেই জন্যই দক্ষিণ চীনের নেতা সান-ইয়াৎ-সেন ক্যাণ্টনের শুল্ক আফিস দখল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯২৩)। অনেকটা সেই জন্যই সান্ আজ ইংরাজের বিরাগভাজন।

চীনের আর একটা বড় রাজস্ব হইল লবণশুল্ক। তাহাও বিদেশীদের নিকট বন্ধক ও তাহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে। উপরন্তু কর্ম্মচারীরা সবই বিদেশী এবং তাহারাই সব নিয়মিত করে। ১৯২২ অব্দে ইউ-পু-ফাই একবার এই লবণ শুল্ক আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি ইয়াংসি নদীর তীরের কয়েকটা লবণশুল্ক কেন্দ্র আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্মিলিত বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা তখনও চীনের হয় নাই।

বাস্তবিক, যতদিন বহির্ব্বাণিজ্য-শুল্ক ও লবণশুল্ক চীন সরকারের হাতে না আসিবে, ততদিন, চীনের অর্থাভাব দূর হইবে না এবং অর্থাভাব দূর না হইলে চীনের পক্ষে তাজা হইয়া উঠা সম্ভব নয়। যে সব দেনার জন্য এই সব

শুল্ক বাঁধা আছে, তাহাও বৈদেশিকদেরই কীর্ত্তি। রবাহুত ভাবে চীনে যাইয়া বিনা কারণে কামান দাগাইয়া, তাহাদের হত্যা করিয়া, তাহাদের রাজ্য লুঠ করিয়া, তারপর দাবী করা হইল, তোমাদের হত্যা করিতে ও তোমাদের রাজ্য লুঠ করিতে যে খরচ হইয়াছে সেই টাকা তোমরা দেও। এই ভাবে প্রত্যেক যুদ্ধের পরই চীনের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা আদায় করা হইয়াছে এবং চীনের ঋণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৭৫০০০০০ পাউণ্ড দাবী সাব্যস্ত হইয়াছে। ৩৯ বৎসরে এই টাকা সব পরিশোধ করিতে হইবে এবং ৪% হারে বৎসর সুদ দিতে হইবে।* প্রত্যেক যুদ্ধের পরই এই ভাবে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে, তাই চীনের ঋণ আজ স্তুপাকার হইয়াছে।

* ১৩টী জাতির মধ্যে একমাত্র আমেরিকা ১৮৯৮ অব্দ হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা মাপ দিয়াছে। আমেরিকা নিয়ম করিয়াছে যে তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে প্রতি বৎসর কয়েকটী চৈনিক যুবককে হয় আমেরিকায়, না হয় আমেরিকার দ্বারা চালিত চৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত করা হইবে। এই ব্যবস্থায় চীনের যে উপকার হইয়াছে তাহা বলাই বৃথা; কিন্তু আমেরিকারও লোকসান হয় নাই। তাহার সহৃদয়তার ফলে চৈনিকগণ বিশেষভাবে আমেরিকার ভক্ত হইয়াছে; তাই অন্যান্য দেশের চেয়ে আমেরিকার ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ চীনকে হাত করার জন্য নিজ নিজ প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিয়াছে। অন্য সকলের প্রাপ্য টাকা দেওয়াও চীন এখন বন্ধ করিয়াছে।

সানের মৃত্যুর পূর্ব্বে

ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন কিছুকাল দক্ষিণে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করিয়া, ১৯২২ অব্দে মনে করিলেন এখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে পারেন। ১৯২১ অব্দে সাংঘাই, হংকং প্রভৃতি স্থানে যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহাতে সান-ইয়াৎ-সেন ও তাঁহার কুমিঙ্গটাঙ্গ দলের বিশেষ কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে হংকংএ ইংরাজের ব্যবসায়ের বিস্তর ক্ষতি হয়, এবং তারপর হইতেই হংকংএর ব্যবসায় কমিয়া ক্যাণ্টনের ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইংরাজরা ইহাতে এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে যে, তাহারা ক্যাণ্টনের উপর যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গুলিবর্ষণের কল্পনাও করে। উভয় বন্দরই অপর বন্দর হইতে আগত জাহাজের উপর টেক্স বসাইল। এই

সব উপায়ে ক্যাণ্টনের হাতে কিছু অর্থাগমও হইতে লাগিল। তখন সান একবার নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিলেন।

উত্তর চীনে তখন কার্য্যতঃ উ-পাই-ফু ও চাঙ্গ-ছো-লীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সেই সময় সান একদল সৈন্য লইয়া উত্তরাভিমুখে অভিযান করিলেন। সান-ইয়াৎ-সেনের ভরসা ছিল, উ-পাই-ফু ও চাঙ্গ-ছো-লীনের লড়াইর ফলে কিছু দিনের মধ্যেই উভয় পক্ষ এমন কাবু হইবে যে, তখন জাতীয় দলের প্রাধান্য স্থাপন করা সহজ হইবে। এই আশাতেই তিনি এই অভিযানে যান। কিন্তু কিছুই সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি ক্যাণ্টনের দিকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

উত্তরের দিকে যাত্রা করার সময়, ক্যাণ্টনের শাসনভার তিনি তাঁহার সহকারী চেন-চিয়াঙ্গ-মিঙ্গ (Chen-chiung Ming) ও তাঁহার বন্ধু উ-টিঙ্গ-ফেঙ্গের (Wu-Ting-Fang) হাতে দিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, চেন সব নিজে দখল করিয়া বসিয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সান ও উ-টিঙ্গ ক্যাণ্টন হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সান-ইয়াৎ-সেন কোয়াঙ্গসি ও উন্নান (Kwoangsi & Yunnan) প্রদেশের সৈন্য লইয়া ক্যাণ্টন আক্রমণ ও জয় করিলেন। তখন তিনি আবার শক্তিসংগ্রহে মন দিলেন।

ইহার পর (১৯২২ অব্দে) চেন-চিয়াঙ্গ-মিঙ্গ হংকংএ ইংরাজের আশ্রয়ে যায়। এই বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী

ইংরাজের অর্থে সান-ইয়াৎ-সেন ও জাতীয় দলের প্রতি নানাভাবে শত্রুতা আচরণ করিতে লাগিল। আর একজন স্বদেশদ্রোহী চেন লিম-পাকও (Chan-Lim-Pak) ইংরাজের সাহায্যে জাতীয় দলের ক্ষতিসাধনে তৎপর হইল। এই লোকটি "ব্যবসায়ী স্বেচ্ছা-সৈনিক বাহিনী" (Merchants' Volunteer Force) গঠন করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ড প্রায় প্রত্যক্ষেই তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। ডাঃ সান ইহার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে এক চিঠি লেখেন ;—তখন শ্রমিকনেতা ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী। কোন প্রতিকার ত' দূরের কথা, তিনি সান-ইয়াৎ-সেনের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। এই শ্রমিকমন্ত্রী-মণ্ডলীর সময়েও ইংরাজের রণতরী ও সৈন্য-বাহিনী চীনের পাঠানো বন্ধ হইল না। এই সব কারণেই ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির প্রতি চীনারা একেবারেই আস্থাহীন হইতে লাগিল।

১৯২৩ অব্দের শেষ ভাগে বৈদেশিক শক্তিদের নিকট সান দাবী করিলেন যে ক্যাণ্টনের বানিজ্য-শুল্কের কতকাংশ যেন তাঁহার হাতে দেওয়া হয়। বৈদেশিক শক্তিরা বুঝিত যে, বানিজ্য শুল্কের যে অর্থ পেকিনের হাতে যায়, দুর্ব্বল পেকিন-সরকার তার কোন সদ্ব্যয় করিতে পারে না ; কিন্তু ঐ অর্থ সানের হাতে পড়িলে সান শক্তি সংগ্রহ করিবে। তাহাদের পক্ষে এটা মোটেও কাম্য নয়। তাই সানের প্রস্তাবে তাহারা

রাজী হইল না। তখন সান চেষ্টা করিলেন, নিজেই কিছু শুল্ক আদায় করিবেন ; কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টা হওয়া মাত্রই ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতিগুলি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া স্বার্থরক্ষায় মন দিল। আমেরিকাও ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত একযোগে যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া ক্যাণ্টনের দরজায় উপস্থিত হইল। ইহার পরই সান বুঝিলেন, এই সব অর্থগৃধ্নু জাতি-সমূহের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়। এই সময় হইতেই তিনি রুষিয়ার সহিত খাতির করিতে আরম্ভ করেন এবং তারই ফলে বিখ্যাত বরোডিন ও তাঁহার সঙ্গীরা চীনে আসেন।

প্রায় এক বৎসর পরে পিকিনে এক বিপ্লব হইল। উ-পাই-ফু তাঁহার অধীনস্থ সেনানী ফেঙ্গ-উ-সিয়াঙ্গের (Feng-yu-Hsiang) উপর নির্ভর করিয়া চেঙ্গ-ছো-লিনের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হঠাৎ ফেঙ্গ তাহার দলবল সহ উ-পাই-ফু কে পরিত্যাগ করিয়া পেকিনে প্রবেশ করেন।

তখন পেকিনে উ-পাই-ফুর আধিপত্য চলিতেছিল ;—উ-পাই-ফুর হাতের পুতুল ছাও-কুন (Tsao-kun) উৎকোচ ও উ-পাই-ফুর সাহায্যে রাষ্ট্রপতি (President) নির্ব্বাচিত হইয়া পূর্ব্বগামী রাষ্ট্রপতি (President) লি-যুয়ান-হাঙ্গের (Li-yuan-Hung) মতই ক্ষমতার ছায়া লইয়া তুষ্ট ছিলেন। উভয়ের আমলেই প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল উ-পাই-ফুর হাতে। উ মধ্য-চীনে চলিয়া গেলেন ; ইহার পর হইতে আর চীনের সমস্যাকে

সহজ বা কঠিন করার ইতিহাসে উর বিশেষ স্থান রহিল না। বহুবৎসর চীনের রাষ্ট্রজীবনে ভাল ও মন্দ অনেক কিছু করিয়া, অপ্রতিহত ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে চীনের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের ইতিহাসে, কোন স্থানই নিজের জন্য তিনি রাখিতে পারিলেন না।

ফেঙ্গ পেকিন দখল করিয়াই ছাও-কুণকে বন্দী করিলেন এবং চেঙ্গ-ছো-লীনের সহিত একটা আপোষ করিলেন। চেঙ্গ-ছো-লীনেরই একটি মনোনীত লোককে রাষ্ট্র-পতি করিয়া, ফেঙ্গ প্রকৃত ক্ষমতা নিজের হাতেই রাখিলেন। এই ভাবে এক বৎসর চলিল, কিন্তু তার বেশী আর চলিল না। উ এবং চেঙ্গ উভয়েই ফেঙ্গ কে জব্দ করিতে উদগ্রীব। রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুরাতন শত্রুতা ভুলিয়া তখনকার মত কার্য্য উদ্ধার করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উ ও চেঙ্গের মধ্যেও, এই নীতির বশেই, একটা সখ্য স্থাপিত হইল। উত্তর চীন হইতে দক্ষিণ মুখে চেঙ্গের সৈন্য চলিল; মধ্য চীন হইতে উ-র সৈন্য চলিল উত্তর মুখে। এই দুই বাহিনীর চাপে পড়িয়া ফেঙ্গ বুঝিলেন, জয়ের আশা নাই। তাই তিনি পেকিন ত্যাগ করিয়া মঙ্গোলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই জয়ের ফলে উ বিশেষ কিছু লাভবান হইলেন না—পেকিনে চেঙ্গের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হইল।

এদিকে যখন দুই দলে রাষ্ট্রক্ষমতা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় চীনের, তথা সমস্ত এসিয়ার ইতিহাসে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। ১৯২৪ অব্দে সান-ইয়াৎ-সেন

আবার পেকিনে যান। ইহার কিছু পূর্ব্বে উ-পাই-ফু, চেঙ্গ-ছো-লিন ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত 'আন ফু ক্লাব' ধ্বংস করিয়া পেকিনে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন। সান তাঁহার সাহায্য আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপান প্রভৃতি নানা স্থান ঘুরিয়া তিনি যখন পেকিনে পৌঁছিলেন, তখন অবস্থা অন্যরকম—উ তখন পলায়িত এবং পেকিনে তখন চেঙ্গের আধিপত্য। তার উপর, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় পেকিনে আসেন। রকফেলার (Rockefeller) হস্পিতালে তিন মাস কেনসার (cancer) রোগে ভুগিয়া, তিনি দেহত্যাগ করেন (১২ই মার্চ্চ, ১৯২৫)।

সান ছিলেন খৃষ্টান—অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও, সানের জন্য খৃষ্টানী সমাধির ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু পেকিনের খৃষ্টান পুরোহিত বলিলেন, যে-ব্যক্তি হংকং খালাসীদের ধর্ম্মঘটের মূল কারণ, তাঁহার সমাধির কাজে তিনি সহায়তা করিতে পারিবেন না। এই হইল পুরোহিতের আচরণ। ধর্ম্ম, ঈশ্বর এই সবই ইংরাজ জাতির নিকট সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রমাত্র। ব্যক্তিগত ও জাতিগত আর্থিক সুবিধার জন্য, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরকে ইহারা যে কোন মূল্যে বিক্রী করিতে পারে।

সানের মৃত্যু হইল—নব্য এসিয়ার কর্ম্ম ও ভাবগুরু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব

ইহার পরের সব ঘটনার ইতিহাস লেখার সময় আজও আসে নাই। বিপ্লবের পর বিপ্লব আসিয়া জাতির পুরাতনকে ওলট পালট করিয়া নূতন ভবিষ্যৎ গড়িতেছে —এখনও এই অধ্যায়ের শেষ হয় নাই। কাজেই তার ইতিহাস লেখাও চলে না। তবে সংক্ষেপে এই সময়কার ঘটনাগুলির কিছু পরিচয় দিব।

চেঙ্গ-ছো-লিনের সাহায্যে উ-পাই-ফু ফেঙ্গের অধিকার হইতে পেকিন জয় করিয়া, আবার ছাও কুনকে রাষ্ট্র-নায়ক নিযুক্ত করেন। যদিও প্রথমতঃ চেঙ্গ ছো-লিনের কর্ত্তৃত্বই পেকিনে বেশী ছিল, কিন্তু অল্পে অল্পে উ-পাই-ফু, ছাও-কুনের সাহায্যে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও

চেঙ্গ-ছো-লিনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার আর হইল না।

এই সময় দক্ষিণের জাতীয় দল নানাভাবে শক্তিসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিল। সান চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে বাণিজ্য-শুল্কের কিছু অংশ ক্যাণ্টন সরকার পায়, কিন্তু ইংরাজরা তাহাতে রাজী হইল না। ১৯২১ অব্দের ধর্ম্মঘটের পর হংকংএর ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেক কমিয়া গেল এবং ক্যাণ্টনের ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হংকংএর ইংরাজরা ইহাতে ক্যাণ্টনীদের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল এবং দুই বন্দরের মধ্যে বেশ বিরোধ চলিতে লাগিল। কিন্তু পরে এই বিরোধ আরও তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিল। হংকং ও সাংহাইর চীনারাও জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এটা বুঝিতে লাগিল, স্বদেশে তাহারা কুকুরের মত ব্যবহার পায়। জাতীয় অপমানের জ্বালা ক্রমেই তাহাদের মধ্যে তীব্র হইতে লাগিল। এই অসন্তোষের প্রথম আত্মপ্রকাশ হইল, হংকঙ্গের নাবিকদের ধর্ম্মঘটে। অত্যন্ত বর্ব্বর অত্যাচারের সহিত ইংরাজরা এই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হইয়া ৫০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিতে ইংরাজরা ধর্ম্মঘট মিটাইল, কিন্তু ধর্ম্মঘট মিটিয়া যাওয়ার পর প্রতিশ্রুত অর্থ দেয় নাই। তারপর আসিল ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্ম্মঘট। সব সময়েই সাংহাইতে নিরীহ মিছিলের উপর গুলি-বর্ষণের খবর আসে। এই ব্যাপারে ইংরাজের দোষই সব চেয়ে বেশী। এই ঘটনায় সমস্ত চীনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ২ লক্ষ

চীনা শ্রমিক দুই সপ্তাহের মধ্যে হংকং ত্যাগ করিয়া ক্যাণ্টনে আসিল। ক্যাণ্টনের জাতীয় রাষ্ট্র এতগুলি লোকের দায়িত্ব লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। ইহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করার ভার ক্যাণ্টনী সরকারের উপরই পড়িল। ইহার উপর আবার হংকং দাবী করিল যে, ক্যাণ্টনী সরকারকে অবিলম্বে ঐ ২ লক্ষ লোককে হংকঙ্গে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। ক্যাণ্টন সরকার ইহা অস্বীকার করিল। ইংরাজরা ঠিক করিল ক্যাণ্টন অবরোধ করিবে। এই সব গোলমালের সময়ই ৩০শে জুন সাংহাইর অন্তর্গত সামীনে ইংরাজের এক যুদ্ধজাহাজ হইতে গুলি বর্ষণ হয় ;—ফলে ৫২ হত ও ১১৭ জন আহত হয় (৩০শে জুন, ১৯২৪)।

এই ঘটনার পর সমস্ত চীনময় ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের হিরিক আরম্ভ হইয়া গেল। হংকংএ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায়ই ধ্বংস হইতে চলিল। প্রতি মাসে ১০,০০০০০০ পাউণ্ড করিয়া হংকঙ্গের বণিকদের ক্ষতি হইতে লাগিল। যুবকগণ নানাভাবে দেশকে তৈরী করিতে লাগিল। তাহারা ১০০০ চীনা বর্ণমালা বাছিয়া লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে বর্ণজ্ঞান প্রচার করিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা শ্রমিকদের মধ্যে লেখা-পড়া ও নূতন ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিল। এই সব শ্রমিকদের জন্য চরমপন্থী জাতীয়ভাবাপন্ন পুস্তক লিখিত হইল। এভাবে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের ফল শীঘ্রই ফলিল—ইহারই ফলে ১৯২৫ অব্দের

ছাত্র ও শ্রমিক ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘটে চীনের সর্ব্বত্র ছাত্র ও শ্রমিকরা যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল, প্রকারান্তরে তাহা হইতেই ১৯২৬-২৭ অব্দের চীন বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। ১৯২৫ অব্দে ৩০শে মে সাংহাইতে ছাত্র ও শ্রমিকদের উপর ইংরাজের সৈন্য গুলিবর্ষণ করে—তারই প্রতিকার-স্পৃহায় তরুণ চীন ১৯২৬-২৭ অব্দের বিদ্রোহ আরম্ভ করে। *

এই গুলিমারা লইয়া এত আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, ইংরাজরা ভীত হইয়া ঐ উপলক্ষে হতাহতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু চৈনিকগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। অর্থের বিনিময়ে জাতীয় আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে তাহারা রাজী নয়। তাহারা দাবী করিল যে, চীনে কোন বিদেশীর কোন বিশেষ সুবিধা থাকিবে না, সর্ব্বপ্রকার অসমান সন্ধি রহিত হইবে এবং চীন সর্ব্বব্যাপারে পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব ফিরিয়া পাইবে। ইতিমধ্যে তাহারা বিদেশী এবং বিশেষ করিয়া বিলাতী বর্জ্জনের আন্দোলন আরম্ভ করিল। তিনমাসের মধ্যে হংকংএর ইংরাজ বণিকদের প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। সমগ্র চীনে ইংরাজ বণিকদের মহলে হাহাকার পড়িয়া গেল।

ক্যাণ্টনের জাতীয় দল দেখিল বিপ্লবের এটাই সুযোগ†

* এই ধর্ম্মঘটের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থকারের "চীনের যুবক জাগরণ" গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

† The late Dr. San Yat Sen repeatedly projected expdition against the North, but he failed owing to the impassivity of the masses.............The phenomenal military successes

সমগ্র দেশ বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগে টগবগ করিতেছে, দেশসেবার স্পৃহা সমস্ত জাতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, যেখানে সেখানে শ্রমিক সংঘ নিজেদের ক্ষমতার মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারা আঘাৎ দেবার একটা সুযোগ চায়; শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবকগণ সমস্ত জাতিকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তখন বিদেশী-দের বিরুদ্ধে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দেশের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। বিদ্রোহীরা দেখিল—এই তাহাদের সময়। প্রকৃত বিদ্রোহী এমনি সুযোগের জন্য দরকার হইলে বহুদিন, বহু বৎসর অপেক্ষা করে। নিজের মানসক্ষেত্রের বাহিরে যখন কোথাও বিপ্লবের কোন লক্ষণই দেখা যায় না, তখন হইতে সে সুদূর বিপ্লবের সুযোগকে গড়িয়া তোলে। তিল তিল করিয়া নিজের কল্পনাকে সে বাহিরে রূপ দিয়া ফুটাইয়া তোলে। বিপ্লবীর চরিত্রে অধৈর্য্য একটা বড় গুণ, কিন্তু তা বলিয়া ধৈর্য্যকে বাদ দিলেও তার চলে না। ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাকে বিপ্লবের পথ সৃষ্টি করিতে হইবে।

of the Nationalists, (under Chaing-Kai-Shek) however, are not much due to their superior strategy and *morale* but to *a* general lukewarmness in the rank and file of anti-Nationalists owing to a growing realisation that it is not good to be permanently against the wishes of the people."

China in Revolt—Tang Leang-Li (P. 156-7)

তখন একটা বিরাট প্রকাশ্য অসন্তোষ ও আন্দোলন চলিতেছিল, কুমিঙ্গটাঙ্গ দল ঠিক করিল—এটাই বিদ্রোহের সময়। কুমিঙ্গটাঙ্গের হাতে তখন হোয়াম্পো সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রগণ ছিল। ডাঃ সান রুষিয়া হইতে বরোডিন ও গেলেণ্টস নামক দুটি লোককে চীনে আনেন। বরোডিন হইলেন ক্যাণ্টনের জাতীয় সরকারের উপদেষ্টা এবং গেলেণ্টস্ হোয়াম্পো সামরিক বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। চিয়াঙ্গ-কাই-সেকও তাঁহার সহিত এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্ররা ছিল জাতীয় দলের বিপ্লব বাহিনীর প্রধান অবলম্বন।

ক্যাণ্টনী বাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাণ্টন হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইল। তাহাদের লক্ষ্য হইল, পেকিন দখল করিয়া সমগ্র চীনের উপর জাতীয় দলের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। তাহারা বুঝিত যে সমগ্র চীনকে একটা জাতীয় ভাবাপন্ন রাষ্ট্রের অধীন করিতে না পারিলে, বিদেশী শক্তিসমূহের কবল হইতে চীনকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। চীনের দৌর্বল্যের সুযোগ পাইয়াই বিদেশী জাতিসমূহ চীনের বুকের উপর বসিয়া চীনের উপর অত্যাচার করিতে ভরসা ও সাহস পায়। তাই জাতীয় দলের প্রথম লক্ষ্য হইল, পেকিন দখল করিয়া সেখানে জাতীয় রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এই দিগ্বিজয়ে বাহির হইল।

জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণের জাতীয় দলের বিজয়যাত্রা সুরু হইল। এই দিগ্বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিবার মত উপকরণ এখনও আমরা পাই নাই। এই "জাতীয়বাহিনী" (Kuom-ing-chun—কু-মিন-চান) হোয়াম্পোয়ার সামরিক বিদ্যালয়ে চিয়াঙ্গ-কাই-সেকের হাতে শিক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বে চীনে উন্নানী ও কোয়াঙ্গসীর ভারাটে সৈন্যগণই বিশেষ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কু-মিঙ্গ-চান ক্রমে চীনের সব চেয়ে সমর-নিপুণ ও সুশৃঙ্খল সৈন্য-বাহিনী বলিয়া পরিচিত হইল। ইহারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য মরণ বরণ করিতে সদাই প্রস্তুত। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে (১৯২৪-১৯২৫) কোয়াটাঙ্গ, কোয়াঙ্গসি, হুনান, কোইচো এবং য়ুচুয়ান প্রদেশগুলি জয় ও দখল করিল। জাতীয়বাহিনী কোয়াঙ্গ প্রদেশই সর্ব্বপ্রথম (১৯২৫) জয় করে এবং

রুশিয়া
মঙ্গোলিয়া
সিনকিয়াং
চায়না তুর্কিস্থান
কাশগড়
তিব্বত
লাসা
দিল্লি
নেপাল
ভারতবর্ষ
কলিকাতা
ক্যাণ্টন
টোকিও
ইংলিশ মাইল

এই একটী প্রদেশের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইয়াই তাহারা কতকটা সহজে শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিল। ইহারই ফলে তাহাদের দিগ্বিজয় তত সহজ হইয়াছিল। সব ব্যাপারেই বিদেশী শক্তিগুলি, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ড, জাতীয়দলকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইংরাজ তলে তলে উ-পাই-ফুকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াও সাহায্য করিয়াছে। শুনা যায়, উ-পাই-ফুর জন্য প্রেরিত এক জাহাজ অস্ত্র, জাহাজের কর্ম্মচারীদের ভুলে জাতীয় দলের হাতে পড়ে। জাতীয় বাহিনীর প্রধান অবলম্বনই ছিল জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য। অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্য্য তাহাদের ছিল না। এরোপ্লেন, বড় বড় কামান, ঘোর-সোয়ার এই সব তাহাদের ছিল না বলিলেই চলে * কিন্তু জনসাধারণ তাহাদের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, হেংকো (এককালে উ-পাই-ফুর শক্তিকেন্দ্র ও আড্ডা) এবং হেনিয়াঙের (Hankow & Hanyang) মত বিখ্যাত নগরগুলি পর্য্যন্ত জাতীয় সরকারের বশ্যতা মানিয়া লইয়াছে; সাংহাইর মত নগর পর্য্যন্ত দোকানে দোকানে তাহাদের ভাবী বিজয়ী চিয়াঙ্গ-কাই-শেকের ছবি রাখিয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত ছিল।

১৯২৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে জাতীয়দলের উত্তর অভিযান আরম্ভ হয়। প্রথমে তাহারা হুনান প্রদেশে যাইয়া উ-পাই-ফুর সৈন্যকে পরাজিত করে। উ-পাই-ফুর সৈন্য সংখ্যায়, শিক্ষায় ও অর্থে, অস্ত্র-শস্ত্রে জাতীয়দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। উ-পাই-ফু

* চৈঙ্গ লিয়াঙ্গ লী বলেন—Canton's revolutionary army has no aeroplanes, no cavalry, no big guns.

কখনও আশঙ্কা করেন নাই যে, দক্ষিণের এই ছোকরাদের দল তাঁহার সৈন্যদের পরাজিত করিয়া, তাঁহার শক্তিকেন্দ্র বিখ্যাত হেঙ্কো (Hankow) নগরের ধারেও যাইতে পারিবে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জাতীয়দল হেঙ্কো দখল করিল। হুনান ও হুপে (Hupeh) প্রদেশদ্বয় জয় করিতে জাতীয় বাহিনীকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছে—উ-পাই-ফুর সুশিক্ষিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে কয়েকটা সম্মুখ যুদ্ধে নামিতে হইয়াছে ; এবং ঐ সব যুদ্ধে জাতীয় বাহিনীর বহু সৈন্য মারা গিয়াছে। উ-পাই-ফু এবং জনসাধারণ কল্পনাও করে নাই যে এমনিভাবে জাতীয় বাহিনী জয়ী হইবে। এবার তাহারা বুঝিল জাতীয় সৈন্যদল ভাড়াটিয়া সৈন্য নয় ; ইহারা একটা উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় প্রাণ দিতেই প্রস্তুত। তাই জগতের কোন শক্তিই অর্থ-বশীভূত সৈন্যদল নিয়া ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। উ-পাই-ফুর বিরুদ্ধে জাতীয়দলের এই জয়ের ফলেই তাহাদের ভবিষ্যৎ দিগ্বিজয় এত সহজ হইয়াছিল। তাহাদের ত্যাগ, সাহস ও সমর-নৈপুণ্য জনসাধারণকে মুগ্ধ করিল। তাই সর্ব্বত্র জন-সাধারণ ইহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া নগরের পর নগর ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে লাগিল। এই অভিযানের প্রারম্ভে কেণ্টনী বাহিনীতে মোটে অনধিক ৬০,০০০ সৈন্য ছিল। নানাদিকে বিভক্ত এই সৈন্যদলের কোন এক বাহিনীতেই মোট ২০,০০০ সৈন্যের বেশী ছিল না। অথচ এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই তাহারা সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছে। তার উপর ইহাদের

অস্ত্রশস্ত্রেরও প্রাচুর্য্য মোটেও ছিল না। মাত্র ৬০০০ জাতীয় সৈন্যের ভয়ে,চি-য়ুন-আজ (Chin-Yun-As) নামক এক সেনাপতি ৩০,০০০ সৈন্য সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও উষেণ কোয়ান (wushen Kuan) নামক বিখ্যাত সুরক্ষিত রেলকেন্দ্র জাতীয় দলের হাতে সমর্পণ করে।

এই অভিযানের আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, জাতীয় বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই কুমিনটাঙ্গ দলের শাখা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। শ্রমিকসংঘ, কৃষকসঙ্ঘ, যুবকসঙ্ঘ ও মহিলাসঙ্ঘে দেশ ছাইয়া গেল। এই সময় চৈনিক রমণীদের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাহারা দলে দলে পরিবারের মায়া কাটাইয়া বিপ্লবের জন্য কাজ করিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি, বক্তৃতা, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপনী, প্রভৃতির সাহায্যে একটা বিপ্লবী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের পুস্তক অতি অল্প মূল্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় ৯ই ডিসেম্বর জাতীয় রাষ্ট্র-কেন্দ্র ক্যান্টন হইতে হেঙ্কোতে স্থানান্তরিত হইল। হেঙ্কো, উচাঙ্গ এবং হেনিয়াঙ্গ নদীর মোহনায় অবস্থিত, এই নগরত্রয়কে একটা নগরে পরিণত করিয়া, জাতীয় রাষ্ট্রের রাজধানী করা হইল এবং এই নগরের নাম হইল উ-হান (Wu-Han)।

জাতীয় দলের প্রভাব ও শক্তি এই সময়ই চরমে উঠিল। ইহার পর এক শোচনীয় গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, এই গৃহ-বিবাদের ফলে উ-হানের জাতীয় সরকারের সহিত সেনাপতি

চিয়াঙ্গ-কাই-সেকের বিরোধ আরম্ভ হয়; জাতীয় বাহিনী পরাজিত হয় এবং অবশেষে চিয়াঙ্গ-কাই-সেক সেনাপত্য ত্যাগ করিয়া যান। সেবারকার মত জাতীয় বাহিনীর দিগ্বিজয় স্থগিত থাকে।

এই বিরোধের মূল কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি এই বলা চলে যে, সমরনেতা চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেক ছিলেন বলসেভিকবাদ-বিরোধী এবং কতকটা নরমপন্থী এবং উ-হানের জাতীয় সরকার ছিল চরমপন্থী ও বলসেভিকবাদী। উ-হানের রাষ্ট্রশক্তি একদিকে চাহিত চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া রাখিতে এবং অপরদিকে চাহিত, কমুনিজম বা বলসেভিক্ আদর্শে রাষ্ট্রকে চালাইতে। কাজেই চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেকের সহিত জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ক্রমে অবস্থা এমন হইল যে, চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেক নানকিঙ্গে (Nanking) আর এক নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। দুই পক্ষের মিটমাটের চেষ্টায় কুমিনটাঙ্গদলের এক পূর্ণ বৈঠক হইল, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না, বরং বিরোধ আরও পাকাইয়া উঠিল।

তখন উ-হান সরকার টেঙ্গ-সেন-চি (Tang-sen-chi) নামক আর একজন সেনাপতির হাতে নিজেদের বাহিনীর ভার দিল। টেঙ্গ-সেন-চি উত্তরী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিজয় বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং বিখ্যাত রেল-কেন্দ্র চেঙ্গচো (Chengchow) দখল করিলেন। চেঙ্গ-ছো-লিনের

সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পিছে হটিতে লাগিল। এই সময় জাতীয় সরকারের আয়ত্তাধীন প্রদেশে এক বিদ্রোহ হয়—টেঙ্গ-সেন-চি এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু টেঙ্গ তখন বুঝিলেন যে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছেন। তাই তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া উ-হানের জাতীয় রাষ্ট্রকে নিজের অধীন করিলেন। তখন হইতেই তিনি বলসেভিক হত্যায় লাগিয়া গেলেন। কুমিন টাঙ্গের বলশেভিকবাদী সভ্যরা সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে বলশেভিক আদর্শে ও প্রভাবে গড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-শেক ও টেঙ্গ-সেন-চি, উভয়েই তাহাদের উপর সমান অত্যাচার সুরু করিলেন। দলে দলে চীনা কমুনিষ্ট বন্দী, নির্য্যাতিত ও হত হইতে লাগিল।

অপর দিকে চিয়াঙ্গ-কাই-সেকের বিজয়যাত্রায়ও বাধা পড়িল। গৃহবিবাদের ফলে তাহারও শক্তিহানি হইল। তিনি শাঙ্গটাঙ্গ আক্রমণ করিয়া জাপানীদের নিকট পরাজিত হন এবং উত্তরী বাহিনীর নিকটও পরাজিত হইয়া দক্ষিণে হটিয়া আসেন। উত্তরী-বাহিনী সাংঘাইর নিকট পর্য্যন্ত আসে। তখন নানকিঙ্গ সরকার চিয়াঙ্গকে ডাকিয়া পাঠায়। ব্যর্থ ও পরাজিত হইয়া সরকারের আহ্বানে সেখানে ফিরিয়া যাওয়ার চেয়ে, তিনি জাপানে চলিয়া গেলেন (আগষ্ট ১৯২৭)। সেবারকারমত জাতীয় দলের জয় অপূর্ণ রহিয়া গেল। চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেকের সহিত কমুনিষ্টদের এই বিরোধ এখনও চলিতেছে।

মাস দুই তিনি বাহিরে থাকিলেন—সে সময় জাতীয়দল প্রায়

সর্ব্বত্রই পরাজিত হইতে লাগিল। তখন নানাদিক হইতে আবার তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ যাইতে লাগিল। ১৯২৭ অব্দেরই নভেম্বর মাসে আবার তিনি ফিরিয়া আসেন এবং জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এবার তিনি খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ-উ-সিয়ানের সহিত একযোগে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর নিকট চেঙ্গ-ছো-লিনের সৈন্য সর্ব্বত্রই পরাজিত হইতে লাগিল। প্রায় পেকিনের ধারে এক যুদ্ধে চেঙ্গ ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া উত্তরে পলায়ন করেন। মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার সময় তাঁহার ট্রেণে কে বা কাহারা বোমা নিক্ষেপ করেন। ইহার ফলে তিনি আহত হন এবং কয়েকদিন পর (১৯২৮ অব্দের ৪ঠা জুন) দেহত্যাগ করেন।

চেঙ্গ-ছো লিনের মৃত্যুতে জাতীয়দলের প্রধান শত্রু অপসারিত হইল। চীনের মুক্তিপথ সহজ ও সুগম হইল।

১১ই জুন জাতীয়দল পেকিন দখল করিল। চিয়াঙ্গ-কাঈ-সেকের চেষ্টায় সান-ইয়াৎ-সেনের আকাঙ্ক্ষা এত দিন পরে সফল হইল। সমস্ত চীন এক রাষ্ট্রের অধীনে আসিল।

উপসংহার

১৫ই অক্টোবর চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেক চীনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। চেঙ্গ-ছো-লিনের পুত্র চেঙ্গ স্যুয়ে-লিয়াঙ্গ (Chang Hsueh-Liang) প্রথম চেষ্টা করেন, কোন একটা আপোষ করিয়া নিজের ক্ষমতা বজায় রাখেন, কিন্তু চিয়াঙ্গ-কাঙ্গ-সেক জবাব দিলেন কোন প্রকার আপোষই সম্ভব নয়, বিনা সর্ত্তে জাতীয় রাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন, অন্য কোন পথ নাই। অগত্যা চেঙ্গ-স্যুয়ে-লিয়াঙ্গ বাধ্য হইয়া ১৯২৮ অব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় দলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাষ্ট্রনায়ক হইয়া চিয়াঙ্গের প্রধান চেষ্টা হইল, বৈদেশিক শক্তিদের সহিত সব অ-সমান সন্ধি দূর করিয়া চীনের উপর চৈনিক রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপন করা। আজিও চীন নিজের বাণিজ্য-শুল্ক নিজে নিয়ন্ত্রিত করিতে

পারে না, আজও বৈদেশিকদের বিচার করার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, আজও চীনের রেল, ডাক, খনি প্রভৃতি বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হয় নাই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ এবং বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ড চীনের এই সব দাবীতে বাধা দিতেছে।

চিয়াঙ্গ-কাঈ জানেন, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, শ্বেত জাতিগুলি চীনকে গ্রাহ্য করিবে না। স্থলযুদ্ধে সুনিপুণ একদল সৈন্য আজ চীনে আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে নৌ-বল না থাকিলে কোন জাতিই জগতে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই, তিনি ঠিক করিয়াছেন যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ৬০,০০০০০ টনের যুদ্ধ-জাহাজ তৈরী করিতে হইবে।

এই গেল একদিক। অপরদিকে চিয়াঙ্গ কাঈ-সেকের বিরুদ্ধে এখনও একদল লোক চীনে আছে। তাহারা কমুনিষ্ট বা বলসেভিক। চিয়াঙ্গও নির্ম্মমভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। তারই ফলে রুষিয়ার সহিত চীনের যুদ্ধাশঙ্কার কথা শুনা যায়। জাতীয় দলের মধ্যেও চিয়াঙ্গের বিরুদ্ধে একদল আছে। তাঁহারা চিয়াঙ্গ-কাঈ-সেককে নরমপন্থী (moderate) এবং স্বার্থান্বেষী বলিয়া মনে করে। ১৯২৯ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে একটু ছোট রকমের বিদ্রোহও হইয়াছিল। তারপর কেহ কেহ মনে করে যে, চিয়াঙ্গ-কাঈ-সেক অনেক বিষয়ে ইংরাজ পরামর্শদাতার (adviser) নির্দ্দেশেই চালিত হন।

এই অবস্থায় আজও জোর করিয়া বলা যায় না, চীনের গৃহ-বিবাদের শেষ হইয়াছে। চিয়াঙ্গ-কাঈ-সেকের সম্বন্ধে মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে তিনি চীনের যে উপকার করিয়াছেন, তার জন্য চীন চিরকাল তাহার নিকট ঋণী থাকিবে। দোষ, ত্রুটি, স্বার্থবোধ হয়ত তাঁহার আছে, হয়ত বা তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া, নূতন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করিতেও পারে, কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তাঁহার প্রতিভা ও নৈপুণ্যের ফলেই চীনের মুক্তি ও পুনর্জীবন আজ অদূর ও অবধারিত। আশা করি, চীন দিন দিন উন্নতির ও শক্তির পথে অগ্রসর হইয়া সমগ্র এসিয়ার মুক্তির অগ্রদূত ভাবে জগতে নূতন উষার সূচনা করিবে।

শ্যাম
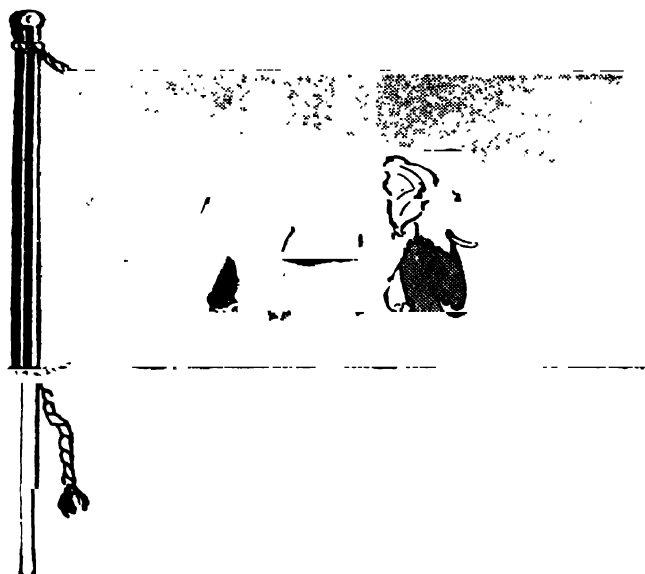
স্বাধীন দেশ

শ্যামদেশ আমাদের দেশের অতি নিকটে এবং ভারতের বৌদ্ধ-ধর্ম্মই তথাকার ধর্ম্ম। ভারতের সভ্যতার প্রভাব এখনও শ্যামদেশের উপর যথেষ্ট। বহু সংস্কৃত ও পালি শব্দ শ্যাম ভাষায় চলিত। সংস্কৃত অক্ষরমালাই শ্যাম দেশে প্রচলিত। বর্ত্তমানে উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের সহিত শ্যামীয় সাহিত্যেরও বিস্তার হইতেছে; এবং সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে তাহারা নিত্য নূতন শব্দ আহরণ করিতেছে। ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণরাই শ্যামদেশে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব শ্যামদেশের রাজার নাম, ভারতীয় আদর্শরাজা অযোধ্যাপতির সহিত একনাম—রাজা ষষ্ঠ রাম এবং রাণীর নাম

শচী। ভারতের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আমরা শ্যামদেশের কোন খবরই রাখি না।

শ্যামদেশে সিংহলী হীনযানীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। শ্যামদেশে ও সিংহলে একই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও দেশভেদে উহার চেহারা একটু বদল হইয়াছে। এক শ্যামদেশেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে মতভেদ-জনিত ২।৩ টা সম্প্রদায় আছে। মৃত আত্মা ও প্রেতপূজাও শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গ পূজাও (phalic worship) তথায় প্রচলিত আছে। সরকার হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহা দমন করিতে পারে নাই। নাংটীম (Nang Tim) নামে এক দেবীর পূজাও তাহারা করে। শ্যামবাসীরা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে আমাদের মতই পটু। প্রায় সকল বড় সহরেরই একটী করিয়া ভারতীয় নাম আছে এবং প্রত্যেক তীর্থেরই ভারতীয় নাম আছে। রাজধানী বেঙ্ককক নগরে একটি ব্রাহ্মণ্য মন্দির আছে। এই মন্দিরে বিষ্ণু, গণেশ, প্রভৃতি বহু ভারতীয় দেবতার মূর্ত্তি আছে। ইহার পুরোহিতগণ ভারতীয় বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। শ্যামদেশে সাধারণতঃ শুভাশুভ দিন নির্ণয় করিতে, ভবিষ্যৎ গণনা করিতে, সকলেই ব্রাহ্মণদের শরণ লয়। বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বহু মন্দির ও সংঘরাম আছে। এই সব মন্দিরের পোষণের জন্য সরকার হইতে আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। পুরোহিতগণ বালকদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক বালকই ১৩ বৎসর বয়সে

পুরোহিতদের নিকট পড়িতে যায়। যাহার পড়িতে ইচ্ছা না হয়, ৩।৪ মাস পরে সে পড়া ছাড়িয়া দিতে পারে। সাধারণতঃ ২১বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা পড়ে এবং পরে যাহার ইচ্ছা হয়, সন্ন্যাস অবলম্বন করে। বেঙ্গকক নগরে ও স্থানে স্থানে আজ নব্য ধরণের বিদ্যালয়ও ২।৪টা হইতেছে। প্রতিবৎসর বহু ছাত্র শ্যামদেশ হইতে ইউরোপে ও আমেরিকায় পড়িতে যায়। বর্ত্তমানে এক ইংল্যাণ্ডেই ২০০ শতের উপর শ্যামীয় ছাত্র আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্যামদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—ঐ সব বৌদ্ধ মন্দিরেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ভূতপূর্ব্ব রাজার পিতা রাজা চুললঙ্করণের নাম অনুসারে, বেঙ্গককে এক নব্য ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। শ্যামীয় ভাষাতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। শ্যামীয় অধ্যাপকগণ, নব্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বই মাতৃভাষায়ই প্রণয়ন করিতেছেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিভাষা তাঁহারা সাধারণতঃ চৈনিকভাষা হইতে গ্রহণ করিতেছেন এবং দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির পরিভাষা সংস্কৃত ও পালি হইতে গ্রহণ করিতেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামীয় অধ্যাপকগণই শিক্ষা দেন। তাঁহারা ইউরোপ আমেরিকা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

শ্যামদেশের আইন-কানুন প্রায়ই ভারতের আদর্শে গড়া—নৈতিক আদর্শ অনেকটা ভারতের অনুকরণ। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে চৈনিক প্রভাবও কিছু কিছু আছে। মৃতদেহ

সংস্কার করার প্রথা প্রচলিত আছে। শ্যামীয়দের মধ্যে চান্দ্র মাস প্রচলিত। এক মাস হয় ২৯ দিনে এবং পরবর্ত্তী মাস হয় ৩০ দিনে। বৎসরে মোট ৩৫৪ দিন। বৎসরে ১১ দিন করিয়া কম পড়ে, তাই ১৯ বৎসর পর ফালতু ৭ মাস ধরা হয়। তথায় ২টা অব্দ প্রচলিত আছে :—(১) বৌদ্ধাব্দ বা পুত্ত শকরাট (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে আরম্ভ, সাধারণতঃ ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে ব্যবহৃত হয়) (২) চুল শকরাট (শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বৎসর ৬৩৮ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত হয়)।

শ্যামীয় ভাষায়ও ভারতীয় প্রভাব যথেষ্ট। খাস শ্যামীয় শব্দের জন্য ২০টির বেশী ব্যঞ্জন বর্ণের দরকার হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ও পালিশব্দ বহু পরিমাণে শ্যামীয় ভাষায় চলে এবং সেই সব শব্দের জন্য সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহার করিতে হয়—তাহার ফলে শ্যামীয় ভাষায় ৪৩টী ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। স্বরবর্ণও বহু আছে। শ্যামীয় বর্ণমালার রূপ বা লিপি (characters) অনেকটা কম্বোজ দেশ (Combodia) হইতে গৃহীত হইয়াছে। কম্বোজীয় বর্ণলিপি দক্ষিণ ভারতের আর্য্যদের দান ; এই হিসাবে পরোক্ষভাবে শ্যামদেশীয় বর্ণমালা ভারতেরই দান। প্রাচীন শ্যামীয় সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ কথা-সাহিত্যের অনুবাদ ও রূপান্তর। রামায়ণ, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আখ্যান গ্রহণ করিয়া বহু শ্যামীয় গ্রন্থ রচিত হইত। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নব্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পাশ্চাত্য

প্রভাবের সাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। শ্যামীয়গণ নিজেদের বলে 'থাই' (অর্থাৎ স্বাধীন) এবং তাহাদের ভাষাকে বলে 'ফাষা থাই'—(অর্থাৎ স্বাধীনের ভাষা ; সংস্কৃত "ভাষা" শব্দের শ্যামীয় অপভ্রংশ 'ফাষা')।

বর্ত্তমানে শ্যামদেশের বিস্তৃতি ২লক্ষ বর্গ মাইল। আমাদের বাংলাদেশের (ত্রিপুরা ও কোচবিহার রাজ্য সহিত) বিস্তৃতি ৮২২৭৭ বর্গ মাইল। অর্থাৎ বাংলা দেশের ডবলের চেয়েও শ্যামদেশ বড়। কিন্তু লোকসংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম,—বাংলার লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ এবং শ্যামদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি বা কিছু কম। শ্যামীয়গণ তাহাদের দেশকে 'মুসঙ্গ থাই'—স্বাধীনের দেশ বলে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্যাম তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, নিজের নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। এসিয়াতে শ্যামদেশের মত বা তার চেয়েও ছোট আর তিনটি রাজ্য ছিল,—বেলুচিস্থান ইংরাজরা হজম করিয়াছে ; কোরিয়াকে হজম করিয়াছে জাপান, আফগানিস্থান তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে—প্রধানতঃ ইংরাজ ও রুষের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের জন্য। শ্যামের স্বাধীনতাও যে আজ পর্য্যন্ত আছে, তাহাও ইংরাজ ও ফরাসীর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের জন্য। পারশ্য, চীন, তুরস্কও কতকটা এই কারণেই আজও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রাক্ষসী ক্ষুধার আগুণে হজম হয় নাই। পূর্ব্ব হইতে ফরাসী ও পশ্চিম হইতে ইংরাজ, একের পর এক রাজ্য জয় করিয়া শ্যাম দেশের

দুই প্রান্তে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি আসিয়া দাঁড়াইল। রুষ ও ইংরাজের মধ্যে আফগানপ্রান্তেও ঠিক এমনই অবস্থা হইল। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এই তিন জাতিকেই তাহাদের লোলুপ জিহ্বা সংযত করিতে হইল। তাই শ্যাম ও আফগান রক্ষা পাইল। ১৮৯৬ অব্দে ইংরাজ ও ফরাসী শ্যাম দেশের স্বাধীন সত্তা মানিয়া লইয়া, এক সন্ধি করিল। ইউরোপে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডকে আক্রমণ করা যেমন নিষিদ্ধ, শ্যাম সম্বন্ধে এই দুই জাতি ঠিক সেই ব্যবস্থাই করিল। ঠিক হইল, ইহার পর আর কেহ শ্যামদেশের গায় হস্তক্ষেপ করিবে না।

শ্যামের স্বর্গীয় রাজা ষষ্ঠ রাম

শ্যামীয় সভ্যতা ও চরিত্র

শ্যামীয়গণ মোগলীয় বংশসম্ভূত। অর্থাৎ চীনা, জাপানী, প্রভৃতিদের সহিত এক গোত্রের। তাই তাহাদের মধ্যে চীনা সভ্যতার ছাপ থাকিবেই। কিন্তু অপর দিকে ভারতীয় আর্য্যদের প্রভাবও এরা এড়াইতে পারে নাই। খাস ভারত হইতে ও কাম্বোডিয়া হইতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব শ্যামে গিয়াছে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম আজও শ্যামীয়দের জাতীয় ধর্ম্ম, শ্যামীয়দের বর্ণমালা, ভাষা ও সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব প্রভূত। ভারতীয় আর্য্য বীর-পুরুষদের নাম ও কাহিনী শ্যামে সুপরিচিত। শ্যামের গত রাজার নাম ছিল—ষষ্ঠ রাম, শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। আর্য্য মনুস্মৃতির অনুমোদিত সাত প্রকার দাস শ্যামেও ছিল, এখনও শ্যামীয় মন্দিরে হিন্দু দেব দেবীর পূজা হয় ; এখনও শ্যামীয় সহরগুলির একটা করিয়া পালি নাম আছে।

এই রকম বহু বিষয়ে শ্যামীয় সমাজ ও সভ্যতা ভারতীয় প্রভাবে বিকসিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের মত শ্যামীয় জনসাধারণও অল্পেই তুষ্ট। ইহকালের জন্য তাহারা বড় ব্যস্ত না—কোন প্রকারে দুই বেলা কিছু খাবার জুটিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। প্রকৃতিদেবী শ্যামের প্রতি কার্পণ্য করেন নাই। মেনাম উপত্যকা বিশেষভাবে উর্ব্বরা। অল্প পরিশ্রমে বৎসরের খোরাকের উপযোগী ধান উৎপন্ন হয়। কলা ও অন্যান্য ফল ও তরকারীও সহজ-লভ্য। তারপর শ্যামে এখনও লোক-সংখ্যা তেমন বেশী না। তাই শ্যামীয়গণকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহারা কতকটা শ্রম-বিমুখ।

ভারতের বৌদ্ধ প্রভাব এদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই দৃষ্ট হয়। এদের চরিত্রেও বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবেই আছে। ইহারা স্বভাবতঃই করুণ-হৃদয়। সন্তান ও পরিবারের প্রতি ইহারা সদাই স্নেহশীল। শ্যামীয়দের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে—অবশ্য পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক কমিয়াছে। কিন্তু বহু বিবাহ সত্ত্বেও শ্যামীয় সমাজ নারীদের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার পর্দ্দা প্রথা নাই। কিন্তু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে মহিলাদের একেবারে অবাধ স্বাধীনতাও নাই। সাধারণতঃ শ্যামীয়দের মধ্যে, নারীরা অনেক স্থানে অর্থ উপার্জ্জন করে। শ্যামীয় পুরুষগণ বর্ম্মা-পুরুষদের মত অনেকটা শ্রমবিমুখ। তাহারা অনেক সময় স্ত্রীদের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে। তাই নারীরা যে কেবল সন্তান পালন বা ঘর-

সংসারের কাজই জানে, তাহা নহে; অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইয়া বাহিরের জগতের খবরও তাহাদের রাখিতে হয়। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও শ্যামীয় সমাজে আছে। পুরাতন প্রথা ভিন্ন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রথায় পরিচালিত মেয়েদের বিদ্যালয়ও আছে।

প্রাচ্য জাতিদের স্বভাবসিদ্ধ সততা ও সত্যবাদিতা শ্যামীয়দের চরিত্রেও আছে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংসর্গে আসিয়া ইহারা তাহাদের দোষও কিছু কিছু পাইতেছে। শ্যামীয় চরিত্রের একটা বিশেষত্ব তাহাদের বালকোচিত সরলতা।

বর্ত্তমানে শ্যামীয়দের উন্নতির প্রতিকূল তিনটি দোষ বিশেষভাবে তাহাদের চরিত্রে লক্ষিত হয়:—(১) শ্রমবিমুখতা (২) আফিং সেবন এবং (৩) জুয়া খেলা। বর্ত্তমান যুগের জীবন সংগ্রামের ফলে তাহাদের শ্রমবিমুখতা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতিদের আমদানি আফিং এখনও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আফিং সেবনের অপরিহার্য্য পরিণাম হইল জুয়াখেলা। তাহাও শ্যামীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছে। চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে আফিং ও জুয়াখেলা যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! শ্যামীয় সরকার আফিং ও জুয়া বন্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছে। শ্যামীয়গণ অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। থিয়েটার, ঘুড়ি-উড়ান প্রভৃতি আমোদে তাহারা অনেক স্ফূর্ত্তি পায়।

বাঙ্গালীদের মত শ্যামীয়দের ও "১২ মাসে ১৩ পার্ব্বন" আছে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ফুটবল ও অন্যান্য ক্রীড়াও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। এই সব আছে বলিয়াই আশা হয় যে, তাহাদের পক্ষে জুয়াখেলা ও আফিং ত্যাগ করা কতকটা সহজ হইবে। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিলে, সহজেই মানুষের মন এই সব কুৎসিৎ আমোদ-প্রমোদের প্রতি বিমুখ হয়।

প্রাচীন ইতিহাস

শ্যামীয়গণ বহুদিন পর্য্যন্ত কম্বোজের অধীনে ছিল। ৫৭৫ খৃঃ অব্দে বা ইহার কাছাকাছি কোন সময়, রাজা ফ্রারুয়াঙ্গ (Phra Ruang) শ্যামদেশ কম্বোজের হাত হইতে মুক্ত করেন। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে ভারতীয় প্রভাব শ্যামদেশে প্রবেশ করে। ক্রমেই বিজয়ী শ্যামীয়গণ দক্ষিণ ও পূর্ব্বে কম্বোজীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। ১২৮৪ অব্দে রাজারাম কামহেঙ্গ শ্যামরাজ্যের বিস্তৃতি অনেক বৃদ্ধি করেন। দক্ষিণে শ্যাম উপসাগর পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং মালয় উপদ্বীপেরও অনেকটা তাঁহার অধীন হয়। ১৩৫১ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে, শ্যামদেশে এক মহামারী আরম্ভ হয়। তখন রাজা ফ্রা রাম থিবোদি (Phra Rama

Thibodi) আয়ুথিয়াতে বা শ্রীঅযোধ্যায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাম থিবোদির আমলে শ্যাম রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুলমেন, টেভয়, টোনাসারিম (সব বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশে) ও মালকা উপদ্বীপ তিনি জয় করেন। এমন কি জাভাতেও তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি কিছু ছিল। এই সময় শ্যমীয়গণ কম্বোজ রাজ্য আক্রমণ ও তাহার অনেকটা জয় করে। কম্বোজ হইতে তাহারা ৯০,০০০ হাজার বন্দী লইয়া আসে। এই সময় হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত কম্বোজের সহিত শ্যামদেশের যুদ্ধ চলিতে থাকে। কম্বোজীয়গণ ক্রমেই পরাজিত হইয়া অবশেষে কার্য্যতঃ শ্যামের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে আনাম ও কোচিন চীন হইতে ফরাসীগণ কম্বোজের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিতেছিল। ফরাসীদের দাপটে বাধ্য হইয়া, শ্যামীয়রা কম্বোজের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করিল এবং তথায় ফরাসীদের কর্ত্তৃত্ব (Protectorate) স্বীকার করিল।

এই সময় হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত শ্যামদেশ ব্রহ্মদেশ ও পেগুর সহিত অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ব্রহ্মদেশীয়গণ বহুবার শ্যাম আক্রমণ করে এবং ১৫৫৫খৃঃঅব্দে রাজধানী অযোধ্যা দখল ও লুট করে। বিখ্যাতঃ শ্যামীয় বীর ফ্রা নরেটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্যামদেশ কাযতঃ ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল। ফ্রা নরেট ব্রহ্মীয়দের কবল হইতে শ্যামদেশ উদ্ধার করেন। কিন্তু ফ্রা নরেটের পর, ব্রহ্মীয়গণ আবার শ্যামদেশ আক্রমণ

করে। টেনাসিরিম, টেভয় প্রভৃতি দখল করিয়া দুই বৎসর অবরোধের পর ব্রহ্মীয়গণ রাজধানী অযোধ্যা জয় ও ধ্বংস করে (১৭৬৭ অব্দে)।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মীয়দের শ্যামীয়দের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। ফায়াটাথ-সিন নামে এক বিখ্যাত শ্যামীয় বীর, স্বদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বেঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যের পুনর্গঠন করেন (১৭৭২)। দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের রাজ্যসমূহ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং উত্তরেরও তিনি অনেক দেশ জয় করেন। এক হিসাবে তাঁহাকে বর্ত্তমান শ্যাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। এত করিয়াও শেষ বয়সে তিনি বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠেন। বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তিনি পাগল হন। সেই সময় তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে হত্যা করাইয়া নিজে রাজা হন (১৭৮২)। এই নূতন রাজার নাম ফায়া চাকক্রি। তিনিই বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ফায়া চাকক্রি একজন উপযুক্ত ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। হৃতরাজ্য তিনি অনেকটা পুনরুদ্ধার করেন। পূর্ব্বে চীনসম্রাটের বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ শ্যামীয়গণ মাঝে মাঝে চীনে দূত প্রেরণ করিত। এই সময় হইতে সেই প্রথা রহিত করিয়া, শ্যামীয়গণ চীনের নিকট নাম মাত্র বশ্যতাও অস্বীকার করে। শ্যামীয় জাহাজ শ্যামীয় নিশান উড়াইয়াই চীন বন্দরে প্রবেশ করিতে লাগিল ;

চীন সরকারও ইহাতে কোন আপত্তি করিল না অর্থাৎ চীন সরকারও এই ঔদ্ধত্য সহ্য করিয়াই চলিল। ১৮২৪ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৮২৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তাঁহারই এক পুত্র রাজা হন; কিন্তু তাঁহার বড় রাণীর পুত্রগণ নিজেদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। বড় রাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র পরম-ইন্দ্রমহা-মঙ্কুট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। নূতন রাজাও অনুপযুক্ত ছিলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ড ও ইয়াঙ্কির সহিত পুনর্ব্বার ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি শ্যামরাজ্যের পরিসর অনেক বৃদ্ধি করেন;— আসাম ও কম্বোজ শ্যামের অধীন হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরমইন্দ্র মহামঙ্কুট সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া রাজা হন (১৮৫১)। পরমইন্দ্র-মহামঙ্কুট খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রজাদের মধ্যে নব্য শিক্ষার বিস্তারেই মনোযোগী হন। বৈদেশিক শক্তিসমূহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি শ্যামকে সভ্য সমাজে পরিচিত করান। ফরাসীদের সহিত তাঁহার বিশেষ খাতির ছিল। ফরাসী-পাদরীদের মারফতে তিনি কিছু কিছু ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করেন। মহামঙ্কুট নিজে অবশ্য বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু অপর ধর্ম্মের প্রতি তিনি সদাই উদারতা দেখাইয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিছু শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের চেয়ে খৃষ্টান ধর্ম্মকে তিনি ছোট মনে করিতেন। পাদরীদের তিনি পরিষ্কারই বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন আশা না করে যে, তিনি বা

তাঁহার কোন লোক খৃষ্টান হইবেন, বরং খৃষ্টানদেরই বৌদ্ধ হওয়া উচিত।

ভাষা শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইংরাজী ভাষাও তিনি জানিতেন। বৈদেশিক দূত ও পাদরীদের সাহায্যে তিনি নানা ভাষা ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। জ্যোতিষ (Astronomy) শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৫৫-৫৬ অব্দে,তিনি ইংল্যাণ্ড, ইয়াঙ্কি ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, পাশ্চাত্য জগতের সহিত যোগ স্থাপন করেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সদাই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে তাহাদের করভার লাঘব করিয়া ও অপর দিকে নানাবিধ হিতকর প্রতিষ্ঠান দ্বারা তিনি প্রজাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় তিনি মালয় উপদ্বীপ হইতে গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই, তিনি অসুস্থ হন এবং দেহত্যাগ করেন।

অনেক দিন যাবৎই শ্যামে এককালীন দুই রাজা থাকার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সব সময়ই যে দুই জন রাজা থাকিতেন এমন কিছু নয়। রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মঙ্কুট যখন সন্ন্যাস নিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ-সহোদর দেশে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নানাভাবে জাতির সেবা করিতে লাগিলেন। এই সব নানা কার্য্যোপলক্ষে, ইউরোপীয়দের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই সময় তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য

বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। মঙ্কুটের সিংহাসনারোহণের পর, ১৮৫১ অব্দে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি জ্যেষ্ঠের সহযোগী ভাবে দ্বিতীয় রাজা হন। পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সব খবরই তিনি আগ্রহের সহিত চয়ন করিতেন। পাশ্চাত্য সামরিক, নাবিক, পূর্ত্ত ও অন্যান্য নানা বিজ্ঞানেও তাঁহার বিশেষ দখল জন্মে। তাঁহার চরিত্রে, উদারতায় ও দয়াগুণে সবাই মুগ্ধ ছিল। সৈন্য ও শ্যামীয় নৌ-বাহিনীতে, তিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের সূচনা করেন। পাশ্চাত্য ধরণে কয়েকখানা রণতরীও নির্ম্মান করেন। শ্যামীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন। শ্যামীয় ধরণের নূতন নূতন পোষাক ও অলঙ্কার নির্ম্মান করাইয়া, তিনি নিজে তাহা ব্যবহার করিতেন।

এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে তিনি শ্যামীয় জাতির জন্য যতটা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কেহই ততটা করেন নাই। প্রথম দিয়া সম্রাট মঙ্কুট সব বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহার সব কাজেই তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠের ক্রমবর্দ্ধনশীল জনপ্রিয়তা দেখিয়া, মঙ্কুট ক্রমে তাঁহাকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। মঙ্কুট তখন আর তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিতেন না। তাই, তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ তিনি বিশেষ শান্তিতে কাটাইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র জর্জ ওয়াসিংটন দ্বিতীয় রাজা হন। ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় রাজা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের

নেতা জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাই তাঁহার নাম অনুসারে নিজ পুত্রের নাম রাখেন। নূতন দ্বিতীয় রাজা জর্জ্জ ওয়াসিংটন পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। আজও শ্যামীয়গণ ভক্তিভরে তাঁহার নাম স্মরণ করে। ১৮৮৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রাজার পদ শূন্যই রহিল। কোন আইন করিয়া ইহা রহিত করা হয় নাই,—কিন্তু তবুও আর দ্বিতীয় রাজা নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কনিষ্ঠ রাজার মৃত্যুর দুই বৎসর পর রাজা মঙ্কুটও দেহত্যাগ করেন, এবং ১৮৬৮ অব্দে তাঁহার পুত্র চুল-লঙ্করণ পঞ্চম রাম রাজা হন। চুল-লঙ্করণ পঞ্চম রামের রাজত্ব-কাহিনী শ্যামের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী সম্পর্কের কাহিনী

ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্টুগিজগণই শ্যামের সহিত প্রথম ব্যবসায়-সম্পর্ক পাতে। ষোড়শশতাব্দীর পর্টুগিজ সেনাপতি আলবুকার্গ মালক্কা দখল করিয়া শ্যামের সহিত বানিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৭শ শতাব্দীতে পর্টুগিজদের হাত হইতে শ্যামীয় ব্যবসায় ওলন্দাজদের হাতে যাইতে থাকে। এই সময়ই ইংল্যাণ্ড-রাজ প্রথম জেম্‌স শ্যামরাজের নিকট এক দূত পাঠান। এবং এই সময় হইতে ইংল্যাণ্ডের সহিত শ্যামের বানিজ্য চলিতে থাকে। ব্যবসায় ও শ্যামসরকারের চাকুরী উপলক্ষে বহু ইংরাজ শ্যাম দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৬৭৮ অব্দে শ্যাম আক্রমণ করে। এই কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের সহিত ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল। ১৮৫৬ অব্দ হইতে আবার ইংরাজের সহিত ভালরকম ব্যবসায়

আরম্ভ হয়। প্রায় এই সময় হইতেই শ্যাম দেশে বিদেশীরা নানা অন্যায় অধিকার ভোগ করিতেছে। জাপান ভিন্ন আর সব প্রাচ্য দেশেই, ইউরোপীয়গণ Extra-territorial Jurisdictionএর সুবিধা সেদিন পর্য্যন্তও ভোগ করিয়াছে। ইহার বলে কোন ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার নিজের দেশের আইন অনুসারে এবং নিজের দেশী জজের নিকট তাঁহার বিচার হইবে। শ্যামেও এই অধিকার তাহাদের আছে।

ফরাসীগণ ১৬৮০ অব্দে শ্যামদেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইহার প্রায় ৮০ বৎসর পর তৎকালীন শ্যামরাজ ফ্রা-নারায়ণের, ফলকণ (Phaulcon) * নামে এক ইউরোপীয় মন্ত্রী ছিলেন। ফলকণ, ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর নিকট এক দূত পাঠায়। ফরাসীরাজও শ্যামে দূত পাঠান। ফরাসী-দূতরা আসিয়া রাজা ফ্রা-নারায়ণকে খৃষ্টান করার চেষ্টা করে এবং এদিকে ফলকণ জেস্যুট (Jesuit) মিশনারীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া শ্যামে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করার চেষ্টা করে। রাজা ও দেশীয় অমাত্যগণ ভয়ানক ক্ষেপিয়া, ফলকনকে হত্যা করেন। এই সময় হইতে খৃষ্টানদের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইতে থাকে। এবং শ্যামীয়গণ ফরাসীদের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করে। খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার করা ও ফলকণের ক্ষমতা খর্ব্ব করা ও

* ইহার পুরানাম কনষ্টেনটাইন ফলকন —ইনি জাতিতে গ্রীক ছিলেন।

তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, রাজা ফ্র-ফেট-রক্ষা বিদেশীদের দ্বারা অতি নিষ্ঠুর বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এই চিত্র মিথ্যা। ইহার পর বহুদিন শ্যামদেশে কোন ইউরোপীয় ছিল না—কিন্তু ক্রমে যখন চীন, জাপান, মালয় প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয়দের প্রভাব, যাতায়াত ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহারা শ্যামদেশেও আবার ঢুকিল।

এই গেল ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিত শ্যামদেশের সম্পর্কের মোটামুটি কাহিনী। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত শ্যামের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠতর; তাই সেই কাহিনী ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা দরকার।

(ক) শ্যাম ও ইংরেজ।

১৬১২ খৃঃ অব্দে গ্লোব (Globe) নামক জাহাজে কয়েকজন ইংরেজ-দূত শ্যামদেশে আসে। ইংল্যাণ্ড-রাজ জেম্‌স্ (James) শ্যাম-রাজের নিকট এক চিঠি লিখিয়া ইংরাজদের জন্য, শ্যামে ব্যবসায় করার অনুমতি চাহিয়া পাঠান। ইংল্যাণ্ড-রাজের এই আবেদন শ্যামরাজ মঞ্জুর করিলেন। ইংরেজরা শ্যামে ব্যবসায় করার অনুমতি পাইল। ব্যবসায় করা উপলক্ষে ইংরাজরা ক্রমে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া, বেশ একটু গুছাইয়া বসিতে লাগিল। ইহার কিছু পরে, ফরাসীরাও শ্যামে আসে। পর্টুগিস্ ও ওলন্দাজগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্যামে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায় করিতেছিল।

তারপর ক্রমে ফলকনের যতই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ইউরোপীয়দের সুবিধা ও প্রভাবও ততই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। ১৬৮০ খৃঃ অব্দের পর ইউরোপীয়দের প্রভাব খুবই বেশী হইল—তখন ফলকন শ্যামের প্রধান মন্ত্রী। ইউরোপীয়-দের ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত টেনাসারিম অঞ্চলে, বঙ্গ উপসাগরের কূলে মার্গুই (Mergui) বন্দরের খুবই উন্নতি হইতে লাগিল। ফলকনের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বার্ণালী (Burnaly) নামে একজন ইংরেজকে মার্গুইর শাসনকর্ত্তা এবং হোয়াইট (White) নামে আর একজন ইংরেজকে বন্দরাধ্যক্ষ বা 'শাহবন্দর' নিযুক্ত করা হইল। এই সময় ইংরাজদের প্রভাব-প্রতিপত্তির চরম অবস্থা।

কিন্তু ধূর্ত্ত ইংরেজগণ শ্যামরাজের এই বদান্যতা ও বিশ্বাসের অপব্যবহার করিতে লাগিল। মার্গুই বন্দরের উপর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল। তাহারা প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃ-পক্ষগণ বার্ণালি ও হোয়াইটকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে; এমন কি, ইংল্যাণ্ডের রাজাও তাহাদিগকে চিঠি লিখিয়া বিশ্বাসঘাতক হইবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু হোয়াইট এই অন্যায় প্রস্তাবে হঠাৎ রাজী হইতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে মার্গুইতে খবর আসিল যে, একদল ইংরেজ-রণতরী চট্টগ্রামের দিকে আসিতেছে—তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য মার্গুই দখল করা এবং বাহ্য উদ্দেশ্য নেগ্রেস (Negrais) অন্ত-রীপ দখল করা। তারপরই খবর আসিল 'রিভেঞ্জ' (Revenge) নামক শ্যামীয় সমুদ্রতরীকে বঙ্গ-উপসাগরে ইংরেজগণ বন্দী

করিয়াছে। আরও ২।১ খানা শ্যামীয় জাহাজ ইংরেজরা বন্দী করিল (১৬৮৭)। কিন্তু কলকন ও তাহার হাতের পুতুল রাজা কিছুই করিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে, কয়েকখানা রণতরী লইয়া ইংরাজরা টেনাসেরিম কূল আক্রমণ করে। এই সব যুদ্ধ-জাহাজের সেনাপতি ছিলেন কাপ্তান ওয়েল্টডন (Weltdon)। মার্গুই যাইয়া, হোয়াইটের অনুরোধেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক তিনি শ্যামীয়দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ-বিরতির সনাতন নিয়মও তিনি রক্ষা করিলেন না—কারণ তিনি সুসভ্য ইউরোপীয়, তাহার পক্ষে 'nothing is unfair in war'। এই যুদ্ধ-বিরতির সময়, তিনি শ্যামরাজের সব চেয়ে বড় যুদ্ধ-জাহাজ 'রিসোলিউসনকে' (Resolution) হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। এই জাহাজখানা হোয়াইটের ব্যবহারের জন্য তাঁহার আয়ত্তেই থাকিত। যখন জাহাজে বিশেষ কেহ নাই, সেই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তিনি সেই জাহাজখানা দখল করিলেন।

ইংরাজদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় শ্যামীয়গণ বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। তাঁহারা রাত্রিতে ইংরাজদের জাহাজ ও মার্গুইর সমস্ত ইংরাজ অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা বার্ণালী এবং প্রায় সমস্ত ইংরাজই হত হইল। ইংরাজদের ২।১ খানা যুদ্ধ-জাহাজও শ্যামীয়দের হাতে বন্দী হইল। কাপ্তান ওয়েল্টডন ও হোয়াইট

অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা 'রিসোলিউসন' জাহাজে চড়িয়া মাদ্রাজ গেলেন (১৬৮৭)।

ইহার পর শ্যামে ইংরাজদের প্রতিপত্তি কিছুই রহিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর পর, ইংরাজগণ আবার শ্যামরাজ্যে ব্যবসায় করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই অধিকার পাইল না। ইংল্যাণ্ড ও শ্যামের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হইল—কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে শ্যাম রাজী হইল না—কারণ তাহারাই পূর্ব্বের সব গোলমালের মূল।

(খ) শ্যাম এবং ফরাসী ও পর্টুগিস

১৬৬২ অব্দে একদল ফরাসী জেসুইট পাদরী মাগুই পৌছে। ব্যবসায়-বানিজ্য বিষয়ে ফরাসীরা পর্টুগিস, ওলন্দাজ বা ইংরাজদের মত তত উদ্যোগী নয়। ব্যবসায় উপলক্ষে তাহারা শ্যামে প্রথম আসে নাই—তাহারা আসিয়াছিল খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে। তখন রাজা চতুর্দ্দশ লুই, জেসুইট সন্ন্যাসীদের বিশেষ বাধ্য ছিলেন। তখন শ্যামের রাজা ছিলেন ফ্রা-নারায়ণ, তিনি এই পাদরীদলকে বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। প্রাচ্যদেশবাসীরা ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বদাই উদার, তাই ইউরোপীয়দের মত ধর্ম্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি এই দেশে তত হয় নাই—ধর্ম্মের নামে মানুষের উপর অত্যাচার করা যে প্রকারান্তরে ভগবানকেই আঘাত করা, প্রাচ্য দেশবাসীরা তাহা জানিত। এসিয়ার মধ্যে সেমিটিক—ইহুদি ও মুসলমানগণ ইউরোপের

সান্নিধ্যের জন্য কতকটা ইউরোপীয় স্বভাব পাইয়াছে—তাই তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মোন্মত্ততা কতকটা দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহাও মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃষ্টান সমাজের তুলনায় কিছুই নয়।

ফরাসী পাদরীগণ আসিবার পূর্ব্বেই পর্টুগিস পাদরীগণ শ্যামদেশে ছিল। পর্টুগিস পাদরীরা ফরাসী পাদরীদের ভাল চোখে দেখিল না—নানাভাবে তাহারা ফরাসীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সময় কোচিন-চীনেও ফরাসী পাদরীরা যায়। মোটের উপর, এই দুই দেশেই ফরাসী পাদরীরা ধর্ম্মপ্রচারের নামে বেশ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিল; রাজাও তাহাদের প্রতি সদয় ছিলেন। বহুলোক খৃষ্টান হইতে লাগিল। ক্রমে রাজকার্য্যেও রাজা ফরাসীদের সাহায্য লইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন হইল যে, রাজা ফ্রা-নারায়ণ খৃষ্টান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এমন সময়, আচীন (সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর অংশ) ও গোলকোন্দা রাজ্য হইতে দুইদল দূত আসিয়া রাজাকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করিল। এই ধর্ম্মের টানা-হেচ্‌ড়ায় পড়িয়া রাজা নিজের পৈতৃক ধর্ম্মেই রহিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পর পারস্য রাজার দূতগণও শ্যামরাজ ফ্রা-নারায়ণকে মুসলমান হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। সেই সময় আবার খৃষ্টান পাদরীগণও তাঁহাকে খৃষ্টান হইবার জন্য অনুরোধ করে। শ্যামরাজ পাদরীদিগকে বলিয়াছিলেন

যে, তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই—যদিই একান্ত কোন নূতন ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন, তবে সেটা মুসলমান ধর্ম্ম হইবে-না—ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি খৃষ্টানদের প্রতি ক্রমেই অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। নিজের একমাত্র কন্যা-সন্তানকে বিবাহ দিলেন একজন খৃষ্টান যুবকের সহিত এবং সেই খৃষ্টানকে শ্যামীয় সিংহাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন। বিদেশী খৃষ্টান কনষ্টেণ্টাইন ফলকনকে তিনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিলেন—ফলকন ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, কিন্তু রাজা তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র।

১৬৮০ অব্দে ফরাসীরাজ লুই এক ব্যবসায়িক দৌত্য পাঠান। শ্যামরাজের জন্য তিনি বহু উপহারও পাঠাইলেন। শ্যামরাজ পাল্টা এক দৌত্য ফ্রান্সে পাঠান।

ইহার কয়েক বৎসর পরই মার্গুই হইতে ইংরাজগণ বিতাড়িত হয়। সেই সময় হইতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। মার্গুই বন্দরের শাসনভার ও দুর্গ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ফরাসীরাও ইংরাজদের মতই বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিফল স্বরূপ ঠিক ইংরাজদের মতই তাহারাও শ্যাম হইতে বিতাড়িত হইল। সেই কাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লেখা হইল। দুই-দুইবার এইভাবে প্রতারিত হইয়া, শ্যামীয়গণ সমস্ত ইউরোপীয়কে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল—কেবলমাত্র ওলন্দাজগণ

কয়েকটি কঠিন সর্ত্তে সেখানে বাণিজ্য করার অনুমতি ও অধিকার পাইল।

পর্টুগিসগণও শ্যামীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই। ইউরোপীয় জাতির মধ্যে তাহারাই প্রথম বাণিজ্য-ব্যপদেশে শ্যামে যায়। তাহার পরই ওলন্দাজরা যায়। মেনাম নদীর মধ্যে, একখানা ওলন্দাজ জাহাজ পর্টুগিজরা বন্দী করিল (১৬২৪)। ওলন্দাজগণ শ্যামরাজের নিকট পর্টুগিজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। শ্যামরাজ পর্টুগিজদের এই কাজের প্রতিবাদ করিলেন। এই উপলক্ষে পর্টুগিজদের সহিত শ্যামীয়দের গোলমাল পাকিয়া উঠিল। কিছুদিন এই ভাবে চলার পর হঠাৎ পর্টুগিসগণ শ্যামরাজের কয়েকখানা জাহাজ বন্দী করিল। ইহার পর শ্যামীয়রাও পর্টুগিজদের কয়েকখানা জাহাজ বন্দী করিল। দুই বৎসর পর একদল পর্টুগিস-দূত শ্যামে আসে—তাহাদের প্রস্তাব অনুসারে, শ্যামরাজ পর্টুগিস বন্দী নাবিক ও জাহাজ মুক্ত করেন। কিন্তু খৃষ্টান পর্টুগিসগণ যে কত বড় প্রতারক, তাহা তিনি জানিতেন না। জাহাজ ও বন্দীদের খালাস করার পরই তিনি টের পাইলেন, এই সবই ফাঁকি ও প্রতারণা। কপট দূতগণ যাহা বলিয়াছে তাহা সবই মিথ্যা ও প্রতারণা।

তখন শ্যামরাজ আবার কয়েকখানা পর্টুগিস জাহাজ আটক করেন—এবং পর্টুগিসগণও টেনাসেরিম নদীর মুখে সমুদ্র হইতে কামান দাগিতে লাগিল। পর্টুগিসদের প্রতিরোধ করার জন্য

রাজধানী হইতে একদল সৈন্য স্থলপথে আসে। এই দলে ৮ জন গজারোহী জাপানী সৈনিকও ছিল। প্রত্যেক হাতীর সহিত দুইটি করিয়া কামান ছিল। শ্যামীয়গণ যখন পর্টুগিস জাহাজের উপর পাল্টা কামান দাগিতে লাগিল, তখন তাহারা প্রাণ লইয়া জাহাজ ভাসাইয়া পলাইল।

তাহাদের পালাইতে আর অল্প দেরী হইলেই হয়ত একখানা পর্টুগিস জাহাজও বাঁচিত না।

সুসভ্য পর্টুগিস, ইংরাজ ও ফরাসীরা একে একে তাহাদের সভ্যতা ও উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিল। সর্ব্বত্রই বিশ্বাস-ঘাতকতা, মিথ্যা, কপটতা, প্রতারণাই তাহাদের প্রধান সম্বল —এই সবটার সাহায্যে তাহারা আজ দুনিয়ার মালিক এবং এই সভ্যতার বড়াই করিয়াই তাহারা eastern barbarity, eastern cruelty, eastern treachery, eastern autocracy প্রভৃতি বুলি কপচায়। তাহাদের নিজেদের ইতিহাস যে সব অন্যায়, অনাচার, পাপ ও দুষ্কর্ম্মে পূর্ণ, প্রাচ্য জাতিসমূহের ইতিহাসে তাহার দশমাংশও নাই।

(গ) ফলাফল

১৬৮৫ অব্দে ফরাসীগণ দ্বিতীয় বার শ্যামে দূত পাঠায়। সেই সময় ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই জেসুইট পাদরীদের বিশেষ খাতির করিতেন। ফ্রান্সে তখন জেসুইটদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। এই দৌত্যের সহিত ১২ জন জেসুইট পাদরীও শ্যামে আসে। ডেস ফার্জ্জেস (Des Farges) নামক একজন সেনাপতির অধীনতায় ১৪০০ সৈন্যও এই সঙ্গে গেল। ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর (French East India Company) প্রতিনিধিও একজন এই সঙ্গে ছিল। এক কথায়, এই দৌত্যের মধ্যে ফ্রান্সের ব্যবসায়, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সামরিক বল—সবটারই প্রতিনিধি ছিল। ১৬৮৭ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, ফরাসীরা মেনাম নদীর তীরে আসিল। এই সৈন্য-বাহিনীর সংবাদ পাইয়া শ্যামরাজ একটু

বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি সৈন্যদের শ্যামে নামিবার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু ফলকন তলে তলে ফরাসী সৈন্যের আগমন সমর্থন করিতেন এবং ইহাদের আগমনের মূলে কতকটা হাতও তাঁহার ছিল। যাক্, ফলকনের চেষ্টায় ও অনুরোধে রাজা অবশেষে সৈন্যদের অবতরণের অনুমতি দিলেন। ফলকনের চালে ভুলিয়া রাজা আরও একটা ভুল করিলেন। বেঙ্ককের দুর্গে ও মেরগুইতে (Mergui) ফরাসী সৈন্য থাকিবার অনুমতি তিনি দিলেন। মেরগুইতে ফরাসীরা নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিবে। এই দুই সহরের দুইটী দুর্গই ফরাসীদের হাতে থাকিবে। সেনাপতি ডেস ফর্জেস বেঙ্কক দুর্গের সেনাপতি হইবেন। ফরাসীরাজ লুই ফলকনকে বহু উপহার ও ফরাসী উপাধি দিলেন—ফলকন ক্রমে প্রকাশ্যেই ফরাসীদের সহিত যোগ দিল।

এদিকে দেশীয় সর্দ্দার ও অভিজাতবর্গ ফরাসীদের ব্যবহারে ক্রমে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। প্রায় এক বৎসর পর শ্যামরাজ পীড়িত হন। তখন রাজা ও ফলকনের অজ্ঞাতসারে রাজধানী হইতে কতকটা দূরে লুভোর (Louvo) রাজপ্রসাদে, শ্যামীয় অভিজাতগণ সম্মিলিত হয়। সেই সভায়, তাহারা ফ্রা-ফেট-রাক্সা (Phra-Phet-Raxa) নামক শ্যামীয় সেনাপতিকে রাষ্ট্র-প্রধান করে। ফ্রা-ফেট বাল্যে একজন ফলবিক্রেতা ছিলেন এবং নিজের শক্তিতে তিনি বিখ্যাত সেনাপতি হন। কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি কম্বোজ (Combodia) ও কোচীন-চীন জয় করিয়া আসিয়াছেন।

ফরাসী ও ফলকনের উপর যে রাগ তাহাদের ছিল, তাহা ক্রমে রাজার উপর যাইয়া বর্ত্তিল। রাজার একমাত্র কন্যার স্বামী ছিলেন খৃষ্টান। রাজা এই খৃষ্টান জামাতাকেই পোষ্যপুত্র ভাবে নিজের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। ইহাতেই রাজার উপর সকলে বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হন। দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহাতে প্রথম আহুতি পড়িল ফলকন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে হত্যা করিল। ইহার কিছু পরে রাজা মারা গেলেন, অনেকের সন্দেহ বিদ্রোহিগণই তাঁহাকে গোপনে হত্যা করে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার পর, রাজার ভ্রাতাদিগকে, জামাতা ও কন্যাকেও বিদ্রোহীরা হত্যা করিল। কিন্তু রাজবংশ-সম্ভূত এই লোকদিগের গায়ে হাত তুলিতে শ্যামীয়গণ সঙ্কোচ বোধ করিল। তাই তাহারা এই কয়েকটি লোককে ছালার বস্তার মধ্যে ভরিয়া, মুদ্গর পিটাইয়া হত্যা করে। এই ভাবে তাহারা রাজবংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। রাজবংশের কাহারও শরীরে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে পাপ, তাই এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!

রাজার পক্ষ হইতে সিংহাসনের দাবীদার সবাইকে হত্যা করিয়া, সর্দ্দারদের সাহায্যে ফ্রা-ফেট-রাক্ষা, এইবার ইউরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। রাজধানী আউথিয়া বা অযোধ্যাতে, যে সব ইংরাজ, ফরাসী ও পর্টুগিস্ ছিল, সবাইকে তিনি আটক করিলেন। কয়েকটি সর্ত্তে ওলন্দাজগণ ব্যবসায় করিবার অধিকার পাইল। বেঙ্ককের ফরাসী

সৈন্যদের কথাও তিনি ভুলিলেন না। সেখানকার ফরাসী সেনাপতি ডেস ফার্জেসকে লোভো নগরে আহ্বান করিয়া আনেন। (এই লোভো নগরে রাজার অন্যতম বাসস্থান ছিল। এইখানকার রাজ প্রাসাদে বসিয়াই সর্দ্দারগণ বিদ্রোহের প্রথম ষড়যন্ত্র করেন)। তিনি ফার্জেসকে বলিলেন, ফার্জেস যেন সমস্ত ফরাসীসৈন্য লইয়া আউথিয়াতে উপস্থিত হন। ফার্জেস বলিলেন, তিনি নিজে যাইয়া আদেশ না দিলে, কেবল তাঁহার পত্রের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার সহকারীরা দুর্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। ফ্র-ফেট-রাক্ষা বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা আপাত-যুক্তিসঙ্গত এবং বোধ হয় ইহাও বুঝিলেন যে, ফার্জেস নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে না।

কাজেও তাই হইল। ফরাসীরা বেঙ্গকক দুর্গ পরিত্যাগ করিল না। শ্যামীয়গণ যাইয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কিন্তু ফরাসীদের যে রকম উন্নত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল ও সামরিক শিক্ষা ছিল, শ্যামীয়দের সেইরূপ ছিল না। এই সময় ইউরোপীয়গণ নরহত্যা-বিদ্যায় প্রাচ্যীয়দের চেয়ে অনেক বেশী ওস্তাদ এবং এই ওস্তাদীর সাহায্যেই তাহারা আজ প্রাচ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

যখন শ্যামীয়গণ বেঙ্গককের ফরাসীদুর্গ অবরোধ করিতেছিল, সে সময় শ্যামরাজের মৃত্যুর খবর রাষ্ট্র হয়। বোধ হয়, তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক দিন, এই খবর গোপন রাখা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই, ১৬৮৮ অব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রা-ফেট-রাক্ষা শ্যাম ও টেনাসেরিমের রাজা হইলেন। প্রায় দুইমাস পর,

৩০শে সেপ্টেম্বর, ফরাসীদের সহিত এক সন্ধি হইল। ঠিক হইল, ফরাসীরা, বেঙ্ককক দুর্গ ও শ্যামরাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে— শ্যামীয় রাষ্ট্র দুইখানা জাহাজ দিয়া, তাহাদিগকে পঁদিচারী পাঠাইয়া দিবে। ইংরাজ ও ফরাসী অন্যান্য বন্দীরা, ফ্রা-ফেট-রাক্সার অভিষেকের পর দিনই মুক্তি পাইয়াছে।

ইহারই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ঠিক এমনি ভাবে জাপান নিজ রাজ্য হইতে সমস্ত খৃষ্টান ও ইয়োরোপীয়দিগকে বিতাড়িত করে। যদি ভারতের মোগল ও মারাঠা ও অন্যান্য নবাব ও রাজারাও ঠিক এইভাবে ইউরোপীয়দিগকে নির্ম্মম ভাবে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিত, তবে বোধ হয়, ভারত আজও স্বাধীন থাকিত। কালিকটের জামোরিনের সদাশয়তা ও সুলতান সাজাহানের কৃতজ্ঞতার এবং অন্যান্য ভারতীয় রাজা ও নবাবদের দয়া ও ঔদার্য্যের দণ্ড-স্বরূপ ভারতের এই বিদেশী শাসন। যা'ক্, জাপান ও শ্যাম, এইভাবে ইউরোপীয়দের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে অব্যাহতি পাইল।

মার্গুইর ফরাসী সৈন্যরা কয়েক মাস পূর্ব্বেই দুর্গ* ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা শ্যামীয়দের নিকট আত্ম সমর্পণ না করিয়া, দুর্গ হইতে জাহাজে উঠার চেষ্টা করে। জাহাজে উঠার সময় শ্যামীয়দের আক্রমণে অনেক ফরাসী সৈন্য মারা যায়। সমুদ্রবক্ষেও শ্যামীয় রণতরী তাহাদের জাহাজের পিছু লয়। কয়েক মাস এধার ওধার ঘোরাঘুরির পর, ফরাসীরা এক মরুভূমির মত জনমানবশূন্য দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লয়।

সেপ্টেম্বর মাসে ডেস ফার্জেসের সৈন্যদের সহিত তাহারাও সেই দ্বীপ হইতে শ্যামীয় জাহাজে পঁদিচারী যাত্রা করে।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত, ইউরোপীয়গণ শ্যামদেশে মোটেও আমল পায় না। কয়েক বৎসর পরই আবার ইংরাজ ও ফরাসীরা শ্যামদেশে আড্ডা স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু শ্যামরাজ তাহাদিগকে সেই অনুমতি দেন নাই। কিন্তু ইংরাজগণ সাধারণ ভাবে ব্যবসায় করার অনুমতি পাইয়াছিল। ফরাসীগণ তাহাও পায় নাই। অনেক বৎসর পর, প্রাচ্যে অন্যান্য সব দেশের মতো শ্যামেও তাহারা আড্ডা স্থাপন করে ও অন্যায় অধিকার ও সুবিধা আদায় করে।

এদিকে, ফ্রা-ফেট-রাক্ষা রাজা হইবার পর কিছুদিন বেশ শান্তিতেই কাটিল; কিন্তু ২।৪ বৎসর পরেই শ্যামে অন্তর্ব্বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই সব গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, শ্যাম ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ১৭৫৯ অব্দে ব্রহ্ম-সম্রাট অলঙ্ঘ প্রা (Alaunghpra) শ্যামের হাত হইতে টেনাসেরিম প্রদেশ দখল করেন। ১৩দশ শতাব্দীর কাছাকাছি ব্রহ্মের হাত হইতে শ্যাম, টেনাসেরিম প্রদেশটি দখল করে। ইউরোপীয়দের আগমনের পর, মার্গুই ও টেনাসেরিম বন্দর দুইটীর বিশেষ উন্নত হয়। ইংরাজ, ফরাসী, প্রভৃতি জাতির লোলুপ দৃষ্টি মর্গুই বন্দরের উপর বরাবরই ছিল। ১৭৫৯ অব্দ হইতে এই প্রদেশ আবার ব্রহ্মীয়দের হাতে যায়। ১৮২৪ অব্দে, যখন ইংরাজগণ দক্ষিণ ব্রহ্ম জয় করে—তখনই এই

প্রদেশ তাহারা জয় করে। মাগুর্ই বন্দর বিনাসর্ত্তে তাহাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করে। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজদের যে সন্ধি হইল, তাহাতে দক্ষিণ ব্রহ্মর সহিত টেনাসেরিম প্রদেশও ইংরাজ শাসনে আসিল—সেই হইতেই ইহা ইংরাজ অধিকারেই আছে। মাগুর্ই বন্দর এই প্রদেশেই ছিল—মাগুর্ই বন্দরই ছিল শ্যামের প্রধান বন্দর। ইহার ৮ বৎসর পর, ব্রহ্মীয়গণ আবার শ্যাম আক্রমণ করে এবং রাজধানী আউথিয়া ভস্মীভূত করে (১৭৬৭ অব্দে)

এই আউথিয়া বা অযোধ্যা নগর বহু প্রাচীন। ১৩৫০ অব্দে, শ্যামরাজ ফ্রা-রাম-থিবোড়ি (Phra-Rams-Thibodi) এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরের শ্যামীয় নাম হইল অযুল্লাজা—ইউরোপীয়দের মুখে অযুল্লাজার অপভ্রংস হইল আউথিয়া। অযুল্লাজা হইল, আবার সংস্কৃত অযোধ্যার অপভ্রংস। অযোধ্যা-পতি শ্রীরামের রাজধানীর নাম অনুসারেই, শ্যামপতি ফ্রা-রাম নিজের রাজধানীর নামকরণ করেন।

ব্রহ্মীয়দের দ্বারা ১৭৬৭ অব্দে অযোধ্যা ধ্বংস করিল—ইহার পর হইতে বেঙ্গককই রজধানীর স্থান অধিকার করে।

(ঘ) শ্যাম ও ইউরোপীয় জাতি

(১৯শ শতাব্দী)

শ্যামদেশ বেশ সমৃদ্ধিশালী। বিশ্বগ্রাসী ইউরোপীয়দের লোলুপ দৃষ্টি তাহার প্রতি বরাবরই ছিল। কিন্তু তাহাদের মনের বাসনা নানা কারণে পূর্ণ হইতেছিল না। তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া শ্যামীয়গণ সদাই সতর্ক ছিল। ফলকনের মৃত্যুর সাথে সাথে ফরাসীদের সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয়গণও শ্যাম হইতে বিতাড়িত হইল। ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত আর তাহারা শ্যামদেশে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ১৮৫৫-৫৬ অব্দে সম্রাট মঙ্গকুটই বিশেষভাবে আবার ইউরোপীয়দের সহিত লেন-দেন আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ড, ইয়াঙ্কি ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে শ্যামে বসবাস ও বাণিজ্যের অধিকার দেন।

১৭শ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত শ্যামের বিরোধ এবং ফলকনের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের পর, শ্যাম, ইংরাজ ও ফরাসীদের সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতেই গররাজী ছিল। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে এই দুই জাতি আবার শ্যামে উপস্থিত হয়। সে সময় শ্যামের প্রায় চতুর্দ্দিকেই ইংরাজ এবং ফরাসীর প্রভাব ও সাম্রাজ্য। এডমিরেল পেরি যখন কামানের মুখে জাপানের দরজা খুলিল, তখন জাপান ক্রমে বিদেশীদের নিকট অনেক স্বত্ব ও অধিকার বিসর্জ্জন দিল। ইংরাজ ঠিক সে সব দাবী শ্যামের নিকট উপস্থিত করিল এবং শ্যামের এমন ক্ষমতাই ছিল না যে, সে ইংল্যাণ্ডকে বিমুখ করে। ১৭শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স শ্যামের নিকট পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই শতাব্দীতে তাহারা নূতন বল সঞ্চয় করিয়াছে; অথচ প্রাচ্য জাতিসমূহ এই দুই শতাব্দীতে অনেকটা শক্তিহীন হইয়াছে। তাই সে প্রতিরোধ ক্ষমতা আর নাই।

১৮৮৫ অব্দে ইংল্যাণ্ড ও শ্যামের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্যাম ইংল্যাণ্ডের নিকট নিজের স্বাধিকার বিসর্জ্জন দিল। শ্যামীয় আইন আদালতের কোন অধিকারই কোন ইংরাজ প্রজার উপর রহিল না। তাহাদের সব বিচার—তাহারা বাদীই হউক বা বিবাদীই হউক ইংরাজের আইনে ও ইংরাজের আদালতে হইবে। ইহারই নাম একস্ট্রা টেরি টোরিয়েল অধিকার (Extra territorial rights)। ঐ সন্ধি অনুসারে বিলাতী দ্রব্যের

উপর শ্যাম কখনও ৩ টাকার বেশী আমদানি-শুল্ক বসাইতে পারিবে না। অর্থাৎ শ্যামের আয়ের পন্থা রুদ্ধ হইল। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিও শ্যামের নিকট এই সব অধিকার আদায় করিল—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পর্তুগেল, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, স্পেন---সব দেশই এই সব সুবিধা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভোগ করার অধিকার আদায় করিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের লক্ষ লক্ষ এসিয়াটিক প্রজাও ঐ সব সুবিধা পাইল—ভারতবাসী,ব্রাহ্মী, সিঙ্গাপুরী, জাভী, চীনা ফিলিপিনো, আনামী, টঙ্কনী, কম্বোজী প্রভৃতিও এসব অধিকার পাইল। ইহার ফলে শ্যামীয় আইনের কোন মর্য্যাদাই রহিল-না। লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় ও এসিয়াটিক প্রজা নির্ব্বিবাদে আইনের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে লাগিল। জুয়াখেলা ও আফিং আমদানী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পথে আর কোন বাধাই রহিল না। কোন বিদেশী প্রজা জুয়া খেলিলে বা আফিং আমদানী করিলেও শ্যামীয় আইন তাহার প্রতি প্রযোজ্য নয়। তাই ঐ সব পাপ বন্ধ করার কোন উপায়ই রহিল না।

এই সময় চীনে ইউরোপীয়দের অধিকার প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত; ব্রহ্মদেশ ইংরাজের কুক্ষিগত, আনাম-টঙ্কিন প্রদেশে ফরাসীর প্রতাপে দেশীয় রাজশক্তি লুপ্তপ্রায়, দক্ষিণে পেনাঙ্গ-সিঙ্গাপুর ইংরাজের অধিকারে। তারপর শ্যামের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে শ্যামের অধিকার নাই এতটুকুও; কিন্তু ইংরাজ-ফরাসীর

অধিকার তথায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ শ্যামের চতুর্দ্দিকেই তখন ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভদ্রতা, উদারতা, প্রভৃতি সদগুণের জলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান। এই সব জানিয়াও তাহাদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন বিশেষ দুঃসাহসের পরিচয়; এই দুঃসাহসের ফলে অনতিকাল মধ্যেই শ্যামকে বিশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে টঙ্কিনের এক বিদ্রোহী নেতা সেখানকার রাজা চিয়ান টঙ্গকে (Chien Tong) বিতাড়িত করিয়া, টঙ্কিন প্রদেশ দখল করেন। ইহার পর বিদ্রোহী নেতা দক্ষিণের আনাম রাজ্য আক্রমণ করেন। আনাম-রাজ গিয়ালঙ্গ (Gia lang) পরাজিত হইয়া শ্যামে আশ্রয় লন এবং শ্যামরাজের সাহায্য চান। শ্যামরাজ ফায়া চাকক্রি তাঁহাকে সাহায্য করিতে ভয় পাইলেন—উদ্ধত বিদ্রোহীদের বিরাগভাজন হইতে তিনি রাজী হইলেন না। কিন্তু গিয়ালঙ্গকে তিনি যত্নের সহিত আশ্রয় দিলেন (১৭৮৭)। শ্যামে তখন একদল ফরাসী জেসুইট পাদরী ছিল। ধর্ম্মের আবরণে থাকিয়া, রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা দেখিল, গিয়ালঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, আনামে ফরাসী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এই এক অপূর্ব্ব সুযোগ। গিয়ালঙ্গের পুত্র কান-জুইকে (Canh-dzue) লইয়া, জেসুইটগণ ফ্রান্সে যাত্রা করিল। তৎকালীন ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই রাজকুমারকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। জেসুইট সন্ন্যাসীরা লুইকে বুঝাইল যে,

প্রাচ্যে ইংরাজের ক্রমবর্দ্ধনশীল শক্তিকে খর্ব্ব করার পক্ষে আনাম বিশেষ দরকারী। এই সব শুনিয়া ষোড়শ লুই গিয়ালঙ্গকে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন।

কিন্তু ষোড়শ লুইর পক্ষে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না। আনাম কুমার কান-জুইর সহিত ভার্সেল নগরে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল এবং ইহার কিছু পরেই ফ্রান্সে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। লুই তখন ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত। ইহার দুই বৎসর পরই, ফরাসী-বিদ্রোহের আগুনে ফ্রান্সের রাজসিংহাসন পুড়িয়া ছাই হইল। ষোড়শ লুইর ছিন্ন শির ধরণীবক্ষে লুণ্ঠিত হইল। রাজসাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও, সেই জেসুইট পাদরীগণ নিরস্ত হইল না। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সৈন্য, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহারা ১৭৮৯ অব্দে কোচিন চীনে পদার্পণ করিল। টঙ্কিন ও আনামের রাজসৈন্য ফরাসী সৈন্যের নিকট দাঁড়াইতে পারিল না। ১৭৮৯ অব্দে গিয়ালঙ্গ আনামের রাজসিংহাসনে বসিলেন। ফরাসী সৈন্য ও কর্ম্মচারীরাই যে তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন না। রাজ্যের সৈন্য, দুর্গ ও অন্যান্য উচ্চ রাজকার্য্য ফরাসীদের হাতেই রহিল। ফরাসী পাদরীগণও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু আড্ডা স্থাপন করিল।

গিয়ালঙ্গের মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কান-জুই মারা যান। ১৮২০ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর সময়, গিয়ালঙ্গ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মিন মেঙ্গকে (Minh Mang) উত্তরাধিকারী

মনোনীত করিয়া যান। মিনমেঙ্গ রাজা হইলে পর, কান-জুইর সন্তানদের পক্ষাবলম্বীরা এক বিদ্রোহের প্রচেষ্টা করে। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল, কিন্তু মিনমেঙ্গ অনুমান করিলেন যে, কান-জুইর বন্ধু ফরাসীরাই এই বিদ্রোহের মূল। তাই তিনি ফরাসীদের উপর বিশেষ ভাবে বিরূপ হইলেন। তখন হইতেই তিনি ফরাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। জেসুইট পাদরীরা অম্লান বদনে এই অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। মিনমেঙ্গ তাহাদিগকে আনাম হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। মিশনারীরা এই আদেশ অগ্রাহ্য করিল। ফলে অত্যাচার ভীষণতর রূপ ধারণ করিল। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সব রকম বিপদ, কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করিতে জেসুইটগণ বরাবরই বিখ্যাত। আনামেও তাহারা বহু অত্যাচার সহ্য করিল এবং বহু জেসুইট আনাম-রাজের আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করিল।

এই সব অত্যাচারের অছিলা লইয়া, ফরাসীরা ক্রমে আনাম গ্রাস করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের পরও কয়েক বৎসর লাগিল ফ্রান্সের ঘর সামলাইতে। ১৮৪০ অব্দে ফরাসীরা আনামের দিকে নজর দিল, এবং ক্রমে ক্রমে টঙ্কিন, আনাম ও কাম্বোডিয়া গ্রাস করিল।

অপর দিকে ১৮৮৫ অব্দে, উত্তর ব্রহ্ম জয় করিয়া, ইংরাজরা মেকঙ্গ নদীর পূব পারেও নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিল। শ্যামের উত্তরে ও চীনের দক্ষিণে, পূব হইতে ফরাসী ও পশ্চিম হইতে ইংরাজ আসিয়া সামনাসামনি দাঁড়াইল। দুই শক্তিই

বুঝিল যে,উভয়ের রাজ্যের মধ্যে শ্যামের স্বাধীনতা মানিয়া লইয়া, দুই জাতিরই নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ রাজ্য ভোগ করাই বিধেয়। কিন্তু কেহই অপরকে বিশ্বাস করিত না, সন্দিগ্ধতা বশতঃ এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮৯২ অব্দে ফরাসীরা আবার এই রকম আর একটি প্রস্তাব করিল। পূর্ব্বের আলোচনার সময় ফরাসীরা বহুবার স্বীকার করিয়াছে যে, মেকঙ্গ নদীর পূবপারে লুয়াং প্রবাঙ্গ (Luang Probang) প্রদেশ শ্যামেরই অন্তভূ ক্ত। মেকঙ্গের পূবপারে চিয়াং চিয়ঙ্গ (Kyang Chaing) নামে সামন্ত রাজ্যটি শান রাষ্ট্রমণ্ডলীর (Shan States) সহিত ইংরাজের তাঁবে আসে। এই প্রদেশটিও শ্যামের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা হইয়াছিল। শেষবারে প্রস্তাব উঠিবার কিছু আগেই ফরাসীরা সমুদ্রকূলে সমিত অন্তরীপ (Point Samit) এবং উত্তরে লুয়াঙ্গ প্রবাঙ্গের নিকটবর্ত্তী টুং কিঙ্গ আম স্থানদ্বয় দখল করে। কোচিন চীনের ফরাসী কর্ম্মচারীরাই ইহা করিয়াছিল, কিন্তু কিছু পরে ফ্রান্স হইতে হুকুম হইল যে, এই স্থানদ্বয় ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার পরেই ১৮৯২ অব্দে, ইংরাজের সহিত আপোষের চেষ্টা হয়। এই আপোষ প্রসঙ্গেই ফরাসীরা প্রথম দাবী করিল যে, মেকঙ্গ নদীর পূবপারে শ্যামের কোনই অধিকার নাই, সবই আনাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দাবীর অর্থ লুয়াঙ্গ প্রবাঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে শ্যামের কোনই অধিকার নাই। ইহার কয়েক দিন পরই ফরাসীরা অভিযোগ করিল যে, শ্যামীয়গণ আনাম রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে

ফরাসীরা দাবী করিল যে, অবিলম্বে মেকঙের পূবপার হইতে শ্যামীয়রা দূর হইবে। শ্যামীয়রা সালীসীর দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসার প্রস্তাব করিল। কিন্তু ফরাসীরা তাহাতে রাজী হইল-না। তাহারা আনাম ও কাম্বোডিয়ার স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাই শ্যামীয়দের প্রতি কড়া হুকুম চালাইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরই, ফরাসীরা শ্যামদেশ আক্রমণ করিল। তাহারা শ্যামের অন্তর্গত কয়েকটি স্থানও দখল করিল। তখনও শ্যামীয়রা সালিসী মীমাংসার জন্য প্রস্তুত। তাহারা ইংরাজদের নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইল। কিন্তু ফরাসীরা নিজেদের দাবী পুরাপূরী আদায় না করিয়া কোন মীমাংসা করিতে রাজী নয়। মেকঙ নদীর বদ্বীপটি ফরাসীরা দখল করিয়াছিল। শ্যামীয়রা সেই দ্বীপ আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ফরাসীপক্ষে বহু সৈন্য হত হইল এবং একজন ফরাসী সেনানী বন্দী হইল। ইহাতে ফরাসীরা ভয়ানক ক্ষেপিল। তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য ইংরাজের পরামর্শে শ্যামীয়রা ফরাসী সেনানীটিকে মুক্তি দিল। শ্যামেরই অন্তর্গত দ্বীপটি তাহারা দখল করিয়া থাকিবে, অথচ শ্যামীয়রা তাহা উদ্ধারের চেষ্টা করিবে না,—পাশ্চাত্য রাজনীতির চমৎকার ব্যবস্থা! ইহাতেও ফরাসীরা সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা ক্রমাগতই শ্যামীয় রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরাজরা শ্যামীয়দের পরামর্শ দিল, তাহারা যেন ফরাসীদিগকে কোন বিষয়েই বাধা না দেয়। এই পরামর্শ অনুসারে শ্যামীয়গণ অগ্র-

গামী ফরাসীদের সম্মুখে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তবুও এক ফরাসীবাহিনী পশ্চাৎগামী শ্যামীয়বাহিনীকে আক্রমণ করে। এইবার শ্যামীয়গণ বাধা দিল। এই খোঁচাখুঁচিতে গ্রসগুরিণ (Gros Gurin) নামক একজন ফরাসী সেনানী হত হইল। ফরাসীরা এক মস্ত সুযোগ পাইল। এই ঘটনাকে নানা মিথ্যা ভাষণের দ্বারা তাহারা প্রমাণ করিতে চাহিল যে, শ্যামীয়গণ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে নিরুপদ্রব ফরাসী সেনানীকে হত্যা করিয়াছে।

আসন্ন বিগ্রহের আশঙ্কায়, ব্যাঙ্ককের ইংরাজ বণিকরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের আগ্রহে সিঙ্গাপুর হইতে কয়েকখানা ইংরাজ রণতরী ব্যাঙ্ককে প্রেরিত হইল, ফরাসী রণতরীও শ্যামের উপকূলে আসিল এবং ২।১টি শ্যামীয় উপদ্বীপ দখল করিল। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই উভয়ের গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল; কিন্তু বাহ্যতঃ উভয়েই সদ্ভাব বজায় রাখিতে ব্যস্ত। তাই দুই জাতির মধ্যে একটা পরস্পরে বোঝাপড়াও হইল। শ্যামীয়গণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল; কিন্তু কে তাহাদের আপত্তি শুনে? বরং ইহার পরও ফরাসীরা আরও দুই খানা জাহাজ পাঠাইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের আপত্তির ফলে, ফরাসীরা আর বেশী জাহাজ পাঠাইতে ভরসা পাইল না।

যে দুইখানা জাহাজ পাঠান হইয়াছিল, মেনাম নদী বাহিয়া, তাহারা ব্যাঙ্ককের দিকে চলিতে লাগিল। ব্যাঙ্ককের অল্প নীচে পাকনাম (Paknam) নামক স্থানে শ্যামীয় সৈন্তরা, ইহার

প্রতিবাদ স্বরূপ, বন্দুকের দুইটি ফাঁকা আওয়াজ করিল। ইহার পর ফরাসীরা শ্যামীয় সৈন্যদিগের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। শ্যামীয়রাও গুলি ছাড়িল। এই পাকনামের যুদ্ধে ফরাসী পক্ষে, তিন হত ও তিন আহত হইল, এবং শ্যামীয়দের পক্ষে ১৫ জন হত ও ২০ জন আহত হইল। ২০ মিনিট স্থায়ী এই যুদ্ধের পর, ফরাসী রণতরী ব্যাঙ্ককের দিকে যাত্রা করিল।

ইউরোপীয় জাতি যতই অপরাধ ও অন্যায় করুক না কেন, তাহাদের গায়ে হাত তুলিবার মত ধৃষ্টতা, পাশ্চাত্য জাতিদের চোখে কমই আছে। এই গুরুতর অপরাধের দণ্ড এইবার শ্যামকে ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য ফরাসীরা তাহাদের পক্ষে ন্যায়, সর্ত্ত ও যুক্তির অনেক দোহাই দিল। কিন্তু সেই সব নিতান্তই বাজে কথা। কিন্তু আসল কথা হইল ফরাসী সবল ও শ্যামীয়গণ দুর্ব্বল *। দূরদর্শী ঈশপ বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়দের জন্যই, সিংহের মুখে বলাইয়াছিলেন, "তুই জল ঘোলা না করিয়া থাকিস্, তোর বাবা করিয়াছিল। অতএব তোকে আমি খাইবই।" বেচারা মেষশাবকের সব যুক্তিতর্ক এই যুক্তির নিকট পরাস্ত হইল।

শ্যামীয়দের ধৃষ্টতার দণ্ডস্বরূপ ফরাসীরা নূতন এক দাবীপত্র পাঠাইল: (১) মেকঙ নদীর পূব পারের সমস্ত দেশ ফরাসীদের

---

* But really it was no question of technicalities. It was a case of a strong power against a weak one; a case of 'might is right' if ever there was such.
J. G. D. Campbell—Siam xxth century. p. 304.

হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে; (২) এই যুদ্ধের হতাহতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জরিমানা দিতে হইবে এবং (৩) এই যুদ্ধের ও গ্রসগুরিণের হত্যার জন্ম যাহারা দায়ী, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে। এই সব দাবীর জবাবের জন্ম ফরাসীরা মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময় দিল।

শ্যামীয়গণ বুঝিল যে, ফরাসীদের পাশব বলের নিকট আত্মরক্ষা করার কোন উপায়ই নাই। ইংরাজও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে রাজী নয়। তাই শ্যামীয়গণ সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইল। প্রথম সর্ত্তে পূরাপূরি রাজী হওয়ার অর্থ অনেকটা রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া; তাই সেটাতে সম্পূর্ণ রাজী না হইয়া শেষের দুই সর্ত্তে তাহারা সম্মত হইল। প্রথম সর্ত্ত সম্বন্ধে তাহারা বলিল যে, কাম্বোডিয়া ও আনামের অধিকার ও দাবী কতটা, তাহা তাহারা ভাল জানে না, তবুও কোন প্রকারে সন্ধি করার জন্ম তাহারা ১৮ অক্ষাংশের দক্ষিণে মেকঙ্গ নদীর পূব পারের অংশ ফরাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে। কিন্তু ফরাসীরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না।

ইংরাজরা ফরাসীর এই দাবী শুনিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল যে, ফরাসীরা যদি মেকঙ্গের সমস্ত পূব পার দখল করে, তবে ইংরাজ ও ফরাসী রাজ্য শ্যামের উত্তরে যাইয়া, কোলাকোলী করিবে এবং লুয়াঙ্গ প্রবাঙ্গ (Luang-Probang) প্রভৃতি প্রদেশও ফরাসীর দখলে যাইবে। ইংরাজরা ইহাতে একটু আপত্তি করিল। কিন্তু তখন ইংরাজরা ফরাসীদের

সহিত ভাব করিতে খুবই ব্যস্ত, তাই বিশেষ জোর করিয়া কিছু বলিল না। ফরাসী সরকার জানাইল যে, যে-সব দাবী করা হইয়াছে, তাহা আদায় না করিলে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইবে এবং ইংরাজ ও ফরাসী মুল্লুকের মধ্যে শ্যামকে নিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রভাবে (buffer state) বজায় রাখা তাহাদেরও সঙ্কল্প। নিজেদের গরজে যতটা দরকার, ততটা করিয়া ইংরাজরা শ্যামীয়দিগকে উপদেশ দিতে লাগিল যে সর্ব্বতোভাবে ফরাসীদের দাবী মানিয়া লওয়াই শ্যামের পক্ষে একমাত্র পথ। বাধ্য হইয়া শ্যাম ফরাসীর সর্ত্ত মানিয়া লইল। এই সন্ধিসর্ত্ত কার্য্যে পরিণত হওয়ার জামিন স্বরূপ ফরাসীরা দাবী করিল যে, চাণ্টাবুন (Chantaboon) ফরাসীরা দখল করিবে এবং মেকঙ্গের পশ্চিম তীরে ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে ও বাটামবঙ্গ ও আঙ্গকোর (Battambang and Aungkor) প্রদেশদ্বয়ে শ্যামীয়রা কোন সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবে না। শ্যাম ইহাও মানিতে বাধ্য হইল।

ইহার পর পাকা সন্ধি সর্ত্তের আলোচনা চলিতে লাগিল। ফরাসীরা আর এক দফা নূতন দাবী করিল। শেষ পর্য্যন্ত মেকঙ্গ নদীর পূব তীরের সমস্ত অংশটা ছাড়িয়া দিয়া এবং পশ্চিম তীরেও কোন কোন বিষয়ে নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া শ্যাম সন্ধি ক্রয় করিল (১৮৯৬)। লুয়াঙ্গ প্রবাঙ্গ (Luang Probang) প্রদেশ ফরাসীরা দখল করিল, যদিও ফরাসীরা পূর্ব্বে বহুবার স্বীকার করিয়াছে যে, এই প্রদেশের উপর তাহাদের কোন দাবী নাই।

শ্যাম সন্ধিসর্ত্তের সমস্ত চুক্তিই একে একে পূরণ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে, ফরাসীরা চাণ্টাবুন নামক বন্দরটি দখল করে। সন্ধি স্থাপিত হওয়ার ৬।৭ বৎসর পরও ফরাসীরা এই বন্দরটি শ্যামীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই। অবশেষে অবশ্য, ইহা শ্যামীয়দের হাতে সমর্পিত হইয়াছে।

ইংরাজগণ উচ্চগলায় ঘোষণা করে, এই ব্যাপারে শ্যামীয়-গণের পক্ষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, ফরাসীরা অন্যায়ভাবে শ্যামের রাজ্য হরণ করিয়াছে এবং ইংরাজরা তাহাতে বাধা দেয় নাই সত্য, কিন্তু ইংরাজরা না থাকিলে ফরাসীরা সমস্ত শ্যামই গ্রাস করিত। সেই জন্যই শ্যামীয়দের পক্ষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই ভাবে কৃতজ্ঞতা দাবী করার চেয়ে বরং বলা ভাল যে, ফরাসীদের মত ইংরাজেরাও যে তাহার কতকটা অংশ গ্রাস করে নাই, সেই জন্যই শ্যামের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জাতির সহিত শ্যামের কুটুম্বিতা এই পর্য্যন্তই। বিংশ শতাব্দীতেও শ্যাম তাহাদের বন্ধুত্বের দাবী কিছু পূরণ করিয়াছে।

আধুনিক যুগ

শ্যামে এখনও কতকটা অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রচলিত—রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজা চুললঙ্করণ বিশেষ উপযুক্ত রাজা ছিলেন। ১৮৬৮ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, নানা দিকে রাজ্যের উন্নতি সাধনে মন দেন। ১৮৯১ অব্দে রাজকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য এক মন্ত্রী পরিষদ (cabinet council) প্রবর্ত্তিত করেন। বৈদেশিক, অভ্যন্তরীণ, আর্থিক ও শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগের মন্ত্রীদের লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। রাজার সহকারীভাবে এই মন্ত্রী পরিষদই রাজ্য শাসন করে। রাজার মনোনীত সভ্য ও মন্ত্রীদের লইয়া ৪০ জনের এক ব্যবস্থাপক সভাও প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা চুললঙ্করণ এক প্রতিনিধি-সভাও স্থাপন করেন, কিন্তু এই সভা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। তাই তিনি ইহা রহিত করিয়াছেন। রাজার মত, অনুমোদন

ও সম্মতি ব্যতীত মন্ত্রী-পরিষদ কিছুই করিতে পারে না; কাজেই রাজার হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা।

শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্যামীয় মন্ত্রীদের সহকারী ভাবে সকল বিভাগেই ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখার ব্যবস্থাও এই রাজার আমলেই আরম্ভ হয়। কোষাগার, রাজস্ব, শুল্ক, শিক্ষা, পুলিশ, জরীপ, বন-জঙ্গল এবং খনি বিভাগের ভার দেওয়া হইল ইংরাজ কর্ম্মচারীদের হাতে; ডাক ও রেল বিভাগ রহিল জার্মানদের হাতে; নৌ-সৈন্য ও পুলিশ সৈন্যের ভার পড়িল ডেনীয়দের হাতে, বিচার বিভাগে জজদের সহকারী নেওয়া হইল বেলজিয়াম হইতে। সৈন্য বিভাগের সমস্তটাই শ্যামীয়দের হাতে রহিল—কেবল সামরিক বিভালয়ের ভার দেওয়া হইল একজন ইটালিয়ানের উপর। প্রায় সব প্রাচ্য দেশেই, এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য সহকারীরাই প্রকৃত ভাবে রাজ্য শাসন করে; কিন্তু শ্যামে তাহাদের সেইরূপ কোন ক্ষমতাই ছিল না। ইহারা নিতান্তই পরামর্শদাতা এবং অনেক স্থলে বিশেষজ্ঞ কেরাণী।

শাসন-সংস্কার ব্যাপারে কয়েক জন শ্যামীয় ভদ্রলোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচার বিভাগের মন্ত্রী (Minister of Justice) প্রিন্স রবি (Prince Rabi) ইহাদের অন্যতম। অক্সফোর্ডে (Oxford) শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি দেশে আসিয়া পাশ্চাত্য প্রথায় শাসনসংস্কারের দিকে মন দেন। তাঁহার উদ্যোগেই বিচার বিভাগের সংস্কার আরম্ভ হয় এবং আইন

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী প্রিন্স ডামরঙ্গের (Prince Damrong) নামও উল্লেখযোগ্য। শ্যামীয়গণ প্রায়ই শ্রমবিমুখ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এই অপবাদ মোটেও প্রযোজ্য নয়। এক হিসাবে তাঁহাকেই নব্য শ্যামের অগ্রদূত বলা যায়। বৈদেশিক শিক্ষা বা বুদ্ধিতে তাঁহার চেয়েও উপযুক্ত লোক হয়ত আছে; কিন্তু অদম্য উৎসাহ, কর্ম্ম-প্রবণতা ও কার্য্য-কুশলতায় তাঁহার সমতুল্য লোক পাওয়া কঠিন। তৎকালীন বৈদেশিক মন্ত্রী প্রিন্স দেববংশও (Prince Devawangsa) বিশেষ উপযুক্ত লোক ছিলেন। শ্যামীয় যুবকদের মধ্যে ক্রমেই উপযুক্ত ও পরিশ্রমী লোক দেখা দিতেছে। শ্রম-বিমুখতাই শ্যামীয় চরিত্রের বিশেষ দোষ। ইহা দূর হইলে শ্যামীয়দের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্যামের উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশীদের অন্যায় দাবী ও অধিকার। তাহারা যে-সব অধিকার ভোগ করিত, তার ফলে শ্যামের সমস্ত সংস্কার-প্রয়াসই ব্যর্থ হইতেছিল। বিদেশীরা শ্যামের কোন আইন-আদালতেরই তোয়াক্কা রাখিত-না; এবং বিদেশীদের সংখ্যাও ছিল বহু। কাজেই কোন আইনই দেশে কার্য্যকরী করা যাইত না। শ্যামীয় সরকার বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষার আইন পাশ করিল, কিন্তু ইহা কার্য্যকরী করিতে পারিল না,—বিদেশীদের বিরোধিতায়। এক বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি বলিল—এই আইনে তার মুসলমান প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারে আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাই তাহারা এই আইন মান্য

করিতে পারে না। ট্রেড্ মার্ক আইনও (Trade Mark Act) বহুকাল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, কারণ বিদেশী প্রায়ই এই আইন ভঙ্গ করিত; অথচ বিদেশী জাতিগুলি কিছুতেই আইনভঙ্গকারীদিগকে শাস্তি দিয়া এই আইন মানিতে রাজী হইল না। বেঙ্ককক সহরের নানা অনাচার ও পাপ বন্ধ করার জন্য যে-সব পুলিশ-বিধি প্রণয়ণ করা হইত, তাহাও ঠিক ঐ কারণে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইত না। আফিং চালান, আফিংএর আড্ডা রক্ষা করা,জুয়ার আড্ডা রাখা—এই সব ব্যাপারে বিদেশীদের হাত ও সাহায্য ছিল অনেকটা। যদি শ্যামীয় সরকারের সহিত বিদেশী জাতিগুলি এই সব পাপ ও অনাচার বন্ধ করিতে একযোগে চেষ্টা করিত, তবে শ্যাম হইতে বহু পূর্ব্বে এই সব লোপ পাইত। বিদেশীরা বিনা বাধায় ও বিনা শাস্তিতে আফিং আমদানী ও জুয়ার আড্ডা রক্ষা করিত, এবং দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। শ্যামীয় সরকার এই সব স্থলে একেবারেই শক্তিহীন, কোন কিছু করার ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না।

অপরদিকে, বিদেশীদের সহিত অন্যায় ও অ-সমান সন্ধির ফলে, শ্যামের অর্থ-সমস্যা দিনদিন ক্রমেই জটিলতর হইতেছিল। দেশের যে-কোন উন্নতির জন্যই অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য বিধান, বিচার ও আইন সংস্কার, পুলিশের সুব্যবস্থা, সামরিক সংস্কার, নৌ-বিভাগ সংস্কার, ডাক প্রথা প্রচলন, যাতায়াতের জন্য স্থলপথ, ষ্টীমার ও রেল লাইন প্রবর্ত্তন,—ইহার

প্রত্যেক দিকেই রাজা পঞ্চম রামের দৃষ্টি ছিল এবং প্রত্যেক দিকেই অজস্র অর্থের প্রয়োজন। অথচ আয় বৃদ্ধির পথ বন্ধ। রাষ্ট্রের আয়ের দুইটী প্রধান উপায় শুল্ক ও জমির খাজনা। জমির খাজনা বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন এবং তার ফলে প্রায়ই দরিদ্র কৃষকগণ নিষ্পেষিত হয়। কিন্তু আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করা তেমন কঠিন নয়। প্রায় সব জাতিই দরকার মত এই শুল্কের হ্রাস-বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিদেশীদের সহিত সন্ধিসর্ত্তানুসারে শ্যাম তা' করিতে পারে না। ফলে হইল, কোন বিভাগেই তেমন উন্নতি সম্ভব হইল না; কিন্তু যৎসামান্য যা কিছু চেষ্টা চলিতে লাগিল, তার জন্য শ্যামীয় সরকারকে ক্রমাগতই দেনাগ্রস্ত হইতে হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহাই ছিল শ্যামের অবস্থা।

শ্যাম বুঝিল, ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে তার প্রকৃত মঙ্গল সাধন অসম্ভব। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর সমস্ত প্রাচ্যদেশেই একটা নূতন যুগের সূচনা হইল। তুরস্ক-পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া সুমাত্রা-জাভা পর্য্যন্ত এই নূতন যুগের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। শ্যামেও এই নূতন যুগ আরম্ভ হইল। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের এই সব অন্যায় দাবী অগ্রাহ্য করিবার শক্তি বা সাহস, তার তখনও হয় নাই। তাই তাহাকে উৎকোচের আশ্রয় লইতে হইল। ১৯০৭ অব্দে ফ্রান্সের সহিত শ্যামের এক নূতন সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের এসিয়াটিক প্রজারা শ্যামের আইন-আদালতের অধীন হইল; কিন্তু খাটি ফরাসীর

ব্রহ্মদেশ
চিয়াং মাই
মৌলমেন
অযুথিয়া
ব্যাংকক
কোরাট

তখনও শ্যামের আইন-আদালতের এলাকার বাহিরেই রহিল। এই সামান্য অধিকারটুকু ফিরিয়া পাওয়ার বিনিময়ে শ্যাম যা দিল, তাকে উৎকোচ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। শ্যাম রাজী হইল যে, ঐ সব ফরাসী প্রজারা শ্যামীয় প্রজার সমস্ত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে এবং ১৯০৭ অব্দের পূর্ব্বে যাহারা ফরাসী প্রজা বলিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কোন মামলা ফরাসী দূত ইচ্ছা করিলে শ্যামীয় আইন-আদালত হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় কিছু উৎকোচ ফ্রান্স আদায় করিল—শ্যাম ও ফরাসী হিন্দু চীনের সীমা নির্দ্দেশের অছিলায়, বাট্টামবাঙ্গ (**Battambang**), সিম-রিপ (Siem-Reap)ও সিছোফোন (Sisophon) নামক প্রদেশত্রয় ফ্রান্স শ্যামের নিকট আদায় করিল।

ইহার ২ বৎসর পর ১৯০৯ অব্দে ইংল্যাণ্ডও শ্যামের সহিত এমনি এক নূতন সন্ধি করিল। এই সন্ধিসর্ত্তানুসারে সমস্ত ব্রিটিশ প্রজাই শ্যামীয় আইন-আদালতের অধীন হইল। কিন্তু ঠিক ফ্রান্সের মতই ইংল্যাণ্ডও এই অধিকার রাখিল যে, দরকার মত কোন কোন মোকর্দ্দমায় যেন তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই সামান্য সুবিধাটুকুর বিনিময়ে ইংল্যাণ্ড বিস্তৃত ভূখণ্ড শ্যামের নিকট হইতে আদায় করিল—শ্যামের দক্ষিণে কেলাণ্টান, (Kelantan) ত্রিঙ্গানু (Tringanu), কেদাহ (Kedah) ও পেরিলস্ (Perils) নামক প্রদেশ চতুষ্টয় ইংল্যাণ্ডের হাতে সমর্পণ করা হইল। বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে শ্যাম কোন অধিকার পাইল না।

এত চেষ্টা করিয়াও শ্যাম প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে পারিল না। পাশ্চাত্য রাজনীতির বেড়াজাল ভেদ করিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। ক্রমে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৯১৪ অব্দে ইউরোপে মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রপক্ষের শক্তিরা জগৎময় বড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য এবং ক্ষুদ্র জাতি-সমূহের স্বাধীনতার জন্যই তাহারা এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এই সব মিথ্যা আশা ও প্রচারের ফলেই অনেক দেশ তাহাদের সহিত যোগ দেয়। দেখাদেখি শ্যামও মিত্রপক্ষে যোগ দিল। শ্যামের এক দিকে ফরাসী এবং অপর দিকে ইংরাজ, এই অবস্থায় মিত্র-পক্ষকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন তার অন্য কোন উপায় নাই। শ্যাম এক দল সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইল। উড়োজাহাজ-চালক বহু শ্যামীয় যুবকও যুদ্ধে গেল। সবই হইল—যুদ্ধে জয়ও হইল। কিন্তু শ্যামের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল না; ভার্সেল সন্ধিসভায় শ্যাম পূর্ণ স্বাধিকার ও আত্মকর্ত্তৃত্ব দাবী করিল। যে-সব আশা-ভরসা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, সে সবও সে আওড়াইল। কিন্তু কেবল প্রেসিডেণ্ট উইলসন ভিন্ন আর কেহই তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। উইলসন বলিলেন—হাঁ, শ্যামের দাবী ন্যায়সঙ্গত, আমেরিকা তার দাবী স্বীকার করিয়া তার সহিত নূতন সন্ধি করিতে প্রস্তুত।

১৯২০ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শ্যামের সহিত নূতন সন্ধি করিল। সকল প্রকার অ-সমান সন্ধি রহিত করিয়া

যুক্তরাষ্ট্র শ্যামের সহিত 'সমান সমান' ভাবে এক সন্ধি করিল। এই সন্ধি অনুসারে আমেরিকা extra-territorial rights প্রত্যাহার করিল; কেবল একটা সর্ত্ত রহিল যে, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্য-দূত বিশেষ দরকার মনে করিলে শ্যামীয় আদালৎ হইতে কোন আমেরিকান অভিযুক্তের বিচার নিজের দপ্তরে আনিতে পারিবে। ইহার পর অন্যান্য জাতি দেখিল, তাহাদেরও একটা কিছু করা দরকার। শ্যামের বৈদেশিক মন্ত্রী কুমার ত্রয়দেশ প্রবন্ধ (Prince Traides Probandha) ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিত এই বিষয় আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কয়েকমাস ব্যাপী দরাদরির পর, ঐ সব জাতিও নূতন সন্ধি করিতে রাজী হইল। ১০ বৎসর পর শ্যাম তাহার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাইল, একটা স্বাধীনরাষ্ট্র বলিয়া সে স্বীকৃত হইল; extra-territorial rights ১০ বৎসর পর শ্যাম হইতে লোপ পাইতে চলিল। অবশ্য এখন পর্য্যন্তও শ্যাম এই অন্যায়ের হাত হইতে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পায় নাই। যতই সন্ধি সর্ত্ত থাকুক না কেন, বিদেশী কখনও স্বেচ্ছায় ঐ সব অধিকার ছাড়িতে রাজী নয়; তাই সন্ধি সর্ত্তের ফাঁকে যতদিন সম্ভব বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবেই। এই সব সন্ধি ১৯২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যেই লিখিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। শ্যামও বর্ত্তমান যুগোপ-যোগী নূতন আইন প্রবর্ত্তিত করিতেছে এবং আশা আছে শীঘ্রই নূতন আইনের সব ধারাগুলি প্রবর্ত্তিত হইলে বিদেশীদের সব অধিকারই লোপ পাইবে।

১৯২৫ খৃঃ অব্দে রাজা ৬ষ্ঠরাম দেহ ত্যাগ করেন। নব্য শ্যামের ইতিহাসে রাজা ষষ্ঠরামের স্থান অতি উচ্চে। এক হিসাবে রাজা চুললঙ্করণ ও রাজা ষষ্ঠরামই নব্য শ্যামকে গঠন করিয়াছেন। শ্যাম যে আজ আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষার পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, তাহা এই দুইজনের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে। শিক্ষায়, রাষ্ট্রে, সামরিক ও ব্যবস্থাপক ব্যবস্থায় সব বিষয়েই তাঁহাদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে শ্যাম আজ বিশ্ব-দরবারে স্থান পাইয়াছে। বিশেষভাবে রাজা ষষ্ঠরামের চেষ্টাতেই শ্যাম পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বাধীন সত্ত্বা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাজা ষষ্ঠ রামের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা রাজা প্রজাধিপক রাজা হন। রাজা ষষ্ঠ রামের আমলের প্রথম হইতেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হইতেছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষ দিক দিয়া রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। রাজা প্রজাধিপক এই অবস্থা দূর করার জন্য রাজ্যের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নূতন ঋণ করা বা নূতন কর বসানোর পথে না যাইয়া, প্রতি বিভাগে ব্যয় কমাইবার জন্য অত্যন্ত জরুরী আদেশ জারি করিলেন। তাঁহার নিজের ভাতাও ৯০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ মুদ্রা করিয়া দিলেন। এই উপায়ে আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ কম হইল এবং প্রতি বৎসর রাজস্ব হইতে কিছু বাঁচিতে লাগিল। অপর দিকে আয়ও কিছু বৃদ্ধি পাইল, কারণ নূতন সন্ধি অনুসারে, শ্যামে বাণিজ্য-শুল্কের

হার কিছু বৃদ্ধি করার ক্ষমতা তিনি কার্য্যে পরিণত করিলেন। শ্যামের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির দিকেও তিনি দৃষ্টি দিতেছেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে আজ শ্যাম দিন দিন উন্নতির পথে যাইতেছে।

শাসনযন্ত্রিক, (constitutional) আর্থিক, ব্যবস্থাপক, বিচার প্রভৃতি সবদিকেই রাজা প্রজাধিপকের দৃষ্টি আছে। ভূতপূর্ব্ব রাজার আমলে যে মন্ত্রীসভা ছিল, নানা কারণে তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। প্রজাধিপক তাঁহাদের পদচ্যুত করিয়া নূতন পাঁচ জন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা আছে, শ্যামে নির্ব্বাচনমূলক প্রতিনিধি-সভা স্থাপন করেন; কিন্তু এত হঠাৎ সেটা করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, বর্ত্তমানে তাঁহার মনোনীত কয়েকজন সভ্য লইয়া তিনি এক পরামর্শ-সভা স্থাপন করিয়াছেন। ষষ্ঠ রামের সময়ই বর্ত্তমানোপযোগী নূতন আইন প্রণয়ণের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটি তাহাদের কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বোধ হয় ২।১ বৎসরের মধ্যেই তাহাদের কাজ শেষ হইবে। এই আইন প্রণয়ণ শেষ হইলে, শ্যাম হইতে Extra-territorial rights সম্পূর্ণ রহিত হইবে।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী বৃত্তি পাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভের জন্য দলে দলে ছাত্র বিদেশে যাইতেছে। আধুনিক শিল্প, কল-কারখানা ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। এমন কি রাজকুমাররা পর্য্যন্ত

নানা দেশে যাইয়া নূতন নূতন বিদ্যা আহরণ করিতে লাগিলেন। রাজভ্রাতা কুমার হন্তবুরি (Prince Hantaburi) কয়েক বৎসর হয় ইউরোপে গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ইউরোপের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা। বর্ত্তমান রাজার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে কুমার হন্তবুরি একবার ভারতবর্ষে আসিয়া সমবায়-সমিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। রেল লাইনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য কুমার হন্তবুরি একবার সিঙ্গাপুরেও গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত এক রেল লাইন আছে। শ্যামের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও চলিতেছে। প্রত্যেক পুরুষকেই দুইবৎসর করিয়া সামরিক বিভাগে কাজ করিতে হয়। নৌ-বাহিনী গঠন করার চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রা-রুয়াঙ্গ নামে একখানা ডেষ্ট্রয়ার (destroyer) রণতরী কয়েক বৎসর হয় ইংল্যাণ্ড হইতে ক্রয় করা হইয়াছে—এ সময় হইতেই শ্যামের আধুনিক নৌ-বাহিনীর আরম্ভ। বর্ত্তমানে সমস্ত রাজস্বের চতুর্থাংশ সামরিক উদ্দেশে ব্যয় হয়। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা খুব বয়স্কাউটের অনুরক্ত ছিলেন। এরোপ্লেনও শ্যামে অপরিচিত নয়। যুদ্ধের সময়ও মিত্র পক্ষের সাহায্যের জন্য শ্যাম হইতে একটা বায়বীয় বাহিনী (aviation corps) পাঠানো হইয়ছিল। এখন শ্যামে বায়বীয় ডাকও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আজ সব রকমেই শ্যাম উন্নতির মুখে চলিয়াছে। প্রাচ্যের এই ক্ষুদ্র দেশটি আজ পাশ্চাত্যের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইতেছে।

জাগ্রত পারস্য

পুরাতন কথা
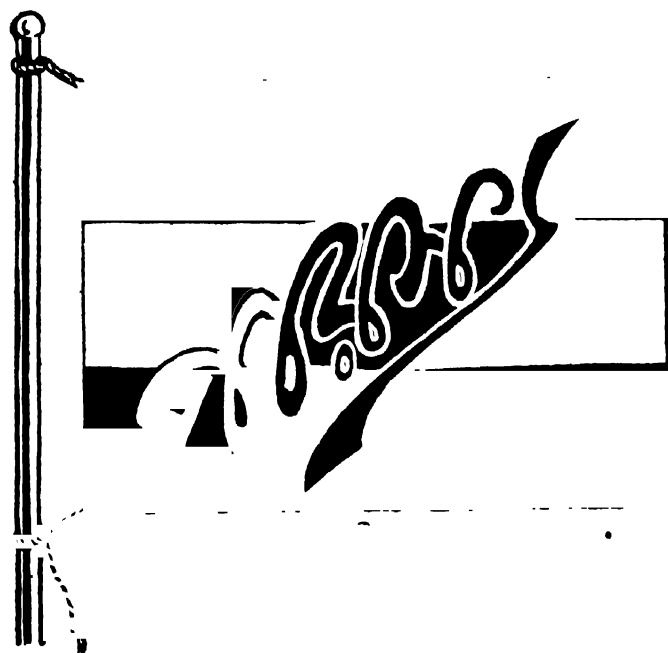
আমরা পারস্য সম্বন্ধে ঠিক ততটুকুই জানি, যতটুকু বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রীস-রোমের ইতিহাসে ও আলেকজেন্দারের ভারত আক্রমণের বিবরণে পাই। বর্ত্তমান ও মধ্যযুগের পারস্য সম্বন্ধে কোন খবরই আমরা রাখি না। অথচ, জাতি হিসাবে (ethnologically) ভারতীয় ও পারসিক আর্য্যগণ খুবই ঘনিষ্ঠ; সভ্যতার ধারা হিসাবে (on cultural basis) অগ্নি-উপাসক পারসিকগণ বেদ-পন্থী আর্য্যদের সহোদর; তারপর ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে পারস্য ভারতের অতি নিকট প্রতিবেশী। অপর দিকে, ভারতের মুসলমান সভ্যতা ও মধ্য যুগের পারসিক সভ্যতার সহিতও সম্পর্ক যথেষ্ট। অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞতা,

বোধ হয়, জগতের আর কোথাও দেখা যাইবে না। আমাদের দেশে ইতিহাস আলোচনা নিতান্তই পরীক্ষা পাশের জন্য—তদ-তিরিক্ত যদিইবা কেহ ইতিহাস পড়েন, তবে তাহাও, পাশ্চাত্য দেশের; এশিয়ার কোন দেশের যে কোন ইতিহাস থাকিতে পারে, সেই ধারণাই আমাদের নাই। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারে না। আগামী যুগে যদি এসিয়াতে কোন বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িতে হয়, তবে বাবিরুষ (Babylon) আসুর (আসিরিয়া,) ফিনিসীয়, ইরাণী, পার্থিয়, চৈনিক, ভারতীয় প্রভৃতি বিস্মৃত-প্রায় প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। এই সবকে বাদ দিয়া যে সভ্যতা এসিয়াতে গড়িয়া উঠিবে, তাহাকে এশিয়ার সভ্যতা না বলিয়া, জীর্ণ ইউরোপীয় সভ্যতার নকল বলাই সঙ্গত হইবে। অথচ বহু শিক্ষিত লোক এই সব প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্বের কথাও হয়ত অবগত নয়। আজ ব্রহ্মদেশ ভারতের অঙ্গ; ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশের ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোকের মধ্যে বোধ হয় ২।৪ জনের বেশী এই সব দেশের ইতিহাস পাঠ করেন নাই। যা'ক্, এখন পারস্যের কথা বলি।

বর্ত্তমান পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাসই আমাদের আলোচ্য, কিন্তু প্রথমে প্রাচীন পারস্য সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অতি প্রাচীনকালে পারস্য ও বাবিলন এক শাসনের অধীন ছিল। খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরে মিডগণ (Medes)

বাবিলন জয় করেন। এই মিডগণ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসী এবং আর্য্য ইরাণী বংশেরই এক শাখা। খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে পারস্যে স্বতন্ত্র মিডিয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রথম রাজা ডিওসেছ (Deioces) একবাটানাতে (Ecbatana) রাজধানী স্থাপন করেন। চারিজন রাজার পর, খাঁটি ইরাণী একিমিনিয় বংশ (Achaemenian dynasty) পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করে। এই বংশের প্রথম রাজা সাইরাস (Cyrus); পশ্চিমে লিডিয়া, সমুদ্র-কূলবর্ত্তী গ্রীক উপনিবেশ সমূহ, ফিনিশীয় নগরসমূহ, বাবিলন—তিনি জয় করেন। উত্তর পূর্ব্বের কোন এক বর্ব্বর জাতির (বোধ হয় শক জাতি) সহিত যুদ্ধে তিনি হত হন। তিনি একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫৪৭ অব্দ হইতে ৫৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

এই বংশের তৃতীয় রাজ দেরিয়াস (Darius I) অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্বে তাহার মত এতবড় বিস্তৃত রাজ্যের উপর কেহই রাজত্ব করেন নাই। পূর্ব্বে সিন্ধুনদের তীর হইতে পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত, উত্তরে হিন্দুকুশ ও আর্ম্মোনিয়া হইতে আরব ও পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকার মিশর, নুবিয়া (Nubia), লিবিয় মরুভূমি (Lybian desert) তাঁহার অধীন ছিল এবং ইউরোপের বর্ত্তমান বল্কান রাজ্যের দানুব নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার শাসন ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

ইউরোপে বল্কান রাজ্যসমূহ তখন দুর্দ্ধর্ষ শকদের অধীন। শক-অভিযানে তাঁহার এত সৈন্যক্ষয় হইল যে, সাম্রাজ্যের সামরিক ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব হইল। তারপরই তিনি গ্রীস বিজয়ে যান। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ক্ষয়ার্ষও (Xerses) গ্রীস-বিজয়ের চেষ্টা করেন। মারাথন, থার্মপলি, সালামিশ প্রভৃতি যুদ্ধে পারসীকগণ গ্রীকদের নিকট পরাজিত হয়। এই সব পরাজয়ের ফলে এবং কতকটা গৃহ-বিবাদের ফলে পারসীক সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই বংশের অষ্টম রাজা দ্বিতীয় দেরিয়াস (Darius II) তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার রাজত্বে এথেন্স পারসিকদের নিকট পরাজিত হয় এবং এথেন্সে পারসিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আর্ত্তক্ষত্র (Artaxerxes II) অতি অকর্ম্মণ্য রাজা ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ১০ম রাজা তৃতীয় আর্ত্তক্ষত্র আবার সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। আলেকজেন্দারের পিতা মেসিডেনরাজ ফিলিপ, তাঁহার সমসাময়িক। তিনি বুঝিলেন এই নূতন শক্তিকে বেশী বাড়িতে দিলে পারস্যের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। ফিলিপ যখন সম্মিলিত গ্রীক-বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত হইয়া পারস্য-অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন আর্ত্তক্ষত্র তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু পারস্যের দুর্ভাগ্য, এই সময় হঠাৎ তিনি গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। কিছুদিন পরই ফিলিপও গুপ্ত ঘাতকের হাতে মারা যান।

কিন্তু ফিলিপের মৃত্যুতে, পারস্থের অদৃষ্ট মোটেও প্রসন্ন হইল না। আর্ত্তক্ষত্রের মৃত্যুর পর পারস্থের গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হয় এবং কিছুকাল পরে তৃতীয় দেরিয়াস রাজা হন—কিন্তু তিনি একটি অপদার্থ রাজা ছিলেন। অপর দিকে, ফিলিপের মৃত্যুর পর, তাঁহার চেয়ে উপযুক্ততর লোকের হাতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অর্পিত হইল; পারস্থ-অভিযানের গ্রীক-বাহিনীর নেতা আলেকজান্দার না হইয়া ফিলিপ হইলে, হয়ত পারস্থ বিজয় এত সহজ হইত না। গৃহবিবাদ-রত পারসিক সাম্রাজ্য আলেকজান্দার-চালিত গ্রীক বাহিনীর সম্মুখে তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িল। পারসিক আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া, মৃত পারসিক রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, সুশা (Susa) ও বাবিলনে নিজের রাজধানী স্থাপন করিয়া, সর্ব্বতোভাবেই তিনি পারসিক হইতে চাহিলেন। কিন্তু পরাজয় ও পরাধীনতার জ্বালা পারসিকগণ একটুও ভুলিল না; অপর দিকে তাঁহার গ্রীক অনুচরগণও তাহার এই প্রাচ্যভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইল। এমন সময়, অতিরিক্ত মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজেন্দারের জীবিত কালেই প্রাচ্য-ইরাণ, ভারত, বাহ্লিক (Bactria), এরিয়া (Aria), সগডিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্রোহের ভাব ধূমায়িত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরই বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহ ও তাঁহার সেনানীদের আত্মকলহে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। খাস পারস্থ গ্রীকদের অধীনেই রহিল। ৭৫ বৎসরের পরাধীনতার

পর পারস্যে দেশীয় পার্থিয় (Parthian) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল—খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে আর্সাসেছ (Arsaces) পার্থিয়ার রাজা হন এবং ক্রমে এই বংশ পুরাতন পারসিক-সাম্রাজ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন। পার্থিয়া পারস্যের একটা প্রদেশ।

বিদ্যালয়-পাঠ্য রোমক ইতিহাসে পার্থিয় যুদ্ধের (Parthian war) বিবরণ পড়ানো হয়। তাই এই নাম অনেকের নিকট হয়ত পরিচিত—কিন্তু বাস্তবিক অনেকেই জানে না, এই পার্থিয়ার ঠিক খাঁটি ভৌগোলিক সংস্থান কোথায় বা এই পার্থিয়ানই বা কাহারা। এমনই আমাদের শিক্ষার বিড়ম্বনা !

এই বংশের রাজা প্রথম মিথ্রডেটশ বিশেষভাবে পার্থিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন। খৃঃ পূঃ ১৪০ অব্দে তিনি বাবিলন ও মেসোপোটেনিয়া আক্রমণ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বিদেশী গ্রীক-শাসন হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। গ্রীকরাজ ডিমিট্রিয়া তাঁহার নিকট বন্দী হইলেন। তিনি বন্দী গ্রীকরাজাকে নিজের অধীনে সামন্ত রাজা করিয়া, তাঁহার সহিত নিজের মেয়ের বিবাহ দেন। এইভাবে এসিয়ায় গ্রীক শক্তি তিনি ধ্বংস করেন। খৃঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে তিনি মারা যান। তিনি যেমন শক্তিশালী, তেমনি প্রজারঞ্জক ও দয়ালু রাজা ছিলেন। শক আক্রমণে পার্থিয় সাম্রাজ্য প্রায় নষ্ট হইবার পথে চলিতেছিল ; কিন্তু এমন সময়ে বিখ্যাত দ্বিতীয় মিথ্রডেট্স (Mithradates the Great) রাজা হন। তিনি শকদের পরাজিত করিয়া, পশ্চিমে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত রাজ্য

বিস্তৃত করেন। তিনি সিরিয়ার গ্রীক-রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন এবং এসিয়া মাইনরের রোমক সেনাপতি সাল্লার (Sulla) সহিত সন্ধি করেন। পার্থিয়দের সহিত রোমকদের এই প্রথম পরিচয়। দুই বিজয়ী রাজ্য-লিপ্সু শক্তির পরিচয় প্রায়ই শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রের মুখে হয়। এইখানেও তাই হইল।

মিথ্রডেট্সের মৃত্যুর পর রোমীয় সেনাপতি ক্রেসাস বিনাকারণে ও অতর্কিত ভাবে পার্থিয় রাজ্য আক্রমণ করে। ক্রেসাস (Crassus) আশা করিয়াছিলেন, অতি সহজেই কতকটা রাজ্য জয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ঠিক উল্টা ফল হইল। পার্থিয় সৈন্যের নিকট উপর্য্যুপরি পরাজিত হইয়া ও সমস্ত সৈন্য হারাইয়া ক্রেসাস্ কোন রকমে প্রাণ লইয়া পালাইয়া আর্ম্মেনিয়াতে আশ্রয় লইলেন (খঃ পূঃ ৫৩ অব্দ)। পার্থিয় সৈন্য রোমক রাজ্য আক্রমণ করিল—সিরিয়া, পেলেষ্টাইন প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা অত্যাচারী রোমীয় শাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া, পার্থিয়দের সাহায্য করিল।

রোমকগণ ক্রমাগতই পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে বিখ্যাত রোমক সেনাপতি এণ্টনি (Antony) রোমক সৈন্যের ভার লন। কিন্তু তিনিও বিশেষ ভাবে পরাজিত হন।

ইহার পর পার্থিয় রাজ্য গৃহ-বিবাদে ও বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বহু বৎসর পর আবার রোমক সম্রাট ট্রজান (Trojan) পার্থিয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন ১১৪ অব্দে)। ট্রজান প্রথমতঃ সর্ব্বত্রই জয়ী হইলেন ; কিন্তু

তিনি আট্র বা হাট্র দুর্গ দখল করিতে পারেন নাই। এই চেষ্টায় তাঁহার বহু সৈন্য মারা যায়। এই দুর্গ অবরোধের সময় তিনি নিজেও মারা যান এবং পরবর্তী সম্রাট হেড্রিয়ান দেখিলেন, পার্থিয়ার সহিত সন্ধি করাই সঙ্গত। দুই রাজ্যের সন্ধি হইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এইবার পার্থিয়া পরাজিত হয় (১৬৬ অব্দ)—ফলে মেসোপটেমিয়া রোমের হাতে গেল। পার্থিয় শক্তি এখন হইতে ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিল। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা রোমীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। সম্রাট সেভেরাস (Severus) বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া আট্রায় পার্থিয় ও বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হন। পরাজিত ও অপমানিত হইয়া সম্রাট পলাইলেন। রোমকগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া অবশেষে ৫ কোটি মুদ্রা দিয়া সন্ধি করিল। কিন্তু এই জয়েও পার্থিয় শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল না, খাস পারস্যে এক নূতন শক্তির উদয় হইল। পাবক ও তৎপুত্র আত্রশীর সাসানী বংশের (Sasanian dynasty) প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মিড ও পার্থিয়গণও ইরাণীবংশীয় এবং অগ্নি-উপাসক ছিল। তাহাদের মধ্যে অনার্য্যোচিত একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। নিজের বোন, কন্যা, এমন কি মাকেও বিবাহ করিতে তাহাদের সঙ্কোচ ছিল না। রাজা পঞ্চম ফ্রাটেশ তাঁহার মার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন এবং মাতাকে বিবাহ করেন। এই জঘন্য প্রথা বোধ হয় আর কোথায়ও ছিল না।

মিশরেও ভগ্নিকে বিবাহ করার প্রথা ছিল, কিন্তু মা বা কন্যাকে বিবাহ করার প্রথা ছিল না। ২১১।২১২ অব্দে আর্দ্রশীর রাজা হন। তাঁহার পুত্র সাপুর (Shapur) সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রোমক সম্রাট ভেলেরিয়ানকে (Valerian) বন্দী করেন। বন্দী দশাতেই বহু বৎসর পরে এই সম্রাট মারা যান—রোমকগণ শত চেষ্টা করিয়াও সম্রাটকে উদ্ধার করিতে পারে নাই। এই সময় হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত পারস্যের সহিত রোমের বিবাদ চলিয়াছে। পারস্যের গৃহ-বিবাদ সত্ত্বেও রোম এই সব যুদ্ধে মোটেও সুবিধা করিতে পারে নাই। ৩১০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় সাপুর মাতৃক্রোড়ে থাকিতেই রাজা হন। ইনি একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি অসভ্য আরব দস্যুদের বারে বারে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা রোমকযুদ্ধ। এই সময় রোমের সম্রাট খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন; তাই পারস্যের খৃষ্টানগণ গোপনে রোমকদের সহানুভূতি করিত। সাপুর খ্রীষ্টানদের এই স্বদেশদ্রোহিতার সমুচিত দণ্ড দিতে কসুর করেন নাই। রোমকদের সহিত যুদ্ধে পারসীকগণ জয়ী হইল—রোমক সম্রাট জুলিয়ান (Julian) টাইগ্রীস নদীর তীরে যুদ্ধে হত হন। রোমকগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া ও কয়েকটি প্রদেশ পারসিকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিল। কিন্তু ছোটখাট যুদ্ধ লাগিয়াই রহিল;—যখন যে সুবিধা পাইত, তখনই সে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিত। এই সব যুদ্ধের ফল প্রায়ই অনিশ্চিত

থাকিত। কিন্তু ৫০৩ অব্দে দুই জাতির মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা ৫৩১ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে দুই জাতিই এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, মুসলমানদের পক্ষে পারসিক ও রোমক সাম্রাজ্য জয় করা অতি সহজ হইল। রোমকযুদ্ধ ভিন্ন, পারসিকগণ উত্তর পূবে হুণদের আক্রমণেও বিব্রত ছিল। ৫৩২ অব্দে রোমকগণ যে সন্ধি করিল, তাহাতে তাহারা বাৎসরিক কর ও অন্য কতকগুলি সুবিধা পারসিকদের দিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ৫৪০ অব্দে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পারসিক-রাজ খস্রু রোমক রাজ্য জয় ও লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রোমকদের সহিত যুদ্ধ ক্রমাগতই চলিতে লাগিল—ঐসব যুদ্ধে রোমকগণ প্রায়ই পরাজিত হইতেছিল। কিন্তু পারসিক সাম্রাজ্যের শক্তি দিন দিনই ক্ষয় হইতে লাগিল। এই যুদ্ধের ফলে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য ও পারসিক সাম্রাজ্য উভয়ই পঙ্গু হইয়া পড়িল। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক-রাজ দ্বিতীয় খস্রু জেরুজালাম দখল করিয়া যিশুর আদিম ক্রসখানা নিজ রাজধানী টেসিফোনে (Ctesiphon) লইয়া আসেন। এশিয়া মাইনর ও মিশর জয় করিয়া যখন তিনি জয়ের উচ্চতম শিখরে উঠিলেন, ঠিক সেই সময় হইতেই তাঁহার পরাজয় আরম্ভ হইল। রোমক সেনাপতি পারসিকদের পবিত্র তীর্থ গাঞ্জাক (Ganjak) মন্দির ধ্বংস করে। ইহার পর পারসিক সৈন্যদের তাড়া করিয়া, তাহারা পারসিক রাজধানী আক্রমণ করে (৬২৮ অব্দ)। পারসিকগণ অত্যাচারে ও পরাজয়ে উন্মত্ত হইয়া খস্রুকে হত্যা করিয়া নূতন

রাজা নির্ব্বাচন করেন। রাজ্যে গৃহবিবাদ, দ্বারে বিজয়ী রোমক সৈন্য—তার উপর সমস্ত দেশে এক মহামারী আরম্ভ হইল। ইহার ৬ মাস মধ্যেই পারসিক রাজা মারা যান। ৭ বৎসরের শিশু তৃতীয় আদ্রশীর এই অবস্থায় রাজা হন। বিদ্রোহ ও গৃহ বিবাদে পারসিকগণ আসন্ন বিপদ খেয়াল করিল না। রোমকগণ এই গৃহ-বিবাদে আরও ইন্ধন দিতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব রাজা খস্রুর সেনাপতি (৬৩০ অব্দ) রোমকদের প্ররোচনায় শিশু রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন—দুই মাসের মধ্যে তিনিও এই ভাবে হত হন। খস্রুর কন্যা বোরান (Boran) রাণী হইলেন। আবার রোমকদের সহিত সন্ধি হইল—এই সন্ধিতে পূর্ব্বের ব্যবস্থাই বহাল রহিল। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ফিরিয়া আসিল না—বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লোক সিংহাসন দাবী করিয়া রাজা উপাধি লইল। রাজধানীতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের রাজত্ব চলিতে লাগিল। শেষ রাজা তৃতীয় ইয়াজগর্ড (Yazdgord III) শিশু অবস্থায়ই ৬৩৩ অব্দে রাজা হন। কিন্তু রাষ্ট্রের ভার রহিল বিখ্যাত সেনাপতি রোস্তামের উপর।

রোস্তাম রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মন দিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সময় পাইলেন না। এই সময় আরবে নূতন শক্তির উদয় হইয়াছে। আরবগণ আসিয়া পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। খলিফা ওমর পারস্য বিজয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন; পারসিকগণ প্রথমে বোয়াবেব (Bowaib) যুদ্ধে পরাজিত হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় কাদিশিয়াতে (:Kadisia)।

রোস্তাম এই যুদ্ধে মারা যান। সেনাপতির মৃত্যুতে রাজা পলায়ন করিলেন। নেহাভেণ্ডের তৃতীয় যুদ্ধে সব আশা শেষ হইল (৬৪২)। রাজা ইয়াজগর্ড মার্ভে যাইয়া আশ্রয় লন। সেখানে তাঁহার অধীন শাসনকর্ত্তাই তাঁহাকে হত্যা করে (৬৫২)। সেকেন্দরের পারস্য বিজয়ের সহিত মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। দুই রাজাই নিতান্ত অপদার্থ, দুই সময়েই গৃহ বিবাদে ও বৈদেশিক যুদ্ধে সাম্রাজ্য দুর্ব্বল। সেকেন্দরের আক্রমণেও গ্রেণিকাস ও ইসাসের যুদ্ধে পারসীকদের ভীষণ পরাজয় হয়, কিন্তু শেষ আশা নির্ম্মূল হয় গগামেলার তৃতীয় যুদ্ধে। আরবদের পারস্য বিজয়ও পূর্ণ হয় তিনটী যুদ্ধে। দুই রাজাই অধীনস্থ আশ্রয়দাতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার চক্রান্তে হত হন। মুসলমান প্লাবনে পারস্য ভাসিয়া গেল। হেনাভেণ্ডের যুদ্ধের পর ১০।১২ বৎসর পরেই মুসলমানগণ পারস্যের উপর প্রায় পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

মুসলমান যুগ

মুসলমান বিজয়ের বহুবৎসর পর পর্য্যন্ত পারস্য খলিফার খাস অধিকারে থাকে। ৭।৮ শত বৎসর পর মধ্য এশিয়ার সমারখণ্ড হইতে টাইমুর পারস্য জয় করেন। ১৪০৫ অব্দে টাইমুরের মৃত্যু হয়—এবং সেই সময় হইতে ১৪৯৯ অব্দ পর্য্যন্ত পারস্য টাইমুর বংশীয়দের অধীনই থাকে। ১৪৯৯ অব্দে পারস্য আবার স্বাধীন হয়। সেই সময় সুফি-বংশের প্রথম ইসমাইল রাজা হন। এই সুফিবংশ পারস্যের সিয়াধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই বংশের আব্বাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন। সুফিবংশ যখন পারস্যে রাজত্ব করিত, সেই সময় প্রাচ্যের ভূতপূর্ব্ব রোমক সাম্রাজ্যান্তর্গত ভূভাগ ওসমানী তুর্কীদের হাতে ছিল। এই দুই মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ত ছিলই না, বরং প্রায় অনবরত ঝগড়াই চলিতেছিল। আব্বাসের পর এই বংশে আর

তেমন উপযুক্ত রাজা জন্মে নাই। তার উপর গৃহ-বিবাদেও পারস্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তুর্কীগণ সুযোগ বুঝিয়া রুশের সহিত মিত্রতা করিয়া একযোগে পারস্যের ভাগ বাটারা (Partition) করার বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু তাহাদের সমস্ত সাধে বাদ সাধিল—নাদির শাহ। ১৭২১ খৃঃ অব্দে আফগানগণ পারস্য আক্রমণ করিল। তদানীন্তন পারসীক রাজা আফগানের নিকট পরাজিত হইয়া, দস্যুদলপতি নাদির শাহকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। নাদির আফগানদের পরাজিত করিলেন বটে, কিন্তু রাজাকে বন্দী করিয়া ও পরে হত্যা করাইয়া এক নাবালক রাজা দাঁড় করাইলেন। কার্য্যতঃ কিন্তু কিছুদিন পরই সেই নাবালকের মৃত্যুর পর পারসীক অভিজাতদের আহ্বানে তিনি রাজা হন। পারসীকগণ নিমন্ত্রন না করিলেও বোধ হয় তিনি রাজা হইতেন, তবুও তিনি এমনভাব দেখাইলেন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মত হইলেন। নাদির একদিকে আফগান, অপরদিকে তুরস্ক ও রুশের হাত হইতে পারস্যকে রক্ষা করিলেন—নতুবা আজ হয়ত পারস্যের কোন চিহ্নই মানচিত্রে থাকিত না। পারস্যের প্রজাগণই স্বেচ্ছায় তাঁহাকে রাজা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া আবার সেই অভিজাতগণই তাঁহাকে হত্যা করাইল (১৭৪৭)

নাদির শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যে আবার গোলমাল ও গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হয়। আফগানগণ আহম্মদশা আব্দালীর অধীনে আবার প্রবল হইয়া উঠে। আহম্মদ একাধিকবার পারস্য

আক্রমণ করে। এই সব গোলমালের মধ্যে কজার বংশের (Kajar dynasty) প্রতিষ্ঠাতা আগা মহম্মদ ১৮শ শতাব্দীর শেষ দশকে রাজা হন। তিনি অত্যন্ত বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর ছিলেন; কর্মন নগর অধিকার করিয়া ২০,০০০ স্ত্রী ও শিশুকে দাসভাবে বিক্রী করেন এবং ৭০ হাজার চক্ষু তুলিয়া ফেলেন। কজার বংশ সেদিন পর্য্যন্তও পারস্যে রাজত্ব করিয়াছে।

চীনের মাঞ্চু শাসনের মত কজার শাসনও পারস্যের পক্ষে খাঁটি স্বদেশীয় শাসন নহে। কজার রাজগণ আর্য্য ইরাণী বংশের লোক নয়। কজারগণ কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্বের তুর্কমান (Turcoman) বংশীয়। কিন্তু তাহারা বহুদিন যাবৎ পারস্যের অধীন এবং সর্ব্বতোভাবে পারসীক ভাবাপন্ন হইয়াছিল। নাদির সাহের আমলে পারসীকগণ কজার সর্দ্দারদের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিল। প্রথম কজার রাজা আগা মহম্মদের পিতামহ ফতে আলি খাঁকে নাদিরশাহ হত্যা করেন। তাঁহার পিতা এবং তিনি নিজেও নাদিরের হাতে যথেষ্ট অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন। নাদির তাঁহার উপর যে বর্ব্বর অত্যাচার করে, তার ফলে লোক-সমাজে সে ক্লীব (Withered enuch) বলিয়া পরিচিত ছিল। তাঁহার চেহারা যেমন কদাকার ছিল, অন্তরও ঠিক সেইরূপই ছিল। রাজা হইয়া আগামহম্মদ এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়াছেন নিজের প্রজাদের উপর। একবার তিনি নরমুণ্ডের এক উচ্চ মিনার তৈরী করান—এমন অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর তাহার খেয়াল ছিল। রজ্যের বহু সম্রান্ত

লোককে তিনি সবংশে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ-পিপাসা এত প্রবল ছিল যে একাধিক লোককে সবংশে হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৭৯৭ অব্দে তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে হত্যা করে।

আগা মহম্মদ যে অত্যাচারের সাহায্যে রাজ্যের পত্তন করিয়া গেল, পরবর্ত্তী কজার রাজগণ ঠিক সেই অত্যাচারের আশ্রয়েই রাজ্য শাসন করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো ফর্থআলি শাহ রাজা হন। ইনি পিতৃব্যের শেষ দশা দেখিয়া. বেশী অত্যাচার করিতে ভরসা পান নাই। কিন্তু তিনিও একবার এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে (রাজকীয় মণি-মুক্তার রক্ষক) জ্যান্ত একটা প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া থুইয়াছিলেন। ইহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই রুষ, তুরস্ক ও আফগানদের সহিত যুদ্ধ করিতেই কাটে। প্রায় যুদ্ধেই পারস্য পরাজিত হয় এবং কিছু কিছু রাজ্য হারায়। তঁহার পর তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শাহ রাজা হন। তিনি অধিকাংশ সময়ই আফগানদের সহিত যুদ্ধে ও গৃহবিবাদে কাটাইয়াছেন। ঐ সব যুদ্ধে ইংরাজগণ আফগান-দের সাহায্য করিত; সেই উপলক্ষে ইংরাজদের সহিতও একটু গোলমাল বাঁধে, কিন্তু সহজেই তাহার মিটমাট হয়। কিছুদিন পর তাঁহার নিজের ছেলে বিদ্রোহী হয়। আগাখাঁর বিদ্রোহও তাঁহার রাজত্বে। আগাখাঁ পরাজিত হইয়া বোম্বেতে আসেন—এবং তাঁহারই বংশধর বর্ত্তমান আগাখাঁ। বাহাই সম্প্রদায়ের উৎপত্তিও তাঁহার আমলে। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে

তিনি কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। খেয়াল মত মন্ত্রীকে হত্যা করা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের পদচ্যুত ও হত্যা করা; লোককে অন্ধ করা বা তাহাদের অঙ্গহানি করা—এই সব কাজে তিনি বেশ ওস্তাদ ছিলেন। একদিকে রুশ, তুরস্ক ও আফগানদের নিকট পরাজয় ও রাজ্যক্ষয়, অপর দিকে এই নির্ম্মম অত্যাচার ;—দুই দিকে এই চাপ প্রজারা বেশী দিন সহ্য করিতে পারিল না। ঠিক এই সময় সৈয়দ মহম্মদ আলী বাব তাঁহার বাহাই ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাইদের সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে বলিতে চেষ্টা করিব।

তাঁহার পর নাসেরউদ্দিন শাহ রাজা হন। অত্যাচার করিতে ও নিষ্ঠুরতায়, তিনি কাহারও নিকট পরাজিত হইবার নহে। তাহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী মির্জাটাকি দুষ্ট চক্রান্তকারীদের কুপরামর্শে তাঁহার বিরাগভাজন হন। তিনি মন্ত্রীকে প্রথমে পদচ্যুত করেন এবং পরে তাঁহাকে ভুলাইয়া কষাণের শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিতে রাজী করান। একমাস পরে, রাজা তাঁহাকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠান। তিনি রাজাদেশ পাইয়া সেই ঘাতকদের বলিলেন, "আমাকে জবাই না করিয়া আমার ইচ্ছামত মরিতে দাও।" তাহারা রাজি হইল। তিনি চুপ করিয়া বসিলেন, নাপিত আসিয়া দুই বাহুর দুইটি প্রধান ধমনী কাটিয়া দিল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়াই রহিলেন এবং কিছু পরেই মারা গেলেন। তাঁহার আমলে ইংরাজদের সহিত একটা ছোট যুদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান

ঘটনা—বাহাইদের উপর অত্যাচার। তিনি দুইবার ইউরোপ ভ্রমণে যান। নাসেরউদ্দিনের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় একটা ঘটনায়। একবার বিলাতে এক জেল পর্যাবেক্ষণ করিতে গেলে, সেখানকার ফাঁসী দিবার প্রথা ও যন্ত্রাদি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার এই সঙ্গীটিকে ফাঁসী দিয়া দেখাও কি করিয়া সব হয়।" বহু কষ্টে ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার এই সখ থামাইতে পারিয়াছিল।

তখন ইংল্যাণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সুসভ্য খ্রীষ্টান ইংল্যাণ্ড রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতেছিল। নাসেরউদ্দিনের বিলাত গমনে ইংরাজগণ তাঁহাকে হাত করিয়া, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের দল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না। মহারাণী তাঁহাকে K. G. উপাধি দিলেন। পারস্যকে হাত করার এই প্রথম চেষ্টা।

১৮৯১ অব্দে, পারস্যে তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় তিনি এক ইংরাজ কোম্পানীকে দিলেন। এই কারবারের মূলধন ৬৫০০০০ পাউণ্ড এবং যে সব সর্ত্তে তাঁহাদের এই অধিকার দিলেন তাহাতে প্রতি বৎসরেই তাহারা ৫০০০০০ পাউণ্ড লাভ করিবার আশা করিত। কথা রহিল, তাহাদের আয়ের অংশ শাহকে দিতে হইবে। দেশের লোক এই অন্যায় ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। বাস্তবিক পক্ষে পারস্যের অধিবাসীদের পক্ষে ইহাই প্রথম রাজকার্য্যের প্রতিবাদ।

নব যুগের সূচনা

তামাকের একচেটীয়া ব্যবসায়ের অধিকার ইংরাজকে দেওয়ার ফলে পারস্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হইল, প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেই নব্য পারস্যের জন্ম। অত্যাচার যখন স্তূপাকার হইয়া মানুষের মনে বিপ্লব ঘটাইতে পারে, তখন কত সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া সে বিপ্লব বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনায়। তামাকের আন্দোলন হইতেই নব্য পারস্যের জন্ম—বাহ্য দৃষ্টিতে এইটাই মনে হইবে। কিন্তু অন্তরের খবর যাহারা রাখেন, তাঁহারা তা বলিবেন না। যা'ক, মোটের উপর এই তামাক লইয়াই পারস্যের বিপ্লব আরম্ভ হইল।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পারস্যবাসীরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিল, কেহ আর তামাক খাইবে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তামাকের ব্যবহার বন্ধ হইল—সব তামাকের দোকান বন্ধ হইল। অবশেষে

বাধ্য হইয়া, শাহ সেই পূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলেন—কিন্তু সেই ইংরাজ কোম্পানীকে এক বৎসরের প্রত্যাশিত আয় ৫ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইল।

১৮৯৬ অব্দে, মির্জা মহম্মদ রেজা নামে এক ব্যক্তি শাহকে গুলি করিয়া মারে। বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতির কার্য্য এই প্রথম পারস্যে প্রকাশ পায়। পরবর্ত্তীকালে পারস্যে বহু গুপ্ত সমিতি হইয়াছিল—এমন কি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও বহু গুপ্ত সমিতি ছিল।

ইহার পর নাসেরউদ্দিনের পুত্র মুজফ্‌ফর উদ্দিন শাহ রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতেই পারশীকদের বহু দিনের সঞ্চিত, অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। পারশীকগণ এখন পরিষ্কার ভাবে শাসন সংস্কার দাবী করিতে লাগিল, কিন্তু মুজাফ্‌ফর উদ্দিন কাজর বংশের অত্যাচারের ধারা বদলাইতে রাজী ছিলেন না। ১৯০৬ অব্দে পারশীকগণ রাজশক্তিকে খর্ব্ব করার এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। তাহারা 'বস্ত' করিল।

'বস্ত' কতকটা আমাদের হরতালের মত। রাজধানী টিহ্‌রেনের ১৬০০০ হাজার লোক তাহাদের বাড়ী ঘর, কাজ কারবার ছাড়িয়া মস্‌জিদে ও ইংরাজ দূতাবাসে যাইয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কাহারও উপর কোন প্রকার জোর জবরদস্তি বা উপদ্রব করিল না। সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইল। নাগরিকদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য সরকারের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে এক মাস পরে, ১৯০৬ অব্দে আগষ্ট মাসে শাহ এক নূতন শাসন সংস্কার দিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। নাগরিকগণ নিজ নিজ

কর্ম্মে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইতে দেরী দেখিয়া পারশীকগণ আর একবার 'বস্ত' করিল। ৭ই অক্টোবর প্রথম 'মজলিস' বসিল। মজলিসে ৮০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল। ১৯০৭ অব্দে মুজাফ্‌ফর উদ্দীন মারা যায়। ১৯শে জানুয়ারী (১৯০৭) তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি শাহ রাজা হন। মহম্মদ আলির মত এমন নির্দ্দয়, অত্যাচারী, হীন ও পাশব প্রকৃতির রাজা পারস্যে কমই জন্মিয়াছে।

সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে তিনি এই নূতন রাষ্ট্রপদ্ধতিকে মানিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়াই শাসন সংস্কার প্রত্যাহার করার মতলব করিলেন এবং এই বিষয়ে রাশিয়া তাহার প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইল। সুযোগ বুঝিয়া ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া দুষ্ট গ্রহের মত দুই দিক হইতে পারস্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সহিত তলে তলে শাহকে সাহায্য করিতে লাগিল। উভয়েই বুঝিল পারস্য একবার জাগিয়া উঠিলে তাহাদের উভয়ের স্বার্থের হানি। তাই শাহকে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা উভয়েই শাহকে গোপনে ৪ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিতে স্বীকৃত হইল।

এই সময়ে ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মাণী ব্যবসায় বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজের তখন প্রধান উদ্দেশ্য হইল জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে

নিজের দলবৃদ্ধি করা। ১৯০৪ অব্দে ইংরাজ ও ফরাসীতে এক সন্ধি হইল। ফরাসী বলিল, 'মিশরে তুমি যাহা খুসী কর, আমি আর আপত্তি করিব না'। ইংরাজ বলিল 'স্বাধীন মরোক্কোকে তুমি গ্রাস করিতে পার, কর, আমার আপত্তি নাই।' দুই চোরে মাসতুতো ভাই সম্পর্ক পাতাইল। কিন্তু জার্ম্মেণী রুখিয়া উঠিল। ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধে বাঁধে হইল। কোনক্রমে সেইবার যুদ্ধ হ্‌ইল না। কিন্তু দুই পক্ষই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইংরাজ দেখিল, জাম্মেণীর দক্ষিণপশ্চিমে ফরাসী তাহার হাতেই আছে ; কিন্তু উত্তরপূর্ব্বে রাশিয়াকে হাত করিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই ১৯০৭ অব্দে ইংল্যাণ্ড রুশিয়ার সঙ্গে এক সন্ধি করিল। এই সন্ধিতে, উভয় পক্ষ তিব্বত, আফগানিস্থান ও পারস্য সম্বন্ধে চুক্তি করিল। পারস্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল উত্তরে পারস্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশে রাশিয়ার কর্তৃত্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় এক চতুর্থাংশে ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। পারস্যে কেহই অপরের স্বার্থে হাত দিবে না বরং যথা সম্ভব সাহায্য করিবে। কিন্তু উভয় পক্ষই পারস্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিল ও ভবিষ্যতেও তাহা মানিয়া চলিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে নিজকে সুরক্ষিত করিবার জন্য, ইংরাজ চিরশত্রু ফরাসী ও রুশের সহিত মিত্রতা করিল। এই মিত্রতার অর্থ হইল, তিন দস্যু পরস্পর পরস্পরের দস্যুতায় বাধা না দিয়া যতটা সম্ভব সাহায্য করিবে। ইহারই নাম 'ত্রিমৈত্রী' ('Tripple Alliance')।

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া যে পারস্যের বিভিন্ন অংশে পরস্পরের কর্ত্তৃত্ব ও স্বার্থ স্বীকার করিয়া লইল, ইহার মূল্য কি? ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া বলবান ও পারস্য দুর্ব্বল; বলবানের সুখ সুবিধার জন্যই দুর্ব্বলের অস্তিত্ব। বুদ্ধ, খৃষ্ট বা অন্য কোন মানব-প্রেমিকই মানব মন হইতে এই ধারণা দূর করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ পারিবেন কিনা জানি না। ইংরাজ, রুশ ও ফরাসীর এই আচরণ, কোন উচ্চ আদর্শ, ধর্ম্মসূত্র ও নীতিবাক্য দিয়া সমর্থন করিতে যাওয়া ধর্ম্ম ও নীতিবাক্যের অবমাননা। ঈশপের গল্পে নেকড়ে বাঘ ও মেষ-শাবকের গল্পের কথাই, এই প্রসঙ্গে মনে আসে।

যা'ক পারশীকগণ, এই কাণ্ডে একটু অবাক হইল। কিন্তু তাহারা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। পারস্যের ইংরাজ দূত পারস্য সরকারকে জানাইল যে বিলাতের পররাষ্ট্র সচিব স্যার এড্ওয়ার্ড গ্রে (পরে লর্ড গ্রে Lord Gray) তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে পারসীকগণ যেন এত বিচলিত না হয়—পারস্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব করার কোন অভিপ্রায়ই ইংল্যাণ্ডের বা রুশিয়ার নাই। প্রতিকারের কোনই ক্ষমতা পারস্যের হাতে ছিল না। তাই এই মিষ্ট কথায় তুষ্ট থাকা ভিন্ন উপায়ও ছিল না।

এদিকে মহম্মদ আলির আচরণে মজলিসের সভ্যরা ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তারা বুঝিল মহম্মদ আলি নূতন রাষ্ট্র-পদ্ধতি মানিবে না। কিন্তু তাহাদের প্রধান দৃষ্টি পড়িল শাহর ব্যক্তিগত খরচার দিকে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যতদূর শোচ-

নীয় হইতে পারে তাহা হইয়াছে। তাই মজলিসের চেষ্টা হইল শাহের খরচ কমাইয়া ও শুল্কাদির (Customs) সুব্যবস্থা করিয়া রাজ্যের আয় বাড়ান।

মজলিসের এই শুভ চেষ্টার প্রধান অন্তরায় ছিল নউস নামে একটি বেলজিয়ান কর্ম্মচারী। নউস (Naus) ছিল পারস্যের শুল্ক বিভাগের কর্ত্তা। সে এই চাকুরী করিয়া, নিজদেশ বেলজিয়ামে প্রভূত সম্পত্তি করিয়াছিল এবং পারস্যের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে তাহার ক্ষমতাও ছিল অপ্রতিহত। মজলি-সের চাপে সম্রাট তাহাকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

মহম্মদ শাহ, অতাবক-ই-আজাম (Atabak-i-Azam) নামক এক অত্যাচারী অসাধু নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া প্রধান মন্ত্রী করিলেন। রুশ সরকার মহম্মদের সহিত তাহাকে ইউরোপ হইতে নিজেদের ষ্টিমারে করিয়া পারস্যে পৌছাইয়া দিল। তিনি যখন রেষ্ট (Rest) নগরে আসিয়া নামিলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের ভয়ে ও চাপে মহম্মদ নূতন রাষ্ট্র পদ্ধতি মানিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এমন সময় তুরস্ক পারস্যের হামদান প্রদেশ আক্রমণ করিল, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যে প্রত্যেক প্রদেশেই গোলমাল ও অসন্তোষ চলিতে লাগিল। এদিকে রাশিয়া নানা রকমে পারস্যকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ঠিক এমন সময়, প্রধান মন্ত্রী অতাবক রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাশিয়া

ঋণ দিবার জন্য সদাই প্রস্তুত, কারণ ঋণ দেওয়ার অর্থই পারস্যের উপর কতকগুলি নূতন দাবী প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ব্বে ১৯০২-০৩ অব্দে রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপার লইয়া, অতাবককে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। এইবার আব্বাস আকা (Abbas Aqa) নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিলেন। এই যুবক দেশ-হিতকামী গুপ্ত-সমিতির সভ্য। অবতাককে হত্যা করিয়া, তিনি নিজেও আত্মহত্যা করেন। নাসিরুল মুল্ক প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু ক্রমেই মজলিসের সহিত মহম্মদের ঝগড়া আরও বৃদ্ধি পাইল। কয়েক মাস পরে, শাহ, রুশ-সেনাপতির পরিচালিত পারশীক কশাক বাহিনী (Cossack Brigade) লইয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। মন্ত্রীদের ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিকে আটক করিয়া রাখিলেন। প্রধান মন্ত্রী, নাসিরুল মুল্ক স্যার এড্ওয়ার্ড গ্রের সহপাঠি ও বন্ধু। তাই ইংরাজ সরকারের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মজলিসের বিপদ দেখিয়া, নাগরিকগণ বাহারি স্থান (মজলিস গৃহ) পাহাড়া দিতে লাগিল। কশাকগণ এই নাগরিক স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীকে দমন করিতে পারিল না। অগত্যা মহম্মদ শাহ তাহাদের সর্ত্তে পুনরায় রাজী হইলেন। আবার নাসিরুল-মুল্ক প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, শাহ যখন রাস্তা দিয়া গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কে একটা বোমা ছোড়ে। তিনি সামান্য জখম হইলেন। ইহাতে শাহ সংস্কার-

পন্থীদের ও মজলিসের উপর আরও চটীয়া গেলেন। কিন্তু সম্রাট মজলিসের নিকট পরাজিত হইয়া কয়েকজন সংস্কার বিরোধী পার্শ্বচরকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার পরদিন রুশ ও ইংরাজ দূত পারস্যের পররাষ্ট্র সচিবকে (Foreign-minister) ডাকাইয়া বলিলেন যে শাহের কথামত না চলিলে, রাশিয়া তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে। মজলিসের সভ্যগণ ভয়ানক চটিয়া গেল কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। সম্রাট রাজধানীর বাহিরে বাগ-ই-শাহ প্রসাদে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কয়েকজন সংস্কার-পন্থী নেতাকে নিজ প্রসাদে ডাকাইয়া নিয়া সম্রাট তাঁহাদের বন্দী করিলেন। একজন কোন ক্রমে পলাইয়া যাইয়া সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সকলকে জানাইল। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইতে লাগিল। জুন মাসে এক দিন রুশ-সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া মজলিস গৃহ আক্রমণ করিল। প্রথমে রুশ-সেনানী লিয়াখোফ গুলি চালাইল—পরে সেখানে যে শ'খানেক নাগরিক স্বেচ্ছাসৈন্য ছিল, তাহারাও রুশ-সৈন্যের উপর গুলি চালাইল। আর এক দল রুশ-সৈন্য আসিয়া রুশ-বাহিনীর দল পুষ্ট করিল। তবু স্বেচ্ছা-সৈনিকগণ ৭।৮ ঘণ্টা. পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইল। মজলিসের সভ্যরা কেহ বা মারা গেল, কেহ বা বন্দী হইল, ২।৪ জন পলাইয়াও গেল। জাতীয় দলের বহু লোককে হত্যা করা হইল। সেনাপতি লিয়াখোফ (Liakhoff) জাতীয় দলের লোকদের বাড়ী ঘর লুট করিল এবং মজলিসের সব কাগজ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিল।

রাজধানী টীহারাণে জাতীয় দলের ও সংস্কার-পন্থীদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। কিন্তু মফঃস্বলের লোকেরা ইহাতে দমিল না। রেষ্ট, কির্ম্মান, ইস্পাহান, তাব্রিজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল এবং তাব্রিজ 'মহম্মদ আলিকে সিংহাসন চ্যুত করা হইল' বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। তাব্রিজ পারস্যের দ্বিতীয় নগর। দশ মাস পর্য্যন্ত তাব্রিজ বাসীরা রাজ পক্ষীয়দের (royalist) সহিত লড়াই করিল। বিপক্ষ দলের দ্বারা নগর দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকায়, তখন তথায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। তাব্রিজের রুষ বাণিজ্য-দূত (Consul) রাজ-পক্ষীয়দের অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছিল। ইহার উপর এক জন রুষ-সেনাপতি একদল পারসিক সৈন্য লইয়া রাজ-পক্ষীয়দের সহিত যোগ দিল। কিন্তু তবুও জাতীয় দল অদমিত ভাবে তাহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এদিকে, রেষ্ট, ইস্পাহান, লার, শিরাজ ও অন্যান্য স্থানেও জাতীয় দল জয়যুক্ত হইল। ইস্পাহানে ২ জন বক্তিয়ার সর্দ্দার জাতীয় দলের ভার লইলেন—ইহার ফলে বক্তিয়ারগণ জাতীয় দলের সহিত যোগ দিল। বিদেশীয়দের রক্ষার ও খাবার সুব্যবস্থা করিবার অজুহাতে ৪০০০ হাজার রুষ-সৈন্য তাব্রিজ নগরে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রথমে বলিয়াছিল, বিদেশীর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহারা চলিয়া আসিবে এবং যে কয়দিন তথায় থাকিবে, তখনও তাহারা নাগরিকদের রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে হাত দিবে না। কিন্তু রুষগণ এই দুই সর্ত্তের একটাও পালন করিল না।

এদিকে ইস্‌পাহান ও রেষ্ট হইতে দুই দল জাতীয় বাহিনী টীহারাণের দিকে যাত্রা করিল। মহম্মদ শাহ আর একবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা (Constitution) মান্য করিবেন। কিন্তু জাতীয়দল তাঁহার কথা মোটেও বিশ্বাস করিলনা। রেষ্ট ও ইস্‌পাহানের জাতীয় দল টীহারাণের দিকে চলিতে লাগিল। রুষ-দূত বহুবার জাতীয় দলের নেতাদিগকে ভয় দেখাইয়া বিরত করিবার চেষ্টা করিল—অবশেষে ২০০০ হাজার রুষ-সৈন্য বাকু হইতে উত্তর পারস্যে পাঠান হইল। রুষ দূত আবার জাতীয় দলের নেতাদের বলিল, তাহারা রাজ-ধানীর দিকে আর অগ্রসর হইলে, বৈদেশিক শক্তিসমূহ তাহাদের শাস্তি দিবে। তবুও জাতীয়দল অগ্রসর হইতে লাগিল। টীহারাণের নিকটে রুষ-সেনাপতির অধীন রাজকীয় সৈন্যের সহিত জাতীয় সৈন্যদের ছোট খাটো লড়াই চলিতে লাগিল। পারসিক কসাক সৈন্যদের চোখে ধূলা দিয়া, ১৩ই জুলাই দুই দল জাতীয় সৈন্যই টীহারাণে প্রবেশ করিল। এই কার্য্যের জন্য বাহাদুরী ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন আর্মেণিয়া খৃষ্টান সেনানীর প্রাপ্য। তিনিই রেষ্ট বাহিনীর প্রাণ ছিলেন, যদিও রেষ্ট বাহিনীর নেতৃত্বপদের গৌরবের অধিকারী ছিলেন শিপাদর। ১৫ই জুলাই (১৯০৯) জাতীয় দল টীহারাণের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। ১৬ই ভোরে মহম্মদ রুষ-দৌত্যাবাসে পলাইয়া গেল। সেইদিন রাত্রেই মজলিস মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাহার নাবালক পুত্র আহম্মদ মির্জাকে সম্রাট

বলিয়া ঘোষণা করিল। ইংরাজ ও রুষ দূতগণ মহম্মদ আলিকে আশ্রয় দিল এবং তাহার পক্ষ হইয়া মজলিসের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। ঠিক হইল মহম্মদ আলিকে বৎসরে ৮০ হাজার ডলার বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং তিনি রুষিয়ার অন্তর্গত ওডেসা বন্দরে থাকিবেন।

নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। রেষ্ট বাহিনীর নেতা শিপাদরকে প্রধান মন্ত্রী করা হইল। কিন্তু উত্তর পারস্যে বহু স্থানে তখনও রুষ-সৈন্য ছিল। তাই জাতীয় দল রুষিয়ার মতলবে নানা প্রকার সন্দেহ করিতে লাগিল। বিখ্যাত দস্যু রহিম খাঁ এই সময়ে উত্তর পারস্যে লুটপাট আরম্ভ করিল। পারসিক সৈন্যের নিকট তাড়া খাইয়া সে রুষ অধিকারে পলাইয়া যায়। সন্ধি-সর্ত্ত অবহেলা করিয়া রুষ সরকার তাহাকে আশ্রয় দিল এবং কিছুদিন পরেই সে আবার রুষ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া পারস্য লুটপাট করিতে লাগিল। ডরাব মির্জা নামে এক রুষিয়াবাসী পারসিক কসভিনের রুষ-সৈন্যের সেনানী ছিল। সে পারসিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। পারসিকগণ তাহাকে দমন করার জন্য একদল সৈন্য কস্‌ভিনে পাঠাইল; কিন্তু পথে রুষগণ তাহাদের বাধা দেয় ও তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ১৯১১ অব্দে ভর্মুনী নামক স্থানে রুষগণ স্ত্রী, শিশু প্রভৃতি লইয়া ৬০ জন পারসিককে হত্যা করিল। এই ভাবে রুষিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সভ্যতার নিদর্শন দিতেছিল।

নূতন পারসিক সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাই তাহারা ইংরাজ ও রুষ সরকার হইতে কিছু ঋণ গ্রহণ করার চেষ্টা করিল। কিন্তু এই দুই সরকারই ঋণ দিবার বিনিময়ে এমন সব সর্ত্ত দাবী করিল, যে তাহাতে রাজী হওয়ার অর্থ পারস্যের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া। তাহারা বাধ্য হইয়া লণ্ডনের এক ব্যাঙ্ক হইতে, রাজকীয় মণি মুক্তা বাঁধা দিয়া ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিল। সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে—কিন্তু ইংরাজ সরকারের আপত্তিতে সে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারিল না। ইংরাজ সরকারের বোধ হয় মতলব ছিল, তাহাদের সর্ত্তে ও তাহাদের নিকট কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারস্যকে এই ভাবে বাধ্য করিতে পারিবে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড পারস্যকে এক "চরম পত্র" (Ultimatum) দিল (১৯১০)। তাহারা দাবী করিল যে দক্ষিণ পারস্যের ব্যবসায়ের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, তাই সে সব রাস্তার জন্য কয়েক জন ইংরাজ সেনানী নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সব কর্ম্মচারীরা ইংরাজ সরকারের তাবেদারেই থাকিবে। কিন্তু তাহাদের বেতন দিতে হইবে পারস্য সরকার হইতে। এই অন্যায় দাবী প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পারস্যের নাই; অগত্যা তাহারা জার্ম্মেণীর কাইসারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

অপর দিকে ওডেসা হইতে মহম্মদ আলি পুনরায় পারস্যে ফিরিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সে সম্বন্ধীয় কগজ পত্র পারসিক সরকারের হাতে কিছু পড়িল। পারস্যের বৈদেশিক

মন্ত্রী মহম্মদের মুরব্বি ইংরাজ ও রুষ দূতকে জানাইলেন যে, এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে ভাল রকম তদন্ত হইতেছে। এই তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, মহম্মদের বৃত্তি বন্ধ থাকিবে। ইহা খুবই ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু ইংরাজ ও রুষ দূত, বৈদেশিক মন্ত্রীর বাড়ীর দরজায় নিজেদের কতক কর্ম্মচারী বসাইয়া রাখিল এবং এই সব কর্ম্মচারীরা বৈদেশিক মন্ত্রীর পিছন পিছন সর্ব্বত্র যাইতে লাগিল। এই অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি বাধ্য হইয়া মহম্মদের বৃত্তি পাঠাইয়া দিলেন।

ইস্‌পাহানে একজন পারসিক তথাকার শাসন কর্ত্তাকে হত্যা করিয়া রুষ বাণিজ্য দূতাবাসে (Consulate) যাইয়া আশ্রয় লইল। টিহারাণেও দুই জন জর্জ্জিয়াবাসী পারসিক প্রজা রুষ-দ্বেষী অর্থ সচিবকে (Finance Minister) হত্যা করিল। রুষ দূত বলিল, "তোমরা ইহাদের বিচার বা শাস্তি দিতে পারিবে না, যাহা শাস্তি হয় আমরা দিব।"

দুর্ব্বল পারস্য বাধ্য হইয়া দেশদ্রোহী হত্যাকারী দুইটিকে রুষের হাতে ছাড়িয়া দিল। রুষ তাহাদিগকে পারস্যের বাহিরে পাঠাইয়া দিল। এমনি ভাবে, প্রত্যেক পদে পদে ইংরাজ ও রুষ পারসিক সরকারকে বাধা দিতে লাগিল এবং ইংরাজ কখনও বা প্রত্যক্ষে এবং কখনও বা পরোক্ষে রুষিয়াকে সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু পরের ঘটনা ইংরাজ ও রুষের পক্ষে আরও লজ্জাকর। দুইটি সুসভ্য জাতি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া, পারস্যের বাঁচিবার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিতে লাগিল।

তাহাদের উদ্দেশ্যই হইল, কি করিয়া পারস্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেদের উদর পূরণ করিতে পারিবে।

রুষ ও ইংরাজের কীর্তি

দেশের আর্থিক দূরবস্থা দূর করিবার জন্য, মজলিস ঠিক করিল একজন আমেরিকানকে নিযুক্ত করা হইবে। দেশের মধ্যে তেমন উপযুক্ত লোক পাওয়া মুস্কিল; ইউরোপীয় কেহ আসিলে, তাহার নিজের, বা অপর কোন মিত্রজাতির স্বার্থই সে বড় করিয়া দেখিবে, পারস্যের কোন উপকারই তাহাকে দিয়া হইবে না। তাই তাহারা একজন আমেরিকান আনিবে ঠিক করিল। ১৯১১ অব্দে মে মাসে আমেরিকা হইতে শাষ্টার (Shuster) আসিলেন; তাঁহার সহিত ৪ জন আমেরিকান সহযোগীও আসিলেন। প্রথম যখন মজলিস হইতে এই প্রস্তাব হইল, তখন হইতে রুষিয়া এই প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিল। মজলিসকে হাত করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া, রুষিয়া আমেরিকাকে হাত করার চেষ্টা করিল। ইংরাজ সরকারও

গোপনে রুষিয়াকে সাহায্য করিল। কিন্তু আমেরিকা রুষিয়ার আপত্তি শুনিল না।

শাষ্টার পারস্যে যাইয়া এক নূতন আইন প্রস্তুত করিয়া রাজ্যে আয় ব্যয়ের সমস্ত ভার নিজের হাতে লইলেন। মজলিস আনন্দের সহিত এই আইন পাশ করিয়া দিল। মর্ণার্ড (Mornard) নামে এক বেলজিয়ান, শুল্ক বিভাগের কর্ত্তা ছিল। এই লোকটি রুষিয়া ও ইংলণ্ডের হাতের পুতুল ছিল। এই আইন অনুসারে সেও শাষ্টারের অধীন হইল। কিন্তু ইংলণ্ডেও রুষিয়ার প্ররোচনায়, এই লোকটি ক্রমাগতই এই আইন অবহেলা করিয়া চলিতে লাগিল। শাষ্টার ও মজলিস বহু চেষ্টা করিয়া তাহাকে দমন করিল—কিন্তু বরাবরই সে অন্তরে রুষ ও ইংরাজের পক্ষই টানিত। এ দিকে তাহারা শাষ্টারকে প্রলোভন, মিষ্ট আলাপ, ভয়, প্রভৃতির দ্বারা হাত করার চেষ্টাও করে। শাষ্টার দেখিলেন দেশের সর্ব্বত্র ভালরূপ টেক্স আদায় করিতে হইলে, তাঁহার অধীনে একদল সামরিক পুলিশ (Gendarmerie) গড়া দরকার। এই পুলিশ দলের ভার দিয়া তিনি মেজের ষ্টোক্স্ (Stokes) নামক একজন ইংরাজ সেনানী নিযুক্ত করিতে চান। ষ্টোক্স্ও রাজী হন। শাষ্টার তখন ইংরাজ সরকারকে অনুমতির জন্য লিখিল। বিলাত হইতে উত্তর আসিল, তাহাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ষ্টোক্স্কে ইংরাজের চাকুরী ছাড়িয়া দিতে হইবে। তখন ষ্টোক্স্ টেলিগ্রাম করিয়া ইংরাজ সরকার হইতে পদত্যাগ করিল। সমস্ত ঠিক ঠাক; কিন্তু ১৪।১৫ দিন পরে

ইংরাজ-দূত পারস্য সরকারকে জানাইল "ষ্টোক্‌স্‌কে একান্তই নিযুক্ত করিতে হইলেও, তাহাকে উত্তর পারস্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।" ১০।১২ দিন পরে, ঠিক এই মর্ম্মে আর এক চিঠি আসিল। ঠিক সেই দিনই রুষ সরকারও এক চিঠি দিল যে ষ্টোক্‌সের নিয়োগ তাহার স্বার্থের বিরোধী, তাই সে পারস্যকে সাবধান করিয়া দিল যেন ষ্টোক্‌স্‌কে নিয়োগ না করা হয়। যদি একান্তই পারস্য ষ্টোক্‌স্‌কে নিযুক্ত করে, তবে রুষ সরকার উত্তর পারস্যে তাহার স্বার্থ রক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে। দুর্ব্বল পারসিক সরকার, এই দুই প্রবল জাতির মতের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না। তাই ষ্টোক্‌স্‌কে নিযুক্ত করা হইল না; অথচ তাহার পদত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পারসিক সরকারকে তাহার জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করিতে হইল।

এই সময় বিলাত হইতে বৈদেশিক সচিব গ্রে (Sir Edward Grey পরে Lord Grey) পারস্যের ইংরাজ-দূতকে জানাইলেন যে ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সব বিষয়ে রুষিয়াকে সমর্থন করিয়া চলিতে হইবে। বাস্তবিক ইংরাজ সরকার এই সময় ক্রীতদাসের মত রুষিয়ার সমস্ত কাজই অনু-মোদন ও অনুসরণ করিত। মরোক্কো লইয়া ইউরোপে আবার গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে; জার্ম্মেণী মরোক্কোর কথা ভুলিতে পারে নাই। অগত্যা ফরাসী কেমারুণ ও কঙ্গোতে জার্ম্মেণীকে অনেকটা জায়গা দিয়া ঠাণ্ডা করিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কোন মীমাংসাই নহে। দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিল। রুষিয়ার সাহায্যের জন্য দুই পক্ষই লালায়িত হইল; রুষিয়াও সুযোগ পাইল। ১৯০৭ অব্দে রুষ-ইংরাজ সন্ধিত হইলই; ১৯১০ অব্দে আবার জার্ম্মেণীর সহিত পটস্‌ডামে (Potsdam) এক সন্ধি করিল। জার্ম্মেণী রুষকে আশা দিল, বার্লিন বোগদাদ রেল লাইনের ফলে পারস্য উপসাগরের কূলে জার্ম্মেণীর যে প্রতিপত্তি আছে, তাহার সাহায্যে রুষিয়া অতি সহজেই পারস্য উপসাগরের কূলে ২।১টি বন্দর দখল করিতে পারিবে। জাপানের নিকট পোর্ট আর্থার হারাইয়া শীতকালের ব্যবহার উপযুক্ত বন্দর আর নাই—তাহার অন্য সব বন্দরেই শীতের সময় জল জমিয়া বরফ হয়! এই অভাব দূর করার রুষিয়ার একমাত্র আশা পারস্য উপসাগর। অপর দিকে ইংরাজ ও রুষিয়ার সব অন্যায় ও অপ-কর্ম্মে তাহাকে সমর্থন সাহায্য করিয়া, রুষিয়াকে হাত করার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই হ'ল রাজনীতির খেলা।

রুষ ও ইংরাজ সরকার ভূতপূর্ব্ব শাহ মহম্মদ আলির ভার নিয়াছিল। সে যাহাতে পারস্যে কোন গোলমালের সৃষ্টি করিতে বা ওডেসা হইতে পালাইয়া যাইতে না পারে, সেই জন্য এই সরকার দায়ী রহিল। স্বাস্থ্যের নাম করিয়া সে একবার সমস্ত ইউরোপ বেড়াইতে যায়। কিন্তু তাহার আদত মতলব ছিল সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য পরামর্শ করা। হঠাৎ তিনি ভিয়েনা নগরে গেলেন এবং সেখানে বেলগ্রেডের রুষ-দূতের সহিত নানা পরামর্শ করিলেন। ভিয়েনাতে তিনি অনেক অস্ত্রশস্ত্রও ক্রয় করিলেন। সে সব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, রুষিয়ার ভিতর দিয়া এবং

রুষ-ষ্টীমারে কাস্পিয়ান হ্রদ পার হইয়া সে পারস্যে অবতরণ করিল। সেই সব অস্ত্র শস্ত্রের বাক্সের উপর খনিজ জল (mineral water) বলিয়া লিখিয়া, ও এক সওদাগর সাজিয়া সে পারস্যে আসিল। রুষ সরকার পরে বলিল যে রুষ কর্ম্মচারীদের চোখে ধূলা দিয়া মহম্মদ আলি ছদ্মবেশে পারস্যে আসিয়াছে। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা—পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে রুষ ও ইংরাজ সরকারের অনুমতি ও অনুমোদন লইয়াই মহম্মদ আলি এই কাজ করিয়াছে। মহম্মদ আলির সেনাপতি অর্ষাতুল্লা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছে যে ভিয়েনাতে রুষ দূতের সহিত এই সব পরামর্শ হইয়াছিল। আলি ফিরিয়া আসিলে পর রুষ সরকার প্রকাশ্যেই তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ইংরাজ সরকারও রুষের প্রত্যেক কাজই অনুমোদন করিতে লাগিল।

জাতীয় দল মহম্মদ আলিকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল। অবশ্য এই দুইটী শক্তিমান বিদেশী জাতির প্রতিকূলে ও মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হইবার আশা তাহাদের ছিল না। এই সব ভাবিয়া মন্ত্রী-সভা অল্পে অল্পে মহম্মদের পক্ষেই ঝুকিতে লাগিল। রুষিয়া ও ইংল্যাণ্ড অযাচিত ভাবেই পারসিক সরকারকে জানাইল যে, তাহাদের অমতে, মহম্মদ আলি পারস্য আক্রমণ করিয়াছে, যা'ক তাহারা এই যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দিবে না। এইটা ঠিক "ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই না।" মত শুনায়। আর একখানা চিঠিও দিল। তাহারা জানাইল

যে "যদি কোন রুষ প্রজা এই যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ দেয়, তবে রুষ সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।" পরে রেষ্টের রুষ দূত জানাইল যে রুষ প্রজা বলিয়া সন্দেহ হইলেই পূরা তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যে কোন লোককে তাহারা আটক রাখিবে। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, ইস্‌পাহানে ও টিহারাণে তিনটি হত্যাকারীকে রুষ সরকার এই অজুহতে আশ্রয় দিয়াছিল। এই যুদ্ধের সময়, মহম্মদ আলির বিপক্ষে যে কোন কর্ম্মী ও কৃতী সেনানী যাহাতে এই ভাবে আটক করিয়া রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই চিঠি লেখা; এবং রুষ সরকার বাস্তবিকই করিয়াছে। ইংরাজও এই বিষয়ে চুপ ছিল না। মজতুদৌল্লা নামে এক রাজপক্ষীয় স্বদেশ-দ্রোহীকে বন্দী করিয়া, সামরিক বিচারে ফাঁসীর হুকুম দেয়। পারস্যের ইংরাজ দূত ফাঁসীর পূর্ব্বে আপত্তি করিয়া পাঠাইল যে ইহার পুনরায় যথারীতি বিচার করিতে হইবে। ইংরাজের এই দাবীর কারণ এই যে এই বিশ্বাসঘাতক স্বদেশ-দ্রোহী ইংরাজের প্রদত্ত K. C. M. G. উপাধিধারী। ইংরাজের এই কাণ্ডে দেশের লোক, এমন কি মন্ত্রিগণও বুঝিল, ইংরাজও মহম্মদ আলির সমর্থক। তাহাদের মনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হইল।

কিন্তু মজলিসের সদস্যরা এই সঙ্কটের মধ্যেও নির্ভীক ভাবে নিজেদের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। মজলিস হইতে হুকুম হইল, জ্যান্ত বা মরা কেহ যদি মহম্মদ আলিকে ধরিতে পারে, তবে সে বা তাহার ওয়ারিস ১ লক্ষ টুমান পুরস্কার পাইবে।

মহম্মদ আলির দুই ভাইয়ের জন্যও ২৫ হাজার টুমান করিয়া পুরস্কার ঘোষিত হইল।

মহম্মদ আলি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে তাহার স্বপক্ষীয়গণ তাহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। রসিদুল মুল্ক নামে এক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতা করে। পারসিক সরকার তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার অপরাধে আটকাইয়া রাখে। কিন্তু রুষ সরকার তাহাকে দাবী করিল। পারস্য তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিলে পর, রুষ সরকার ৩০০ সৈন্য পাঠাইয়া সেখানে শাসন কর্ত্তার নিজ গৃহে তাহাকে অপমান করিয়া, পারসিক রক্ষীদের মারপিট করিয়া, জেল হইতে রসিদুলকে খালাস করিয়া আনে। পরবর্ত্তীকালে সে দস্যু রহিমখানের সহিত যোগ দিয়া, পারসিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

রুষ ও ইংরাজের এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার ও অনাচারের কাহিনী সব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়; এই প্রকারের বহু ঘটনা এই সময় ঘটিয়াছে। যদি কোন শক্তিশালী জাতির প্রতি এই রকম একটি অনাচারও অনুষ্ঠিত হইত, তবে দুই পক্ষের রক্তেই ধরণী রঞ্জিত হইত। কিন্তু দুর্ব্বল পারস্য এই সব অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকারই করিতে পারিল না।

যা'ক ইংরাজ ও রুষের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্য সত্ত্বেও মহম্মদ আলি পরাজিত হইল। তাহার দুই ভাইও পরাজিত হইল। জাতীয় দলের এই জয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার্হ

ছিলেন ইফ্রাইম ও সর্দ্দার-ই-বাহাদুর। এই যুদ্ধের সময় অন্যান্য বক্তিয়ারী সর্দ্দাররা প্রায় সবাই মহম্মদ আলির পক্ষে গিয়াছিল; কিন্তু এই বক্তিয়ারী সর্দ্দার সর্দ্দার-ই-বাহাদুর কিন্তু তখনও জাতীয় দলেই ছিলেন। মহম্মদ আলির দুই ভাইর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য, মজলিস হইতে হুকুম হইল। এই সময় রুষ প্রত্যক্ষ ভাবেই মজলিস ও জাতীয় দলের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত রুষিয়া জোর করিয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া দিল—সমস্ত দেশ রুষিয়ার অধীন হইল। এইবার সেই কাহিনীই বলিব।

রুষিয়া ও মজলিস

মহম্মদ আলির পরাজয়ের পর মজলিস তাহার দুই ভাইএর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দিল। টিহারাণ সহরে ও বাহিরে তাহাদের কয়েকটি বাগান বাড়ী ছিল। পারসিক কর্ম্মচারীরা প্রথমে টিহারাণের বাড়ীটা দখল লইতে গেল। তাহারা যাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীর রক্ষীরা রুষ কর্ত্তৃপক্ষকে টেলিফোন করিয়া এই ঘটনা জানাইল। তখনই দুইজন রুষ সেনানী আসিয়া পারসিক কর্ম্মচারীদিগকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল এবং রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া নানা প্রকার অপমান করিল। পারসিক সরকার রুষ দূতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোন উত্তরই দিল না; তাহারা কেবল লিখিল যে নগরের বাহিরে দৌলতাবাদ প্রাসাদেও যেন পারসিকগণ হস্তক্ষেপ না করে। শাষ্টার তাহার অধীনস্থ কয়েকজন আমেরিকার কর্ম্ম-

চারীকে ৫০ জন সামরিক পুলিশ সহ আবার এই বাড়ী দখল করিতে পাঠান। শাষ্টারের সহকারী কের্ণ নিজে রুষ বাণিজ্য-দূতকে বহু অনুরোধ করিলেন যে, সেই বাড়ী হইতে যেন রুষ সৈন্য উঠাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু রুষদূত রাজী হইলেন না। তখন পারসিক পুলিশ যাইয়া জোর করিয়া সেই বাড়ী দখল করিল। কিন্তু আবার রুষ সৈন্য আসিয়া সেই বাড়ী দখল করার চেষ্টা করে; এবং বিফল হইয়া চলিয়া যায়। তখন দৌলতাবাদ ও মন্সুরাবাদের সম্পত্তি পারসিক কর্ম্মচারীরা দখল করিল। কিন্তু রুষ সৈন্য যাইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া তাহাদের বন্দী করিল। রুষ দূত বলিল যে মহম্মদ আলির ভ্রাতা তাহার এই সব সম্পত্তি এক রুষ ব্যাঙ্কের নিকট মর্টগেজ দিয়াছে। তাহারা কয়েকটা দলিল পত্রও দেখাইল। কিন্তু এই সমস্ত দলিল জাল এবং তাহাদের দাবীও মিথ্যা। তাঁহার স্ত্রী পারসিক গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি নিজের সম্পত্তি নাশের অশঙ্কা জানিয়াও; স্বামীর শেষ উইল শাষ্টারকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই উইল হইতেই প্রমাণিত হয় যে রুষ সরকারের প্রদর্শিত দলিল জাল।

অক্টোবর মাসের শেষভাগে পারস্যের অন্তর্গত এঞ্জিল বন্দরে রুষ সরকার সৈন্য পাঠাইল। ইংরাজ সরকারও বলিল যে, দক্ষিণ দিক ও পারস্য উপসাগরের তীর সুরক্ষিত করার জন্য তাহারা দুই দল সৈন্য পাঠাইতেছে। ২রা নভেম্বর রুষ দূত পারস্যের বৈদেশিক সচিবকে বলিল যে, টিহারাণের অন্তর্গত সাউ-স-সুলতানের

আর্মেনিয়া
তেহারণ
ইস্পাহান
শিরাজ
আফগানিস্থান
ইংলিস মাইল
০ ২০০ ৫০০ ১০০০
আরব
৫০°
৬০°
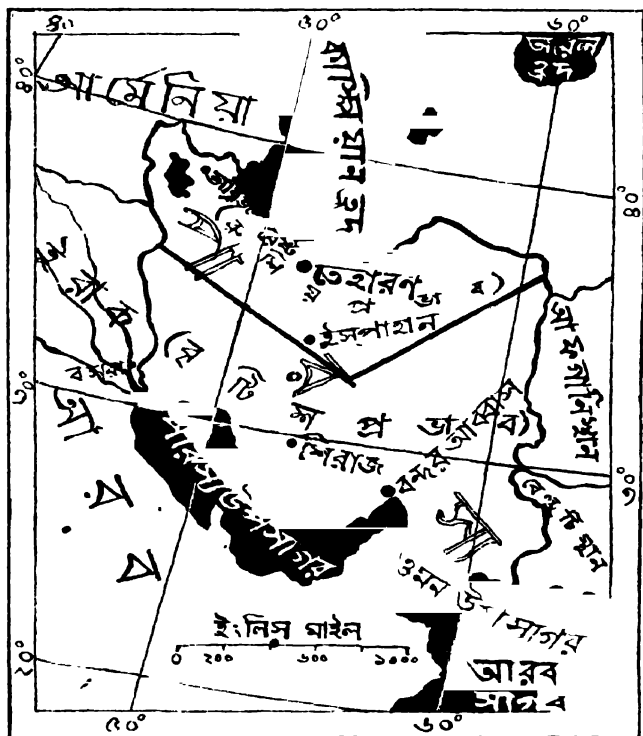
প্রসাদ হইতে সামরিক পুলিশ উঠাইয়া আনিতে হইবে এবং রুষ বণিজ্য-দূতকে অপমান করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। রুষ বাণিজ্য দূতই সাউ-স-সুলতানের প্রাসাদ দখলে পারসিক সরকারকে বাধা দিয়াছে। বাস্তবিক সেই পারসিক সরকারের অপমান করিয়াছে এবং তাহারই সে জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু উল্টা দাবী এরা করিল। রুষিয়ার এই দাবীর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ত' তাহাদের নাই—অথচ এই অন্যায় দাবী পূরণ করাও উচিত নয়। কিন্তু সময় মত এই দাবী পূরণ না করিলে রুষ সৈন্য পারস্যের বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিবে—নূতন সৈন্য রুষিয়া হইতে পারস্যের দিকে আসিতেছে। অগত্যা তাহারা ইংরাজ বৈদেশিক মন্ত্রী গ্রের নিকট পরামর্শ চাহিল। রুষিয়ার দাবী পূরণ করার পরামর্শ দিয়া তিনি টেলিগ্রাম করিলেন। পারস্যের ইংরাজ দূতের মারফৎ তিনি জানাইলেন যে এই দাবী পূরণের পর রুষিয়া নিজ সৈন্য উঠাইয়া লইবে। অগত্যা সাউ-স-সুলতানের গৃহ ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং পারস্যের বৈদেশিক মন্ত্রী নিজে রুষদূতের অফিসে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিলেন। কিন্তু রুষিয়া চায় বিবাদ। তাই তাহারা একটু অপ্রস্তুত হইল। রুষদূত তখন বৈদেশিক মন্ত্রীকে জানাইয়া দিল যে ২।৪ দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় চরম পত্র যাইবে।

ঠিক ৫ দিন পরে, ২৯শে নবেম্বর রুষিয়ার দ্বিতীয় চরম পত্র (Ultimatum) আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তিনটি

দাবী করিল ; (১) শাষ্টার ও লিকফ্রেকে (Lecoffre) বরখাস্ত করিতে হইবে (২) রুষ ও ইংরাজ সরকারের অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন বৈদেশিককে পারসিক সরকার নিযুক্ত করিতে পারিবে না (৩) বর্ত্তমানে যে রুষ সৈন্য পারস্যে পাঠান হইয়াছে, তাহার ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে ; কত টাকা এবং কিভাবে দিতে হইবে তাহা পরে জানান হইবে ; ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে "হাঁ" কি "না" জবাব দিতে হইবে। এই বিপদের সময় গ্রে (Grey) তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেলেন। বরং তিনি পার্লামেণ্টে স্বীকার পাইলেন যে ক্ষতিপূরণের দাবী ভিন্ন অন্য দুইটাতে ইংরাজ সরকার ও রুষ সরকার এক মত।

দেশে তখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে ; মন্ত্রী-সভা নিরাশায়, ভয়ে ও প্রলোভনে—রুষিয়া ও মহম্মদ আলির পক্ষ টানিতে লাগিল। অনেক গণ্যমান্য লোক মহম্মদ আলির হইয়া রুষিয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। আলা-উদ্দুল্লা তাহাদের অন্যতম। এমন সময় ৩০শে নবেম্বর, গুপ্ত সমিতির লোকেরা তাহাকে গুলি করিয়া মারিল। মহম্মদ আলির ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মুশিরুস-সুলতানকেও হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। তিনি আহত হইয়াই অব্যাহতি পাইলেন।

গুপ্ত সমিতির এই কাজের ফলে সাধারণ লোকের মনে আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল এবং বিশ্বাসঘাতক অভিজাত ও মন্ত্রী-দের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আলা-উদ্দুল্লা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী সম সমু-সলতনার বন্ধু। তিনি এই কাণ্ডে ভয়ানক

উত্তেজিত হইলেন—উত্তেজনার মুখে বলিলেন, "এই জন্য অন্ততঃ ২০ জন গণতন্ত্রীকে হত্যা করিব।"

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী-সভার মত হইল যে রুষিয়ার দাবী মানিয়া লইবে। কিন্তু মজলিসের সভ্যরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। রুষিয়ার নির্দ্দিষ্ট ৪৮ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বে মজলিস বসিল। প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, রুষিয়ার দাবী মানিয়া লওয়া হউক। সমস্ত সভাগৃহ নিস্তব্ধ—কেহ একটি কথা বলে না। ৮০ জনের মধ্যে ৭৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিল—সকলেই চুপ। কিছু পরে এক মোল্লা উঠিয়া বলিলেন :--"আল্লার ইচ্ছা হইলে, আমাদের স্বাধীনতা যাইবে জানি; কিন্তু আমরা যেন স্বহস্তে দাসখত লিখিয়া না দেই।" এই দুইটি কথা বলিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। একে একে সকলেই তাহাকে সমর্থন করিল—একটি সভ্যও মন্ত্রী-সভার প্রস্তাব সমর্থন করিল না। বাহিরে বিরাট জনতা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ভিতরেও সভ্যদের জয় উল্লাস। মন্ত্রিগণ ভয়ে, অপমানে ও লজ্জায় কোন ক্রমে পলাইয়া গেল।

রুষ ও বিলাতী দ্রব্য বয়কট করা হইল। রুষ কোম্পানীর পরিচালিত ট্রাম গাড়ীও বয়কট করা হইল,—রাস্তা দিয়া শূন্য গাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। অতর্কিত ভাবে কেহ ট্রামে উঠিলে, লোকেরা আসিয়া তাহাকে টানিয়া নামাইত; যে সব দোকানে রুষ বা বিলাতী দ্রব্য সাজান ছিল, তাহাদের দরজা জানালায় ঢিল মারা হইতে লাগিল, চা পান বন্ধ হইল। অপর

দিকে রুষ পক্ষ যাকে তাকে অপমান ও অত্যাচার করিতে লাগিল। শাষ্টারকে হত্যা করার চেষ্টাও হইতে লাগিল। বহুবার গুপ্ত সমিতির লোকেরা তাহাকে সাবধান করিয়া বাঁচাইয়াছে। পারসিক রমণীগণও এই সময় তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু এদিকে, পরাজিত মন্ত্রী-সভা রুষের নিকট আত্মবিক্রয় করিল। রুষের অর্থ ও রুষের সৈন্যবল তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিল। ১৯১১ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, মন্ত্রীরা সৈন্য দিয়া জোর করিয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া দিল—সভাগৃহ হইতে সভ্যদের বাহির করিয়া দিয়া, তাহারা দরজা তালাবন্ধ করিয়া দিল। কার্য্যতঃ পারস্যের স্বাধীনতা লোপ পাইল—ইহার পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে রুষ ও ইংরাজের দাসী হইয়া থাকিতেই হইল।

এই ঘটনার পরও রুষ সৈন্য পারস্য হইতে স্থানান্তরিত করা হইল না। ১২০০০ হাজার রুষ সৈন্য উত্তর পারস্যে খৃষ্টীয় সভ্যতার নিদর্শন দিতেছিল। জাতীয় দলের উপর এখন রুষিয়া প্রতিশোধ তুলিতে লাগিল। তাহার প্রথম নজর পড়িল, তাব্রিজের উপর। কারণ তাব্রিজই জাতীয় দলের প্রধান আড্ডা। রুষিয়ার কামান ও সুশিক্ষিত সৈন্যদের প্রতিরোধ করিয়া, তাব্রিজবাসীরা পরাজিত হইল। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেহই রুষ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহাদের অত্যাচারে টিহারাণের রুষদূত পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এই সব অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি তাব্রিজের রুষ সেনা-

পতিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু রুষ সেনাপতি উত্তর দিলেন তিনি খাস রুষ সরকারের অধীন টিহারাণের রুষদূতের হুকুম মানিতে বাধ্য নন। পারসিক নব বৎসরে (১০ই মহরম) তাব্রিজের প্রধান মোল্লার ফাঁসী হইল। সেণ্টপিটার্স-বার্গের বৈদেশিক মন্ত্রী এই সময় এক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন, "পারস্য হইতে এই গণতন্ত্রী আবর্জ্জনা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত, রুষিয়া নিজ হস্তে প্রতিশোধ লইবে।" রুষিয়া যে নির্ম্মমতম অত্যাচার করিতে সক্ষম, তার প্রমাণ পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮১ অব্দে ডেঙ্ঘিল তেপ (Denghil Tepe) নামক স্থানে ৮০০০ হাজার নিরস্ত্র তুর্কমানকে রুষ সেনাপতি স্কবিলফ (Skabeloff) হত্যা করিয়াছে; ১৯০০ অব্দে ব্লাগোভেষ্ট চেঙ্ক (Blago Vest Chang) নামক নগরের সমস্ত চীন অধিবাসীদের হিম-শীতল আমুর নদীর মধ্যে ফেলিয়া হত্যা করিয়াছে। সকলেই বুঝিল রুষিয়ার পক্ষে কোন প্রকার অত্যাচার করাই অসম্ভব নয়। বিশেষ এই ক্ষেত্রে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম প্রাচ্যশক্তি ইংরাজ, তাহার পৃষ্ঠপোষক। বেত্রাঘাত, বন্দুক, কামান, ফাঁসীকাষ্ঠ, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ, সবই তাব্রিজে চলিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় জাতীয় দলের অন্য দুই আড্ডা রেষ্ট ও এঞ্জেলির লোকদের উপরও ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল।

উত্তরে রুষ সৈন্য ও দক্ষিণে ইংরাজ সৈন্য পারস্য দখল করিয়া আছে। শাষ্টারের স্থানে ইংরাজ ও রুষের হাতের পুতুল বেল-

জিয়ান মর্ণার্ড কোষাধ্যক্ষ হইলেন। ইংরাজ ও রুষের প্রধান লক্ষ্য ছিল যেন পারস্যের আর্থিক অবস্থার কোন প্রকার সুব্যবস্থা না হয়। মর্ণার্ড কোষাধ্যক্ষ হইলে কার্য্যতঃ ইংরাজও রুষের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে। ইহার উপর রুষিয়া দাবী করিল যে ককেশাস হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত একটা রেল লাইন তাহারা খুলিবে এবং এই লাইন পারস্য সরকারের Guaranteed line * হইবে। রুষিয়া জানিত এই লাইন হইতে লাভ হওয়া সম্ভব নয়; অথচ এই লাইনের সাহায্যে রুষিয়া হইতে সহজে সৈন্য আনিয়া পারস্যকে নিজের তাবে রাখা যাইবে। তাই সে সর্ত্ত করিয়া লইল যে লোকসানের টাকাটা পারস্যই পূরণ করিয়া দিবে। অর্থাৎ পারস্যকে আদেশ দেওয়া হইল "আমি তোকে শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিব, সেই শৃঙ্খল গড়ার খরচ তোকেই দিতে হইবে।" অন্য সময় হইলে ইংল্যাণ্ড এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিত, কারণ তাবার রাজ্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে রুষ সৈন্য আসিতে পারে, ইহা তাহাদের পক্ষে মোটেও নিরাপদ নহে। কিন্তু এখন দুই চোরে মাসতুত ভাই—তাই কেহই কাহারও কোন কাজেই কোন প্রতিবাদ করে না।

পারস্যের প্রতি দয়া (?) করিয়া ইংল্যাণ্ড ও রুষিয়া পারস্যকে ২ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিল—শতকরা ৭ পাউণ্ড হারে সুদ

---

* অর্থাৎ ঐ লাইনে লোকসান হইলে পারস্য সরকার ক্ষতিপূরণ করিবে।

দিতে হইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে অন্য যে সব সর্ত্ত রহিল, তাহার ফলে পারস্যের স্বাধীনতা লোপ পাইল। (১) এই টাকা ও তাহার সুদ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ পারস্যের বাণিজ্য শুল্ক (customs) ইংরাজ ও রুষ লইবে। (২) কোষাধ্যক্ষ মর্ণার্ডের হাতে এই টাকা ব্যয়ের ভার থাকিবে। পারসিক মন্ত্রী-সভা এবং ইংরাজ ও রুষ দূতের অনুমতি লইয়া তিনি এই টাকা ব্যয় করিবেন। (৩) ১৯০৭ অব্দের ইংরাজ-রুষ চুক্তির সর্ত্ত মানিয়া পারস্যকে চলিতে হইবে। (৪) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। (৫) ইংরাজ ও রুষ দূতের মত লইয়া, একটী ছোট সৈন্যদল গঠন করিতে হইবে। (৬) মহম্মদ আলি ও তাহার অনুচরদের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিতে হইবে (amnesty) এবং মহম্মদ আলিকে পেন্সন দিতে হইবে। ১৯১২ খৃঃ অব্দের ২০শে মার্চ্চ পারস্য এই সব সর্ত্তে ঋণ গ্রহণ করিল। ইহার ফলে কার্য্যতঃ পারস্যের স্বাধীনতা লোপ পাইল। এই একই বৎসরে আরও দুইটি মুসলমান রাজ্য স্বাধীনতা হারাইল। ১৯০৪ অব্দে ইংরাজ ফরাসীদের সহিত ব্যবস্থা করিল, মিশর সম্বন্ধে ইংরাজ যাহা খুসী করিবে এবং মরোক্কো সম্বন্ধে ফরাসী যাহা খুসী করিবে। কিন্তু ইটালী বলিল, "বাঃ, আমি কেন ফাঁকে যাইব।" ইটালীকে বলা হইল, "আচ্ছা ভাই, তুমি ত্রিপলিতে (Tripoli) যাহা খুসী করিতে পার।" ১৯২২ খৃঃ অব্দে ফরাসী মরোক্কোকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিল; এই বৎসরেই ইটালী ত্রিপলি উদরস্থ করে। যীশুখৃষ্ট

উপদেশ দিয়াছিলেন "Thou shalt not steal"—"তোমরা চুরি করিওনা।" সুসভ্য খ্রীষ্টান ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স রুষিয়া, ইটালী তাঁহার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।
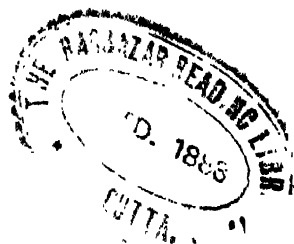
পারস্যের রমণী

বাঙ্গলার কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

পারসিকগণ এই কথা বেশ ভাল রকমই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও পারসিক ললনাগণ পারস্যের এই নব জাগরণে দেশবাসীদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। যখনই পুরুষগণ অতি-বিবেচক হইতে যাইয়া সংশয় দোলায় দোল খাইয়াছে তখনই রমণীগণ তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান করিয়া দিয়াছে। এক টিহারাণেই পারসিক রমণীদের প্রায় ১২টি গুপ্ত সমিতি ছিল। ১৯০৭ খৃঃ অব্দ হইতেই পারসিক

রমণীদের রাজনৈতিক কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাদের এই নব জাগ্রত স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায়, তাহারা মুসলমান সমাজের অনেক সামাজিক প্রথাকেও অবহেলা করিয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনী ঘরের রমণীগণও এই সব গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীরা যখন ভয়ে বা লোভে স্বদেশের প্রতিকূল কার্য্য করিতে চাহিত, তখন অনেক সময় তাহাদের স্ত্রীরা তাহা-দিগকে কর্ত্তব্যের পথে ফিরাইয়া আনিত।

শাষ্টার তাঁহার গ্রন্থে (strangling of Persia) পারসিক রমণীদের কার্য্যের ২।৪টা উদাহরণ দিয়াছেন। তাহারই কয়েকটা নীচে দিলাম।

একদিন তাহারই অধীনস্থ একটি যুবক কর্ম্মচারী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। সেই যুবকটি তাঁহাকে ফরাসী ভাষায় বলিল, "আমার মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া-ছেন।" তারপর সে বলিল, যে অমুক বড়লোক শাষ্টারের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিবে কিন্তু শাষ্টারের স্ত্রী যদি সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে না যান তবে লোকে শাষ্টারকে সন্দেহ করিবে এবং এই মতলবেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। পরে শাষ্টার সব ঘটনা জানিতে পারিয়া সেই যুবককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার মাতা কি করিয়া অন্যের পারিবারিক এই ঘটনা জানিলেন। সেই যুবক বলিল যে তাহার মা এক গুপ্ত সমিতির সভ্য এবং সেই সভা হইতে এই খবর তিনি পাইয়াছেন।

যখন মহম্মদ আলি পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তখন নূতন দেশরক্ষক স্বেচ্ছাসেবকদের খরচের জন্য সরকারের অর্থাভাব খুব বেশী হয়। তাই বহু পারসিকের পেন্‌সন্ (Pension) কয়েক মাস দেওয়া হয় নাই। মহম্মদ আলির এক পৃষ্ঠপোষক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শাষ্টারকে জব্দ করার চেষ্টা করে। পেন্‌সন্ ভোগীদের পরিবারস্থ একদল স্ত্রীলোককে হাত করিয়া সে শাষ্টারের গৃহের নিকট যাইয়া হল্লা করিতে বলে। শাষ্টার সেই রমণীদলকে বলিলেন পরদিন তাঁহারা জবাব পাইবেন। পরদিন শাষ্টার রমণীদের এক গুপ্ত সমিতিতে সরকারের আর্থিক অবস্থা সব জানাইয়া খবর পাঠাইলেন যে এখন পেন্‌সন্ দিলে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। ইহার পর আর কোন রমণীই পেন্‌সনের জন্য গোলমাল করেন নাই।

মহম্মদ আলির ভ্রাতা সাউস-সালতানার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া রুষিয়ার সহিত যে গোলমাল হইয়াছিল পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। যখন এক রুষ ব্যাঙ্ক দাবী করিল যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের নিকট বন্ধক দেওয়া আছে, পারসিকদের হাতে তখন এমন কোন প্রমাণই ছিল না যাহার বলে তাহারা রুষের এই মিথ্যা দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারে। এমন সময় সাউস-সালতানার এক স্ত্রী শাষ্টারের নিকট সাউস-সালতানার এক উইল পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই উইলে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা দিয়াছে এবং তাহার কতক তাহার এই স্ত্রীকেও দান করিয়াছে। এই উইল হইতেই প্রমাণিত

হইল যে রুষের দাবী সবই মিথ্যা ও জাল। এই মহিলা জানিতেন রুষ-ব্যাঙ্কের এই দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাঁহারও লাভ এবং পারসিক সরকার যদি এই দাবী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে, তবে তাহারও লোকসান। তবু নিজের ব্যক্তিগত লোকসান স্বীকার করিয়াও তিনি জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য সে উইলখানা শাষ্টারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নিজের বা সন্তানের আর্থিক ক্ষতি ভিন্ন আরও বিপদ এই কাজে ছিল,— রুষ সরকারের বিরাগ ভাজন হওয়ার গুরুতর শাস্তি পারসিকগণ তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু পারসিক রমণীদের সবচেয়ে বড় ও গৌরবের কাজের বিবরণ নীচে দেওয়া হইল। রুষিয়ার রুদ্র দৃষ্টির সম্মুখে যখন মজলিসের সভ্যরা ভয়ে কাঁপিতে ছিল, তখন রমণীগণই পারসিক জাতির মান সম্ভ্রম রক্ষা করিল। মজলিসের একদল সভ্যের মত ছিল রুষিয়ার দাবী মানিয়া লওয়াই সঙ্গত। দেশের লোক এই বিপদে কোন পথই দেখিতে পাইল না। একদিন ৩০০ শত পারসিক রমণী কাল পোষাক ও মুখে বরখা পরিয়া মজলিস-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। অনেকের হাতে রিভলভারও ছিল। মজলিসের সভাপতি এক ভিন্ন গৃহে কয়েকটি রমণীর সহিত আলাপ করিতে গেলেন। রমণীগণ মুখের বরখা খুলিয়া ফেলিল এবং রিভলভার বাহির করিয়া বলিল, "যদি দেশের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য দরকার হয়, তবে নিজেদের স্বামী-পুত্র, ভ্রাতা পিতাকেও হত্যা করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।" ইহার পর

মজলিস আর রুষিয়ার দাবী সমর্থন করিতে সাহস করিল না। অবশ্য রুষিয়া জোর করিয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করিল এবং মজলিস ভাঙ্গিয়া দিল; পারসিক রমণীগণ শেষ পর্য্যন্ত এত করিয়াও পারস্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় মজলিস ও পারসিক জাতিকে স্বদেশদ্রোহী সাজিতে হয় নাই।

মহাযুদ্ধের পর

১৯১২ খৃঃ অব্দে ইংল্যাণ্ড ও রুষিয়া যে সব সর্ত্তে পারস্যকে বাঁধিল, তার ফলে প্রকৃত পক্ষে পারস্যে স্বাধীনতা প্রায় লোপ পাইল। দেশের যুবকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ রহিয়া গেল, কিন্তু তার বিশেষ প্রকাশ দেখা গেল না। ইতি মধ্যে ১৯১৪ অব্দের জার্ম্মেণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুরস্কও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মেণীর সহিত যোগ দিল। মিত্রশক্তিদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স রুষিয়া ও ইটালী একে একে পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি গ্রাস করিয়াছে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে কার্য্যতঃ একটিও মুসলমান রাষ্ট্র ছিল না। সবগুলিই ঐ ৪ জাতির বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কাজেই পারস্য কোন ক্রমেই মিত্রশক্তির প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতে পারে না। ইংল্যাণ্ড ও রুষিয়া তাহা বুঝিল। ইংল্যাণ্ডের

আশঙ্কা আরও বেশী। যদি পারস্য জার্ম্মেণীকে পরোক্ষভাবেও সাহায্য করে, তবেও ইংল্যাণ্ডের সোনার খনি ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে। তাই পারস্যের উপর তাহার প্রভুত্ব দৃঢ় করার জন্য সে পারস্যে নূতন সৈন্য আমদানী করিল। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ পারস্যে এবং পারস্য উপসাগরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও, পারস্যের উপর জার্ম্মেণ প্রভাব বন্ধ করা গেল না। পারস্যের যুবকগণ বেশ ভাল রকমেই জানিত, কে তাহাদের শত্রু। তাহারা একদিকে জার্ম্মেণীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, অপর দিকে দেশের ভিতরই তাহারা নানারকমে ইংরাজ ও রুষ শক্তিকে বিব্রত করিতে লাগিল। ইস্‌পাহানে রুষ সহকারী কন্‌সালকে হত্যা করা হইল এবং প্রধান ইংরেজ কন্‌সালকে আহত করে; তাঁহার এক চর ষড়যন্ত্রকারীদের গুলিতে মারা যায়। সিরাজে ইংরাজ সহকারী কন্‌সাল হত হইলেন এবং কন্‌সাল ও অন্য সমস্ত ইংরাজ পুরুষ বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হয়। তখন ইংরাজ ও রুষ সরকার নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে। এই সময় এই দুই শক্তি পারস্যে যা সব করিয়াছে, তাতে মনে হয় না যে পারস্য তখন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। সরকার ইহাদের ঐ সব অনাচারের কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্তও করিল না। যুবকগণ ইহাতে আরও ক্ষেপিয়া গেল।

এই সময় দুটা নূতন কাণ্ড হইল—এক হইল রুষিয়ার বলসেভিক বিপ্লব এবং পারস্যে দুর্ভিক্ষ।

১৯১৭ অব্দে পারস্যে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ হয়। পারস্যের বালক সম্রাট আম্মেদ শাহ্ প্রজাদের দুর্দ্দশা অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়া নিজের ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দেশের নানা স্থান হইতে বহু শস্য সংগ্রহ করিয়া, তিনি অত্যধিক উচ্চমূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া এই সময় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই হইল দেশের রাজার আচরণ; অথচ এই রাজার প্রতি যদি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব হয়, তবেই আইন অনুসারে তা রাজদ্রোহ ও দণ্ডনীয়। সব দেশেই এই হইল আইন। আম্মেদ শাহ এই পৈশাচিক আচরণে নিজের সর্ব্বনাশের বীজ বপণ করিলেন। এই দুর্ভিক্ষে বহু পারসিক প্রাণত্যাগ করিল, বহু লোক চিরকালের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রহিল।

বলশেভিক বিদ্রোহের ফলে, পারস্য হইতে রুষ শক্তি প্রায় লোপ পাইল। কতকটা অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও কতকটা বিদেশীদের প্রতি ন্যায্য ও সহৃদয় ব্যবহার করার অনিচ্ছায় বলশেভিকগণ পারস্যের কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিত না। ইংরাজের পক্ষে ইহা একটা সুযোগ—এতদিন রুষিয়ার ঈর্ষায় সে যা করিতে পারে নাই এবার তাহার পক্ষে তা সহজসাধ্য হইল। ১৯০৯ অব্দে রুষিয়ায় আবার যে সন্ধি হইয়াছিল, তা অগ্রাহ্য করিয়া, ইংল্যাণ্ড সমস্ত পারস্য ও মধ্য-এশিয়ায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

রেজা খাঁ পেহ্লবি

ইংল্যাণ্ড ও রুষিয়া যখন নিজেদের সুবিধামত পারস্য বণ্টন করিল (১৯০৭), তখন হইতে দক্ষিণ পারস্য ও উত্তর পারস্য পর্য্যায়ক্রমে ইংল্যাণ্ডের ও রুষিয়ার অধীন হইল। উত্তর পারস্যে একদল পারসীক কসাক সৈন্য ছিল—তাহাদের বেতন দেওয়া হইত পারসীক রাজ-তহবীল হইতে ; অথচ তাহারা রুষ সেনাপতির অধীন থাকিয়া কার্য্যতঃ রুষিয়ারই স্বার্থরক্ষা করিত। ১৯১৭ অব্দের বলশেভিক বিদ্রোহের পর রুষ সরকার (অর্থাৎ সোভিয়েট সরকার) এই সৈন্যদলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করে। পারস্যের অর্থে পুষ্ট পারসীক সৈন্যদল রুষিয়ার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পারস্যের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রতিরোধ করিবে, এই অন্যায় ব্যবস্থা বলশেভিকগণ পছন্দ করিল না। বলশেভিক বিদ্রোহের পরে রুষিয়ার সহিত সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল—তাই উত্তর পারস্যে বাণিজ্য শুল্ক প্রায় কিছুই অদায় হইত না। এই অবসরে এই সৈন্যদলের বেতন যোগান পারসীক সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় ইংরাজ সরকার এক ফন্দি আটিল। পারসীক কসাকদের রুষ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সবই রাজ-তান্ত্রিক। তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই—এই বলশেভিক-দ্বেষী রুষ সেনাধ্যক্ষদের হাতে রাখিতে পারিলে জার্ম্মেণ, তুরস্ক ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান যাইবে এই ভরসায় ইংরাজ সরকার তাহাদের বেতন যোগাইতে লাগিল। যুদ্ধ বিরতির পরও বলশেভিকদের প্রতি বিরুদ্ধা-চরণে কাজে লাগিবে, এই আশায় তাহারা এই সৈন্য-

দলের বেতন দিতে লাগিল। এই ভাবে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত চলিল।

এই সময় নিজেদের প্রভুত্ব পাকা করার জন্য, ইংরাজগণ অন্য এক ব্যবস্থা করিল। তাহারা পারস্যের সহিত সন্ধি করিল যে ইংরাজ সেনাপতিরা পারস্যে সমস্ত সামরিক বিভাগের চালক ও নিয়ামক হইবে এবং পারস্যের অর্থ ব্যবস্থাও (finance) ইংরাজের হাতে থাকিবে।

এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইলে পারস্য কার্য্যতঃ নিজাম, বিকানির, মহিশুর প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যের চেয়েও ইংরাজের বেশী অধীন হইত। কিন্তু পারসীক মজলিস এই সন্ধিসর্ত্ত অনুমোদন করিল না। পারসীক মজলিসের আপত্তিতেও হয়ত ইংরাজরা দমিত না, কিন্তু তাহাদের অর্থে পুষ্ট রুষ সেনাধ্যক্ষগণও এই সন্ধির প্রতিবাদ করিল, কারণ এই সন্ধি হইলে পর তাহাদের ভাত মারা যাইবে। ইংরাজরা দেখিল এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কসাক সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য্য এবং সম্ভবতঃ পারসীকগণ এবং বলশেভিকগণও এই যুদ্ধে যোগ দিবে। তখন উত্তর পারস্যে ইংরাজের খাস সৈন্যও ছিল; পারসীক কসাক সৈন্যও ছিল এবং একদল বলশেভিক সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বলশেভিকগণ কাস্পিয়ানের কূলে এঞ্জেলিতে (Enzeli) অবতরণ করিয়া, রেষ্ট (Resht) পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। পারসীক কসাক সৈন্যদল ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণে চলিয়া যায়। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যগণ তখনও উত্তরে

রহিল। বলশেভিক সৈন্যও আর অগ্রসর হইল না। তখন ইংরাজ সেনাপতি আয়রনসাইড (General Ironside) আহম্মেদ শাহের (Ahmed Shah) নিকট চরম লিপি (ultimatum) পাঠাইলেন—তিনি দাবী করিলেন যে পারসীক কসাক সৈন্যদের রুষ-সেনাপতিদিগকে বরখাস্ত করিতেই হইবে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণ সাহ রুষ সেনাপতিদিগকে বিদায় দিলেন—কারণ ইংরাজের স্বার্থ ও ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধি পারস্য সরকারের সহিত হয় নাই বলাই উচিৎ। পারসীক রাষ্ট্র-দায়িত্ব সেই সময় তিনটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় পারসীকদের হাতে ছিল। তাহারা এই সন্ধি সর্ত্তে মত দিল। এই সন্ধি যে পারসীক জাতি অনুমোদন করিতে পারে না, তাহা ভারতীয় সরকার পর্য্যন্ত বুঝিল এবং ইংল্যাণ্ডের পর-রাষ্ট্র বিভাগকে (Foreign office) তাহাদের এই মত জানাইল। কিন্তু পর-রাষ্ট্র বিভাগ তাহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া এই সন্ধি করিল।

রেজা খাঁর অভ্যুদয়

পারস্যের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী ভস্‌সাগ-এদ-দৌল্লা (Vossug-ed-Doullah), রাজস্ব-মন্ত্রী প্রিন্স ফিরাজ (Prince Firuz) এবং সালাম এজ দৌল্লা এই সন্ধি সাক্ষর করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে নাকি ৭৫০০০ টোমান অর্থাৎ—৫২৫০০০৲ পাইয়াছেন। মজলিসের সভ্যরাও নাকি প্রচুর অর্থ পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইংল্যাণ্ড প্রতিমাসে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬০ লক্ষ টাকা পারস্যে ব্যয় করিত। এত অর্থব্যয় কিসের জন্য? যে মতলবই থাক না কেন, সবই ব্যর্থ হইল। সমস্ত পারসীক জাতি ঐ মন্ত্রী ত্রয়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া রহিল।

উত্তর পারস্যে ধীরে ধীরে এক শক্তিমান পুরুষের অভ্যুদয় হইতেছিল। রুষ কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করাইয়া, ইংরাজরাই

পারসীক কসাক বাহিনীর ভার গ্রহণ করিল। পারসীক সৈন্ত দিগকে তুষ্ট রাখার জন্ত ইংরাজ কর্ণেল রেজা খাঁ নামক একজন পারসীক সেনাপতির উপর তাহাদের নেতৃত্বভার স্থাপন করে; চতুর রেজা খাঁ ইংরাজের পূর্ণ প্রভাব হইতে দূরে থাকার জন্ত কেসভিনে নিজের আড্ডা স্থাপন করিলেন।

এই সময় তিহারাণে সৈয়দ সেখ তৈ-এদ-দিন (Tai-ed-Din) নামে একজন সংবাদপত্র সম্পাদক ছিলেন। শার্ক (Sahrq) অর্থাৎ 'প্রাচ্য', নামক এক কাগজের তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে দেশের দুর্দ্দশার কথা তিনি অগ্নিবর্ষী ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সরকার এই কাগজ বন্ধ করিয়া দিল। পরদিনই বার্ক (Barq) অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ' নামে তিনি এক কাগজ প্রকাশ করেন। এই সব হইল যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা। কিছুদিন পরে এই কাগজও সরকার বন্ধ করে। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি 'রাদ' (Raad) অর্থাৎ 'বজ্র' নামে আর এক কাগজ বাহির করেন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হাব্ল-উল-মাতিন (Habl -ul-Matin) নামক কাগজ এক সময় পারসীক ভাষায় কাগজের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত ও বেশী প্রচারিত ছিল। যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের আদেশে 'হাব্ল উল-মাতিন বন্ধ হইয়া যায়। তখন 'রাদ'ই সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রচারিত পারসীক কাগজ। 'রাদে'র বজ্রবাণীতে পারসীকদের সুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রেজা খাঁ নিজে 'রাদ' কাগজের একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন।

জৈ-এদ-দীন বুঝিলেন যে এই সৈন্যদলকে হাত করিয়া অনেক কাজ করা যাইতে পারে। তাই তিহারাণে বসিয়া অপর তিনজনের সহিত তিনি এই বিষয় যড়যন্ত্র করিয়া, রেজা খাঁর সহিত আলাপ করিলেন। রেজা খাঁও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। এক রাত্রিতে নীরবে সমস্ত কশাক সৈন্যগণ কেসভিন ত্যাগ করিয়া, তিহারাণের দিকে চলিল। রাত্রে এই খবর কেহই টের পাইল না; পরদিন ভোর বেলা লোকে সব জানিল। তখন প্রায় দুই মাস যাবৎ কেসভিন হইতে তিহারাণের পথ তুষারে আচ্ছাদিত। শীতের মধ্যে বরফের উপর দিয়া যে সৈন্য-দল তিহারাণে যুদ্ধের জন্য যাইবে, তাহা কেহ অনুমানও করে নাই। অতর্কিত ভাবে একদিন তাহারা তিহারাণের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই ভোরেই পারসীক সরকার লোপ পাইল। রাজার পৃষ্ঠপোষক সর্দ্দারগণ সব বন্দী হইল। সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা কশাক সৈন্যদের হাতে আসিল। জৈ-এদ-দীন * প্রধান মন্ত্রী হইলেন এবং রেজা খাঁ প্রধান সেনাপতি হইলেন (২২শে ফেব্রুয়ারী—১৯২১)।

জৈ-এদ-দীন ইংরাজের প্রস্তাবিক সন্ধিপত্র নাকচ করিলেন, কিন্তু মোটের উপর তিনি ইংরাজের পক্ষপাতীই ছিলেন তখনও তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পারসীক সৈন্যদলের সংস্কার করেন। কিন্তু দেশের লোক এই প্রচেষ্টার

* অনেকে ইহাকে জেই-এদ-দীন (Zai-ed-Din) নামেও লিখিয়াছেন।

ঘোর বিরোধী, অথচ ইংরেজের ভয়ে বিশেষ কিছু করিতেও পারে না। কিছুদিন যাবৎ বিলাতের পার্লেমেণ্ট সভায় সামরিক খরচ কমাইবার জন্য খুব আন্দোলন চলিতেছিল; এই আন্দোলনের ফলে মে মাসে পারস্য হইতে ইংরাজের উত্তর-পারসীক বাহিনী (North Persian Force) সরান হইল। মে মাস শেষ হইতে না হইতেই তৈ-এদ-দীনের পক্ষে পারস্য-বাস অসম্ভব হইল। ইংরাজের বন্ধু ইংরাজ সৈন্য সাহায্য ভিন্ন দেশে টিকিতে পারিলেন না। তিনি পালাইয়া জেনেভাতে আশ্রয় লইলেন। এখন হইতে রেজা খাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন—প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি উভয় পদই তাঁহার। এই সময় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পারস্যের ভিতরেও বহু স্থলেই পারসীক সরকারের আদেশ মান্য হইত না—দেশের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ও শাসনই ছিল না। তিনি বুঝিলেন বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, এখন দেশের মধ্যে রাষ্ট্রকে সর্ব্বজন মান্য করা বিশেষ দরকার এবং সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে দরকার কেন্দ্র সরকারকে শক্তিশালী করা। কিন্তু দেশের সামরিক শক্তি সংগঠনের জন্য তিনি কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। ইহার ফলে জাতির মনে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইল এবং অনেক কম খরচেই কার্য্য সাধিত হইল।

পারসীক সৈন্যগণ প্রায়ই সময় মত নিজেদের বেতন, খোরাক, পোষাক পাইত না। তাই তাহারাও সদাই অসন্তুষ্ট থাকিত।

অসন্তুষ্ট সৈন্যদল দিয়া যুদ্ধ করা পোষায় না, এমন কি বিবাহের শোভাযাত্রাও পোষায় না; কারণ শত্রুপক্ষের অর্থে বশীভূত বা নিজেদের ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা যে কোন সময় প্রভুর শরীরেও অস্ত্রক্ষেপ করিতে পারে। রেজা খাঁর আমলে সৈন্যেরা সময়মত বেতন, খোরাক ও পোষাক পাইতে লাগিল। এই ভাবে সৈন্যদিগকে তুষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের দিকে মন দিলেন।

উত্তর পারস্যের বিখ্যাত দস্যুপতি কুচিক খাঁ (Kutchik Khan) উত্তর পারস্যে এক স্বাধীন সোভিয়েট গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া, নিজে তাহার গণনায়ক হয়। কুচিক খাঁ আদতে দস্যু; দস্যুবৃত্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য; ঐ সবই বাজে ভড়ং। রেজা খাঁ তাহাকে দমন করেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দে গ্রীষ্মকালে মেষেদে (Meshed) এক বিদ্রোহ হয়; রেজা খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহ নায়কদিগকে হত্যা করেন। তুর্ক-পারস্য সীমান্তে কুর্দ নায়ক সিমকো (Simko) বিদ্রোহী হন; কিন্তু রেজা খাঁর নিকট পরাজিত হইয়া তিনি স্থলেমানিয়াতে (Suleimanieh) পালাইয়া যান। দুর্দ্দান্ত বক্তিয়ারীদের দুর্গ চাহার মেহাল (Chahar Mehal) কেন্দ্র সরকারের সৈন্যরা দখল করিল। বাধ্য হইয়া বক্তিয়ারীরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া বকেয়া খাজনা দিতে রাজী হইল। কাষগেইসগণও (Kashgais) পরাজিত হইয়া নিজেদের ভাবী সদাচরণের জন্য তিহারাণে প্রতিভূ রাখিল। মোহাম্মেরার সেখ বহুকাল যাবৎ পারসীক সরকারকে

অগ্রাহ্য করিতেছিল; সে প্রায় অর্দ্ধ-স্বাধীন ভাবেই থাকিত। বহুদিনের যুদ্ধের পর সেও কেন্দ্র সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিল। লুরিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশও কেন্দ্র সরকারের বিশেষ অনুগত ছিল না; রেজা খাঁর আমলে ঐ সব প্রদেশও বশ্যতা স্বীকার করিল।

এইভাবে সমস্ত পারস্যে কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইল; সমস্ত দেশ বিদেশী প্রভাব হইতেও মুক্ত হইল। বহুদিন পর আবার কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত পারসীক সরকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুসলমান জয়ের পর হইতে পারসীক জাতির অবনতি আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৮শ শতাব্দী হইতে ইউরোপীয়দের চাপে পড়িয়া পারস্য কার্য্যতঃ স্বাধীনতাও হারাইতে আরম্ভ করে। ইউরোপীয়গণ নিজেদের অর্থগৃধ্নুতার জন্য পারস্যের উপর নানা অনাচার করিয়াছে—সে সব কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন পারস্যের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্যগুলিকেও ইহারা উস্কাইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্ররোচনায়, অর্থে ও অস্ত্রের বলেই ঐ সব উপজাতি ও সর্দ্দার, পারসীক সরকারকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে ভরসা ও সাহস পাইত। বহুদিন পরে রেজা খাঁর বাহুবলের নিকট ঐ সব উপজাতি ও সর্দ্দার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

সামান্য লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া রেজা খাঁ আস্তে আস্তে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। লেখাপড়া তিনি যে খুব বেশী

জানেন তা নয়; পারসীক ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা তিনি জানেন না। সামরিক শিক্ষার জন্যও তিনি কোন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। তাই তিনি যখন কার্য্যতঃ পারসীক রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন, তখন বিদেশী দূতরা প্রায় সবাই আশা করিল যে অন্যান্য মন্ত্রীদের মত রেজা খাঁ দু দিনেই নির্ব্বাসিত হইবেন। কিন্তু রেজা খাঁ যে সাধারণ লোক নন—তাঁহার মধ্যে যে একটা সত্যিকার প্রতিভা আছে, সেটা কিছুদিন পরই তাহারা টের পাইল।

১৯২১ অব্দের জুন মাসে রেজা খাঁ পারস্যের প্রধান মন্ত্রী হন; তার পর হইতে ৪ বৎসর তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা সাধনেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল পারস্যের সামরিক বল বৃদ্ধি করা। বিদেশীদের কোন সাহায্যই তিনি পছন্দ করিতেন না এবং বিদেশীরাও তাঁহার কর্ম্মপন্থায় নানাভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কিছুতেই তিনি দমিবার নন।

জেই-এদ-দীনকে লইয়া রেজা খাঁ তিহারাণ দখল করার পরই ক্রমে তিনটী ঘটনায় আন্তর্জ্জাতিক মহলে পারস্যের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। প্রথমেই, ১৯১৯ অব্দের ইংরাজের সহিত সন্ধি নাকচ করা হয়; দ্বিতীয়, রুষিয়ার সহিত নূতন সন্ধির (১৯২১, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) সর্ত্তানুসারে রুষিয়া পারস্যকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করে এবং **extra-territorial rights** পরিত্যাগ করে। তৃতীয়, ইহার কিছু পরে আমেরিকাও

পারস্যের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং পারস্যে 'খোলা দরজা' (open door) নীতি সমর্থন করে। 'খোলা দরজা' নীতির অর্থ হইল এই যে,পারস্যে কোন রাষ্ট্রেরই কোন বিশেষ অধিকার বা দাবী থাকিবে না। সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে এবং সকলেই পারস্যের পূর্ণ স্বাধীনতা মান্য করিবে।

ইংল্যাণ্ড এই সময় একটু বিপদে পড়িল। সে বুঝিল, রেজা খাঁর সহিত ব্যবহারে তাহাকে সতর্ক হইতে হইবে। তাই কিছু দিন ইংল্যাণ্ড চুপ করিয়া সব লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং নিজের যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে তার স্বার্থ বজায় রাখার জন্য যাহা করা দরকার মাত্র তাহাই করিতে লাগিল। Anglo-Persian Oil Company, Indo-European Telegraph Company এবং Imperial Bank of Persia—প্রধানতঃ এই তিনটিই পারস্যে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ইহাদের স্বার্থরক্ষা করাই হইল তখন ইংল্যাণ্ডের প্রধান লক্ষ্য। ক্রমে অবস্থা বুঝিয়া ইংল্যাণ্ড রেজা খাঁর সহিত খাতির করিতে লাগিল। ৪ বৎসর পর যখন রেজা খাঁ পারস্যের রাজা হন তখন ইংল্যাণ্ড তাঁহার মিত্রশ্রেণীর মধ্যে।

এই সময় পারস্যের সুলতান আহাম্মদ শাহ্ ইউরোপে বিলাসে ব্যস্ত। ১৯১৭ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া, তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশেই ছিল। সেই অর্থের বলে তাঁহার বিলাসে কোন প্রকার ব্যাঘাত হইত না। দেশের প্রজারা তাঁহার উপর

কিরূপ হইতেছে, এই সংবাদ জানিয়া তিনি দেশে ফিরিবার জন্য মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। অবশেষে বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তিনি দেশে ফিরিলেন; কিন্তু বেশী দিন থাকিলেন না। অল্পদিন পরেই তিনি আবার ইউরোপে ফিরিয়া গেলেন।

দেশ একদিকে যেমন আহাম্মদ শাহের উপর অসন্তুষ্ট হইতেছিল, অপরদিকে আবার তেমনি তাহারা রেজা খাঁর প্রতি অনুরক্ত হইতেছিল। দিন দিনই রেজা খাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশে রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। নানাস্থান হইতে ব্যবসায়ীরা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য টিহারাণে টেলিগ্রাম করিতে লাগিল। টিহারাণেও সাধারণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৯২৪ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ নব নির্ব্বাচিত মজলিসের এক অধিবেশন হইল। মজলিসে হঠাৎ একটা গোলমাল আরম্ভ হইল। মুদারী নামে একটা ধর্ম্মদল ছিল। তাহাদের নেতা এই গোলমাল সৃষ্টি করিল। ক্রমে গোলমাল মজলিসের বাহিরে নগরের মধ্যেও বিস্তৃত হইল। মুদারীরা সাধারণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। তাহাদের প্ররোচনায় সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একদল লোক ক্ষেপিয়া উঠিল। কিছুদিন গোলমাল চলিল; সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা তখনকার মত স্থগিত রহিল।

মুদারী নেতার অনুচরগণ যে গোলমাল আরম্ভ করিল তার ফলে সর্দ্দার শিপে রেজা খাঁ বুঝিলেন—এখনও সময় হয় নাই। তিনি

অনতিবিলম্বে মুদারী নেতার সহিত আলাপ আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর এক ইস্তাহার জারী করা হইল যে, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করা দণ্ডার্হ। পারস্য হইতে আপাততঃ গণতন্ত্রের সব আশা দূর হইল। রেজা খাঁ তখন দেখিলেন মজলিসে তাঁহার প্রতি-পক্ষই বেশী—এই অবস্থায় রাষ্ট্র-দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব বা সঙ্গত নয়। তাই তিনি ঠিক করিলেন রাষ্ট্র-দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন। কিন্তু এই খবর রটনা হওয়াতে নানা প্রদেশ হইতে আশঙ্কাজনক সংবাদ আসিতে লাগিল। টিহারাণের কর্ত্তাদের আশঙ্কা হইল, রেজা খাঁর টিহারাণ ত্যাগের পরই বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহ করিবে এবং টিহারাণ আক্রমণ করিবে। তাই মজলিসে এই বিষয়ের অলোচনা হইল। মজলিসে এক প্রস্তাব পাশ হইল, পুনরায় রাষ্ট্র-দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রেজা খাঁকে অনুরোধ করা হউক। কিন্তু রেজা খাঁ ইহাতেও সম্মত হইলেন না; টেলিগ্রাম করিয়া ইউরোপ হইতে শাহের অনুমোদন আনান হইলে পর তিনি আবার রাষ্ট্রদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

রেজা খাঁ আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া এক নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিলেন এবং আবার নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের সামরিক শক্তির কতকটা পরিচয় পাইলেন—মোহাম্মেরার শেখের বিরুদ্ধে অভিযানে। বিজয়ীভাবে তিনি যখন টিহারাণে ফিরিয়া আসেন, তখন সমস্ত

টিহারাণবাসী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু রাজ-প্রাসাদে শাহর ভ্রাতা (যুবরাজ—পারসিক ভাষায় 'ভাল্লাদ') রেজা খাঁর জয়ে মোটেও সুখী হইলেন না। সমস্ত সহরে জয়োৎ-সব আরম্ভ হইল, ইহা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁহার হইল না। এবার রেজা খাঁ নিজের শক্তি ও জনপ্রিয়তার কিছু পরিচয় পাইলেন। পর সপ্তাহে রাজ ভ্রাতাকে সেলাম দেবার সময় রেজা খাঁ উপস্থিত হইলেন না। প্রকারান্তরে তিনি বুঝিতে চাহিলেন দেশ কাহাকে চায়, রেজা খাঁকে—না কজার রাজ-বংশকে।

মজলিসে রেজা খাঁর ক্ষমতা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯২৬ অব্দের মে মাসে রেজা খাঁ তাঁহার সর্দ্দারশিপে উপাধি পরিত্যাগ করেন এবং সৈনিক বিভাগ হইতেই সমস্ত উপাধি বর্জ্জন করার হুকুম দেন। মসলিসও সর্ব্বপ্রকার উপাধি রহিত করিয়া এক আইন জারি করিল। রেজা খাঁ এই সময় পেহ্লেভি উপাধি ধারণ করেন। ৮ই জুন মজলিসের আইনে সৈনিকবৃত্তি বাধ্যতামূলক হইল।

ক্রমে প্রায় সমস্ত মজলিসই রেজা খাঁর অনুবর্ত্তী হইল। ৩১শে অক্টোবর (১৯২৫) মজলিসের এক প্রস্তাবে কজার বংশ সিংহাসন-চ্যুত হইল এবং পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শাসনভার রেজা খাঁর হাতে ন্যস্ত হইল। পুরাতন মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য এক অস্থায়ী পরিষদের নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। ৬ই ডিসেম্বর এই নূতন সভ্যগণ মজলিস-

গৃহে মিলিত হইলেন। রেজা খাঁ পেহ্লেভি সভায় বলিলেন—একটা স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করার জন্তই এই পরিষদ নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং এই কাজ শেষ হইলেই এই মজলিসের আয়ু শেষ হইবে।

সম্মিলিত সভ্যদের সর্ব্বসম্মতিতে রেজা খাঁ পেহ্লেভি পারস্তের রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র যুবরাজ হইলেন; অর্থাৎ কজার বংশের পরিবর্ত্তে পেহ্লেভি বংশ পারস্তে রাজত্ব করিবে, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে পারস্তে রাজতন্ত্রই রহিয়া গেল; কিন্তু তাতে পারস্তের জনসাধারণ বরং খুসীই হইয়াছে। রেজা খাঁ পেহ্লেভি রাজা হওয়ার পর দেশব্যাপী উৎসবের ঢেউ লাগিয়া গেল—সমস্ত পারস্তে পরবর্ত্তী তিন রাত আলোক-সজ্জা চলিতে লাগিল।

রেজা খাঁ মুসলমান; কিন্তু তিনি প্রাগ্‌-মুসলমান যুগের পারস্তের গৌরব কথা বিস্মৃত হন নাই। যাহা পারস্তের বিশেষ গৌরবের তাহা প্রায় সবই প্রাগ্‌-মুসলমান যুগের। মুসলমান ধর্ম্মের পতন কালে সেই গৌরব কথা পারসীকগণ সকলেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে না পারিলে, জাতির স্থায়ী মঙ্গলসাধন করাও সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজের নামের সহিত পেহ্লেভি (Pehlevi) উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। পারস্তে প্রাচীনতম সভ্যতার যুগের নাম 'জেন্দ যুগ'। তাহারই পরবর্ত্তী যুগের নাম 'পেহ্লেভি'। এই যুগেই পারসীকগণ সিন্ধু হইতে দানুব পর্য্যন্ত

নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। সেই যুগেই পারসীকগণ ইউরোপের কতকাংশ জয় করে। সেই উজ্জ্বলতম গৌরব কাহিনীর স্মারক ভাবেই তিনি পেহ্লেভি উপাধি ধারণ করিয়াছেন; সেই গৌরব কথা জাগাইয়া দিবার জন্যই বর্ত্তমান পারস্যের প্রথম রণতরীর নাম রাখা হইয়াছে 'পেহ্লেভি'– ইটালীর নিকট হইতে রেজা খাঁ এই জাহাজখানা ক্রয় করিয়াছেন। জরাথুষ্ট্র, সেমিরামিস, দেরায়ুস, সাইরাস প্রভৃতির জাতি চিরকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে না। আশাকরি রেজা শাহ পেহ্লেভির প্রবর্ত্তিত পেহ্লেভি বংশের রাজত্বে পারস্য আবার প্রাচীন পেহ্লেভি যুগের সভ্যতার অনুশীলন করিবে;— ধারকরা অর্ব্বাচীন সভ্যতার ময়ূরপুচ্ছ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজের প্রাচীন গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিবে, আবার পারসীকগণ জেন্দের পবিত্র মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে গান করিয়া বিশ্বে নিজেদের বৈশিষ্ট সপ্রমাণ করিবে।

পারস্য আজ নবজীবনের শক্তি লইয়া জগতের অন্যান্য জাতির সহিত যোগ স্থাপন করিতে চলিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে আজ সে পূর্ণ স্বাধিকার লাভের জন্য উন্মুখ। রেজা শাহের আমলে পারস্যে সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, সামরিক নৌ-বাহিনী গঠন, উড়োজাহাজ, রেল লাইন, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সব দিকেই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৈদেশিকদের অন্যায় ও অবৈধ অধিকারও খর্ব্ব হইতেছে। আমদানী

রপ্তানী শুল্কের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্ত চেষ্টা চলিতেছে। বৈদেশিকদের **Extra-territorial rights** আজ পারস্ত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে; পারস্তের তৈল-খনির দিকেও রেজা শাহের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পারস্তের উন্নতির পথে বাধা আছে; সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, মোল্লা ও গোড়া মুসলমানদের অন্ধ কুসংস্কার, উন্নতি সাধনের জন্য অর্থের অভাব—এইসবই তার উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। কিন্তু তবুও আমাদের বিশ্বাস আছে, এই সুপ্রাচীন জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত। পারস্তের নবজীবনের সূচনা দেখিয়া সমস্ত এসিয়া তার প্রতি অন্তরেব শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। জয় তার হইবেই!
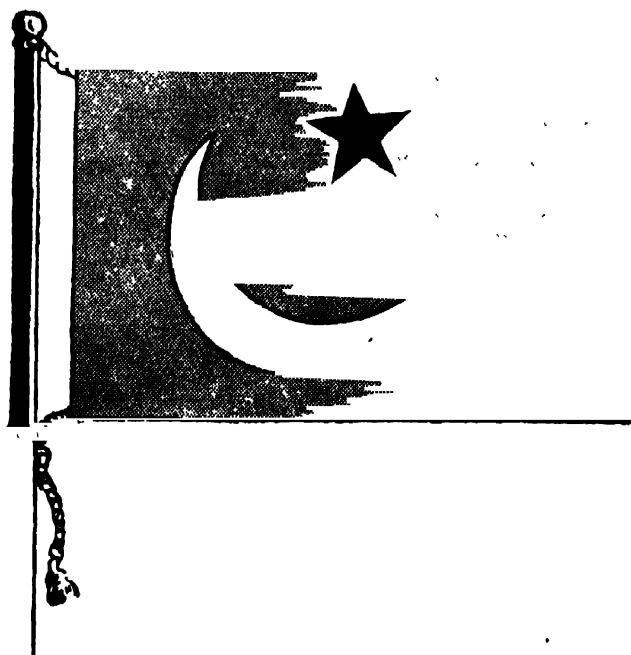
তুরস্ক

তরুণ তুরস্ক দল।

যে কোন প্রাচ্য দেশের বর্ত্তমান ইতিহাস লিখিতে গেলেই, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অনাচার ও অত্যাচারের কথা আসিয়া পড়ে। চীন, শ্যাম, আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক—সব দেশেই এক কাহিনী। সে সব কাহিনী পড়িতে পড়িতে একদিকে যেমন নিজেদের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়, অপরদিকে পাশ্চত্য জাতিসমূহের প্রতি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে। সভ্যতার দোহাই দিয়া, শান্তিপ্রিয় যিশুর দোহাই দিয়া, কত অনাচার ও ভণ্ডামীই যে তাহারা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সব প্রাচ্য দেশের বর্ত্তমান ইতিহাসে প্রথমেই চোখে পড়ে, এ সব সভ্য (?) জাতিসমূহের গায় পড়া উপচিকীর্ষার ফলেই প্রাচ্য জাতিসমূহের আজ এ দুরবস্থা।

অন্যান্য প্রাচ্য দেশের মত তুরস্ক ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অযাচিত দয়ার ফলেই মৃত্যুর পথে চলিতেছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের বুলিই ছিল 'bag and baggage, out of Europe !' তুরস্কের প্রতি তাহাদের ব্যবহার ও আচরণের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম হইতে সবটা বলিলে সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের কীর্ত্তিকলাপ বেশ পরিষ্কার হইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা ইহার কতকটা আভাস দিয়াছি।

বিদেশীদের শক্রতা ও নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য তুরস্কের এই শোচনীয় অধঃপতনে, তুরস্কবাসীদের প্রাণে একটা নূতন সাড়া দেখা দিল। নেভারিণের যুদ্ধের পর, তুরস্কের নৌ-শক্তি চিরতরে ধ্বংস হইল। নবীন তুর্কগণ সেই সময় হইতেই বুঝিল, সময় থাকিতে ঘর সামলান দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মিধত পাশা (Midhat Pasha) নব্য তুর্ক দলের (Young Turk) নেতা হন—বাস্তবিক নব্য তুর্কদলের আরম্ভ এই সময় হইতেই। সুলতান মামুদও এই সময় হইতে রাষ্ট্রশাসনে কিছু কিছু সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমাগতই খ্রীষ্টান প্রজাদের বিদ্রোহ ও বৈদেশিক খ্রীষ্টান জাতি-পুঞ্জের অনাচার ও অত্যাচারের ফলে, তুরস্ক সরকার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ১৮৫৬ অব্দে ক্রিমিয়ান যুদ্ধ, ১৮৬৭ অব্দে ক্রিটের বিদ্রোহ, ১৮৭৫ অব্দে বোসনিয়া, হার্জে-গোভনিয়া ও সার্বিয়ার বিদ্রোহ—এই সব যুদ্ধ বিগ্রহেই তুরস্ককে ব্যস্ত থাকিতে হইত। সুলতান আব্দুল আজিজ (Abdul Aziz)

ইচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ কোন সংস্কার সাধন করিতে পারেন নাই। তবুও তিনি তাঁহার পূর্ব্বগ দুইজন সুলতানের সঙ্কল্প অনেকটা কার্য্যে পরিণত করেন। কিন্তু তাহার প্রধান দোষ ছিল— রুষিয়াকে তিনি তাঁহার মিত্র মনে করিতেন এবং রুষিয়াকে সাহায্য করিতেন। অথচ রুষিয়াই তুরস্কের বড় শত্রু। ১৮৭৬ অব্দের বিদ্রোহের ফলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরে আত্মহত্যা করেন। সুলতান পঞ্চম মুরাদ পাগল হন এবং কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। পরবর্ত্তী সুলতান আব্দুল হামিদ (Abdul Hamid) ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ছিলেন। মন্ত্রী মিধত পাশা এক শাসন সংস্কার আইন প্রনয়ণ করেন—কিন্তু আব্দুল হামিদ তাহা মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি মিধত পাশাকে অপমানিত ও নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার মিধত পাশাকে স্মার্ণার শাসন কর্ত্তা করা হয়। ইহার কিছু পরেই ভূতপূর্ব্ব সুলতান আব্দুল আজিজকে হত্যা করার অভিযোগ দিয়া মিধতকে বন্দী করা হইল ও ১৮৮৩ অব্দে হত্যা করা হইল। ১৮৭৭ অব্দে বল্কানে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। রুষিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করিল। তুরস্ক, সেন ষ্টিফানোর (San Stefano) সন্ধি (১৮৭৮) অনুসারে রুমেনিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও সার্ভিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল এবং বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্ত শাসন দিল। কিন্তু ইংরাজ দেখিল, এই সন্ধির ফলে বল্কান রাজ্যসমূহে রুষিয়ার অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই সে আপত্তি করিল যে, এই সন্ধি মান্য

করা যাইতে পারে না—এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে এই সম্বন্ধে পাকা আলোচনা হইবে। বার্লিনে ইউরোপীয় জাতিসমূহের এক বৈঠক বসিল। বার্লিন সন্ধি অনুসারেও রুমেনিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও সার্ভিয়া স্বাধীন হইল এবং বুলগেরিয়া (মেসিডোনিয়া বাদে) স্বায়ত্ত শাসন পাইল। এতদতিরিক্ত ইংরাজ পাইল সাইপ্রাস দ্বীপ (Cyprus) ও অষ্ট্রিয়া পাইল বসনিয়া ও হার্জেগোভনিয়া এবং এসিয়াতে রুষিয়া পাইল কার্স (Kars), আর্দাহান (Ardahan) ও বটুম (Batum)। ১৮৮১ অব্দে ইংল্যাণ্ডের চাপে তুরস্ক গ্রীসকে থেসেলী ছাড়িয়া দেয়। ১৮৯৭ অব্দে ক্রীট দ্বীপে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; গ্রীস বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিল। তুরস্কের নিকট গ্রীস সহজেই পরাজিত হইল—কিন্তু রুষিয়া ও অন্যান্য শক্তি আসিয়া সন্ধির সময় গ্রীসের সাহায্য করিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর বাহিরের কোন যুদ্ধ বিগ্রহ রহিল না—এই সুযোগে ভিতরের গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী নব্য তুরস্কদল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা বুঝিল তুরস্ককে বাঁচিতে হইলে, তাহার জীবন ও শাসনধারা পরিবর্ত্তিত করা দরকার। বিদেশে মুদ্রিত করিয়া নানা বিদ্রোহী সাহিত্য দেশের মধ্যে প্রচার করা, তাহাদের একটা প্রধান কাজ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত প্রায় যুবকই এই দলে ভিড়িতে লাগিল—বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও ইহাদের মধ্যে ছিল। ট্রিপোলির শাসনকর্ত্তা সেনাপতি রেডজেব পাশাও (Redjeb Pasha) এই দলে

ছিলেন। এই দলের কার্য্য প্রায় সবই গোপনে হইত, তাই দেশের জনসাধারণ তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না।

এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রথম এলবেনিয়া (Albania) হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু শীঘ্রই মেসিডোনিয়া ও সিরিয়াতে আড্ডা স্থাপিত হইল। মেসিডোনিয়ার দুইটি সামরিক কাপ্তান (Captain) —'এনভার বে ও নিয়াজি বে' (Enver Bay and Niazi Bay) দলের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। পূর্ব্বেই ইহারা সৈন্যদের হাত করিয়াছিল—তাই সৈন্যরা পরিষ্কারভাবে জবাব দিল তাহারা সুলতানের হুকুম মানিবে না। প্রায় বিনা রক্তপাতেই নব্য দলের জয় হইল—প্রতিনিধি সভার জন্য নির্ব্বাচন করার হুকুম হইল। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল—চিরপ্রথিত 'রুগ্ন লোক'টিকে (Sick man) হঠাৎ সবল হইতে দেখিয়া, ঐ সব মাংস-লোলুপ গৃধ্রদলের মধ্যে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হইল। বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ড এই নব জাগরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডের প্ররোচনায় তুরস্কের মোল্লা ও ধর্ম্মযাজকগণ আবার সৈন্যদের উল্টা দিকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে লাগিল। ১৯০৯ অব্দে কনষ্টেন্টিনোপলের সৈন্যগণ সুলতানের পক্ষে গোলমাল আরম্ভ করিল। বোসনিয়ান, গ্রীক, বুলগেরিয়ান, আলবেনিয়ান ও সার্ভিয়ান স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া সৈন্যদের সহিত যোগ দিল। মোল্লাদেরও স্বার্থ অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুকূল সুলতানের শাসন অপ্রতিহত রাখা; বুলগেরিয়ান, সার্ভিয়ান প্রভৃতিদেরও

স্বার্থ সুলতানের দুর্ব্বল স্বেচ্ছাচারী শাসন বজায় রাখিয়া তুরস্ককে আরও দুর্ব্বল ও পঙ্গু করা। তাই মোল্লারা ও বিদেশীরা একই স্বার্থের তাড়নায় তুরস্কের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরাজ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া দিল। ইংরাজ দৌত্যাবাসের দোভাষী (dragoma) ফিট্জ মরিস (Fitz Maurice) এই গোলমালের একজন পাণ্ডা এইজন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই গোলমালের নেতাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও নব্য তুর্কদলই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইল। দেশের সমস্ত শাসনভার "ঐক্য ও উন্নতি সমিতির" (Committee of Union and Progress) * হাতে আসিল। কিন্তু এই সম্পদের সময় ধীর স্থির ভাবে দেশের শাসনভার চালাইবার মত যোগ্য লোক ইহাদের মধ্যে বড় সুলভ ছিল না। টালাত, এনভার ও জেমাল—এই ত্রয়ীর হাতেই সব ক্ষমতা আসিল এবং ক্ষমতার ঠিক সুব্যবস্থা তাঁহারা করিতে পারিলেন না।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সামান্য ঘরে এনভারের জন্ম হয়। বিদ্রোহের পর তিনি বার্লিনে যান এবং সেখানে বিশেষভাবেই জার্ম্মেণীর ভক্ত হন। ত্রিপলির যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ; বল্কান যুদ্ধের পর তিনি সমর-সচীব হন। এ সময় সুলতানের এক আত্মীয়াকে বিবাহ করিয়া তিনি বেশ ধনী হইলেন। এনভার অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন ; সৌভাগ্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দাম্ভিকতা আরও বৃদ্ধি পাইল।

---

* নব্য তুর্কীদের বিদ্রোহী সমিতি এই নামেই অভিহিত হইত।

১৮৭০ অব্দে আদ্রিনপোলে বুলগার মুসলমান বংশে টালৎ পাশার জন্ম হয়। অল্প কিছু লেখা পড়া শিখার পর তিনি ডাক বিভাগে ও টেলিগ্রাফ বিভাগে কেরাণী হন। তাঁহার সংসর্গ ও উদার মতের জন্য তাঁহাকে দুই বৎসর কারারুদ্ধ করা হয়। দুই বৎসর পর তাঁহাকে সেলোনিকাতে নির্ব্বাসিত করা হইল। সেলোনিকা বিপ্লববাদী নব্য তুরস্কদলের এক প্রধান আড্ডা। ক্রমে তিনি এই দলের প্রধান কর্ম্মী হইয়া দাঁড়াইলেন। যদিও স্কুলে তিনি বিশেষ শিক্ষা পান নাই কিন্তু প্রখর বুদ্ধি ও মেধার বলে তিনি সহজেই সব বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন। বিদ্রোহের পর তিনি আদ্রিনপোলে ফিরিয়া যান এবং সেখান হইতে প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। শীঘ্রই তিনি সভার সহকারী সভাপতি হন এবং পরে অভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী (Minister of the Interior) হন। জার্ম্মেণীর সাহায্যে তুরস্ককে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ জীবন যাপন করিতেন। ১৯১৭ অব্দে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হলিম (Said Halim) পদত্যাগ করিলে তিনিই প্রধান মন্ত্রী হন।

জামাল পাশার জন্ম খাঁটি তুরস্ক বংশে। জামাল লোকপ্রিয় হইবার জন্য অনেক সময় সদাশয়তার ভাণ করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি অনেকটা ফরাসী ভক্ত ছিলেন এবং ১৯১৪ অব্দে তুরস্ক ঋণ (Ottoman Loan) তুলিবার জন্য প্যারীতে যান।

এনভার ও জামাল যদিও "ঐক্য ও উন্নতি সমিতি"র সভ্য ছিলেন, তথাপি তাঁহারা এই সমিতির মতানুযায়ী সব সময় চলিতেন না। সমর-সচীব হইবার পর এনভার প্রায় এই সভার সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন—লড়াইর সময় সকলে এনভারের পদ ত্যাগের দাবী করিলে, তিনি জার্ম্মাণীর সাহায্যে সেই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। কিন্তু টালাৎ সম্পূর্ণভাবে এই দলের মতানুযায়ী চলিতেন এবং তাহারা তাঁহাকে সব সময় সমর্থন করিত।

নব্য তুরস্ক ও ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ

১৪৫৩ খৃঃ অব্দে ওসমানী তুর্কীগণ কনষ্টাণ্টিনোপল বা ষ্টাম্বুল দখল করে, ক্রমে এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি সমস্ত ইউরোপের ত্রাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা তাহাদের বিজয় বাহিনী ক্রমে উত্তর-পশ্চিমে প্রেরণ করিতে থাকে; একাধিকবার ভিয়েনা আক্রমণ করাতে সমস্ত ইউরোপীয় খৃষ্ট শক্তিপুঞ্জ একত্র হইয়া এই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শক্তিকে ভিয়েনা জয়ে বাধা দেয়। তুর্কীগণ ভিয়েনা জয় করিতে পারিল না, কিন্তু সমস্ত মিসর ও উত্তর আফ্রিকা, আরব, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পশ্চিম এসিয়া (Asia Minor) বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, ক্রিমিয়া, এলবেনিয়া প্রভৃতি জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের বুকের উপর বসিয়া মুসলমান তুর্কগণ খৃষ্ট প্রজাদের শাসন, শোষণ ও অত্যাচার করিবে, ইহা খৃষ্ট শক্তিপুঞ্জ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত

না। তাই কোন সুযোগ পাইলেই তাহারা তুর্ক সাম্রাজ্যকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিত। রুষ ও অষ্ট্রীয়ান সম্রাট অল্প অল্প করিয়া তুর্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নানা ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতে ত্রুটি করিল না; কিন্তু বিদ্বেষ ও অনৈক্য বশতঃ এক খৃষ্ট শক্তি অন্য খৃষ্ট শক্তিকে সাম্রাজ্য জয়ে বাঁধা দিত বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তুর্কীগণকে ইউরোপ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হয় নাই।

মোটের উপর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটরা করিয়া তুর্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিতে লাগিল। ইংরাজ গ্রাস করিল মিসর, সুডন, সাইপ্রাস; ফরাসী গ্রাস করিল মরোক্কো; অষ্ট্রীয়া গ্রাস করিল বোসনিয়া, হার্জেগোভনীয়া; রুষ গ্রাস করিল ক্রিমিয়া, ককেসিয়া। গ্রীস, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও এলবেনিয়া তুর্ক সাম্রাজ্যের বক্ষ চিরিয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তখন তুরস্ক Sickman of Europe "ইউরোপের ব্যাধিগ্রস্থ দুর্ব্বল লোক",—নামে মাত্র স্বাধীন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোন ক্ষমতা নাই। নাম মাত্র স্বাধীন তুরস্কের মর্ম্মান্তিক অবমাননার জন্য capitulations তাঁহার স্কন্ধে চাপান হইল। এই capitulations এর ফলে বিদেশী বাসেন্দাদের উপর তুর্ক সাম্রাজ্যের কোন অধিকারই নাই। তুর্ক সাম্রাজ্যে তাহারা আছে অথচ তুর্ক আইন তাহাদেব উপর প্রযোজ্য নহে, তুর্ক বিচারালয় তাহাদের বিচার করিতে অক্ষম, তুর্ক পুলিশ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

তাহারা নিজেদের ডাকঘর স্থাপন করিল। এই সবটার সুযোগ লইয়া বিদেশীরা ইচ্ছা মত বে-আইনী দ্রব্যাদি গোপনে আমদানী (smuggle) করিত—ধরা পড়িলে তুরস্ক রাষ্ট্র তাহাদের শাস্তি দিতে পারিত না। এই অপমান যে একমাত্র তুরস্কেরই সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচ্যে নামমাত্র স্বাধীন প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই এই অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। জাপানেও এই capitulation বা extra-territorial rights ছিল। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জাপান যখন তাহার সভ্যতা প্রমাণ করিল তখন এই অপমান হইতে অব্যাহতি পাইল।

নব্য তুর্ক-সমাজ জাতির এইরূপ অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। দেশের ভিতর অশান্তি ও অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবকগণ নানা-স্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া বিপ্লবের বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। নিজ দেশে বসিয়া ষড়যন্ত্র করার অসুবিধা থাকায় 'নব্য তুর্ক সঙ্ঘ' (Young Turks) প্যারিসে তাহাদের আড্ডা করিল। আনোয়ার এই দলের নেতা ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বিপ্লববাদী-দের কার্য্য কলাপ হইতে তাহারা বুঝিল যে, সেনা বিভাগ হাত করিতে না পারিলে বিপ্লবে সফলতা লাভ সম্ভব নাহে; তাই তাহারা গোপনে সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করিতে লাগিল। দেশের নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল; দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এই সব সমিতিতে যোগদান করিতে লাগিল। যখন মুস্তাফা কামাল পাশা স্তলনিকার সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি

তখন সেইস্থানে মুক্তিসংঘ (League of Liberty) নামে এক সমিতি স্থাপন করেন।

যখন দেশে বিপ্লববাদী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার ও প্রভাব যথেষ্ট হইয়াছে মনে হইল, তখন নব্য তুর্কীদল প্যারিস হইতে স্তলনিকায় তাহাদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিল। 'Committee of Union and Progress' নামে তাহারা সমগ্র দেশে বিপ্লববাদী সমিতি স্থাপন করিয়া বিপ্লবের চেষ্টায় রহিল। বহু সৈন্য এই সব সমিতির গুপ্ত সভ্য ছিল।

১৯০৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ ও রুষের মধ্যে এক সন্ধি হয়। তুরস্কের সর্ব্বনাশ সাধনই এই সন্ধির উদ্দেশ্য। বিদেশী শক্তিপুঞ্জের কোন কার্য্যে বাধা দিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল সুলতানের ছিল না। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে নব্য তুর্কদল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহের ফলে প্রতিনিধি সভা (Chambar of Deputies) ও মন্ত্রীসভা (Cabinet) গঠনের অধিকার জনসাধারণ পাইল। সুলতানের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইল। সুলতান গোপনে বিদ্রোহীদের দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নব্য তুর্কীদল ইহা টের পাইয়া আবার বিদ্রোহ করিয়া সুলতানকে পদচ্যুত এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে সুলতান করিল। এই বিপ্লবে আনোয়ারই প্রধান নেতা; কামাল পাশা ইহার অন্যতম নেতারূপে সৈন্য সংস্কার ও চালনা করেন। সকলেই কামালের রণনৈপুণ্য ও সৈন্য চালনার প্রশংসা করেন, কিন্তু বিপ্লবের পরই কামাল ও আনোয়ারের মধ্যে কলহ হয়; শেষ পর্য্যন্তও এই কলহ চলিয়াছে।

আনোয়ারের প্রতিভায় ও চেষ্টায় কামাল নিতান্তই অজ্ঞাত ও অখ্যাত রহিলেন।

ইতি মধ্যে ট্রিপলী যুদ্ধ আরম্ভ হইল—শেষ যুদ্ধ শেষ না হইতেই বল্কান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই যুদ্ধেই তুরস্ক পরাজিত হইল; তাহার অনেক রাজ্য পর হস্তগত হইল। দরকার মত ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ তুরস্কের প্রতি বন্ধুত্বের অনেক অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু তুরস্কের আসল বিপদের সময় কেহই তাঁহাকে সাহায্য করে নাই; বরং বিপদের সময় সব জাতি চেষ্টা করিত কি করিয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে এক টুকরা মাংস ছিনাইয়া লইতে পারে। দরকার মত সুলতানের তোষামদ করিতেও ইহারা পিছায় নাই; আবার কখন তাহার প্রতি চরম নির্ম্মমতা দেখাইতেও পিছায় নাই।

গত যুদ্ধের পর চিরোল সাহেব (Sir Valentine Chirole) ও ইংরাজ সরকারের ঐতিহাসিকগণ প্রচার করিয়াছে যে, তুর্ক সুলতান বাস্তবিক খলিফা নহেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাহাকে খলিফা বলিয়া মানিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লইতে ইংরাজগণ ত্রুটি করেন নাই। টিপু সুলতানের (Tipu Sultan) সহিত যুদ্ধের সময় ইংরাজ সরকার তুর্ক সুলতানের সুপারিশ চিঠির জন্ত খোষামোদ করিয়া "Acknowledged head of the Mahommedan Church" মুসলমান সমাজের সর্ব্ব-মান্য ধর্ম্ম নায়ক বলিয়া সম্বোধন করিতে আপত্তি করেন নাই। খলিফার সুপারিশ চিঠি দিয়া বড়লাট টিপু সুলতানের নিকট

লিখিয়া পাঠাইলেন, "আশা করি এই পত্র খানা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ ও বিবেচনা করিবেন।" টিপু সুলতান খলিফার পত্র পাইয়া ফরাসীদিগের সহিত বন্ধুত্ব ত্যাগ করিলেন, কারণ খলিফার পত্রে জানিলেন ফরাসীরা খলিফার শত্রু, কাজেই সমস্ত মুসলমান সমাজের ত্যজ্য ও শত্রু;—ইংরাজের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাই বিপ্লবের সময়ও ইংরাজগণ খলিফার এক ফারমণ আনিয়াছিল; তাহাতে লেখা ছিল যে, ইংরাজগণ খলিফা ও মুসলমান সমাজের সুহৃদ। বিপদের সময় খলিফার সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে খলিফা বলিয়া মান্য করিয়া আজ কি বলিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে চায়! ইংরাজ উচ্চ গলায় প্রচার করে যে সে চিরকাল তুর্কীর সুহৃদ; কিন্তু ইংরাজের এই বন্ধুত্ব কতদূর এবং কোথায়? ক্রিমিয়ান যুদ্ধে (Crimean war) ইংরাজ তুর্কীকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য তুর্কীর মঙ্গল সাধন নহে; তাহার উদ্দেশ্য তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রুষিয়াকে খর্ব্ব করা। রুষিয়া যদি তুর্কীকে জয় করিয়া কনস্তান্টীনোপল পর্য্যন্ত আসিতে পারে, তবে ইংরাজের বিপদ; ভারতে গমনাগমনের পথ রুষিয়ার আয়ত্তের ভিতর চলিয়া যায়; তাই ইংরাজ ও ফরাসী তুর্কীর পক্ষ লইয়া রুষিয়াকে জব্দ করিল। তারপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুষিয়া ও তুর্কীর আবার যুদ্ধ হইল, ইংরাজ প্রথম কিছুই বলে নাই, কিন্তু যখন সে দেখিল যে রুষিয়া তুর্কীর নিকট হইতে অনেক প্রকার সুবিধা আদায় করিল, অমনি ইংরাজদের তুর্কীর প্রেম জাগিয়া উঠিল।

কৃষ্ণ সাগর
আর্মেনিয়া
আনাতোলিয়া
(ইটালিয় অঞ্চল)
এঙ্গোরা
সাইপ্রাস
ভূমধ্য সাগর
দামাস্কাস
বাগদাদ
ইংরেজি মাইল
আরব
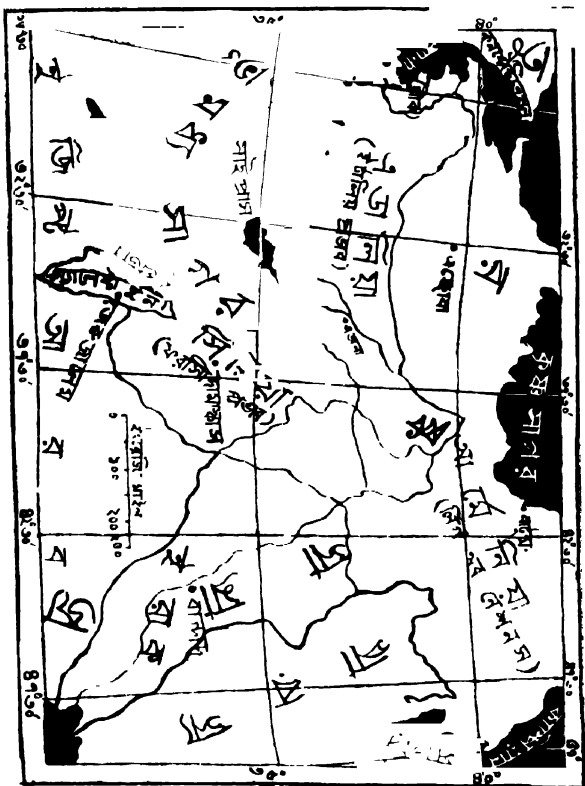
গোপনে তুর্কীর নিকট হইতে সাইপ্রাস দ্বীপ আত্মসাৎ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক সভা আহ্বান করাইলেন, তাহাতে তুর্কীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে রুষিয়ার মতলব নষ্ট করিল। ফরাসীকেও সন্তুষ্ট করা দরকার—সে একাই যে Cyprus ভোগ করিবে, ফরাসীর ভাগে কিছুই পড়িবে না, তাহাতো চলে না; তাই ফরাসার সহিত চুক্তি হইল, অদূর ভবিষ্যতে ফরাসীকে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত টুনিস (Tunis) প্রদেশ দেওয়া হইবে, সিরিয়াতে ফরাসী প্রতিপত্তিই প্রবল হইবে, এবং মিশরের আর্থিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সমান অধিকার থাকিবে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন গ্রীকগণ তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল, তখন ইংলণ্ডের নায়কত্বে খৃষ্টীয় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুষের নৌবাহিনী হঠাৎ আসিয়া নেভারিনের (Naverin) যুদ্ধে (১৮৩০) তুর্কী নৌবাহিনী ধ্বংস করিয়া দিল। বিজয়ী তুর্কীগণ পরাজিত হইল। এই হইল তুর্কীর প্রতি ইংল্যাণ্ডের বন্ধুত্বের পরিচয়। এই রকম বন্ধুত্বের পরিচয় পরেও অনেকবার পাওয়া গিয়াছে। ইংল্যাণ্ড কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা পর্য্যন্ত না করিয়া মিশর দখল করে এবং মুখে বরাবরই বলিয়াছে শীঘ্রই তাহারা মিশর ত্যাগ করিবে, কিন্তু গত যুদ্ধের পর মিশর প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মিশর হইতে তাঁহারা ক্রমে সুডন আক্রমণ করিল এবং সেখানে স্বাধীনতাকামী ৪০০০০ লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। উদারপন্থী ব্রাইট (John Bright) সাহেব এই সব ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, "England

violated both the law of Nations and obligations of treaties. She broke public faith and infringed solemn engagement"—"ইংল্যাণ্ড সভ্য জগতের আইন অমান্য ও চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে এবং নিজেদের শপথ না রক্ষা করায় সমগ্র জগতের নিকট বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

তারপর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকগণ আবার তুর্কীর নিকট পরাজিত হইল; গ্রীসের পরাজয়ে অমনি ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য খৃষ্টীয় শক্তি একত্র হইয়া তুর্কীকে ভয় দেখাইল, এবং তাদের চেষ্টায় পরাজিত গ্রীসেরই রাজ্য বৃদ্ধি হইল—থেসেলী ও ক্রীট (Thessaly and Crete) তুর্কীর হস্তচ্যুত হইল। বলকান যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড বলিল, "যুদ্ধে তুর্কী পরাজিত হইয়াছে, কাজেই তাহার রাজ্য কিছু যাইবেই; কারণ বিজেতা তাহার জয়ের ফলভোগ করিবে—তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই।" আজও ইংরাজগণ এই কথা বলে, কিন্তু ১৮২৭ ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজেতা তুর্কী তাহাদের জয়ের ফলভোগ করিতে পারিল না কেন? তখন ইংরাজগণ বিজেতা তুর্কীর জয়ের ফল তাহাকে দিল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এখন দেয় কে?

ইংল্যাণ্ড নিজে সাইপ্রাস দখল করিল, কাজেই ফরাসী ও ইতালীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফরাসীকে সিরিয়া, মরোক্কা ও টিউনিস এবং ইতালীকে ট্রিপোলী দান করা হইল। ফ্রান্স ও ইতালীর এই সব দেশ অধিকার কালে ইংরাজ কোন উচ্চ

বাচ্য না করিয়া পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে সাহয্যই করিয়াছে। টিউনিস, মরোক্কা, সিরিয়া, ট্রিপোলি এই সকল দেশ তুর্কীর অধীন; কাজেই এই সব দেশ দান করিতে ইংরাজ খুবই উদার, কিন্তু এইসব অন্যের দেশ দান করিবার অধিকার ইংরাজের হইল কি নিয়মে? অথচ এই দানের সর্ত্ত বলেই টিউনিস, ট্রিপোলি, মরোক্কা তুর্কীর হস্তচ্যুত হইয়াছে।

ট্রিপোলি যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ হুকুম প্রচার করিল যে কোন মিশরবাসী এই যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবে না। কিন্তু ইংরাজগণ মুখে বলিত যে মিশর তুর্কীর রাজ্য, তাহারা কেবল ইহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যদি ভিতর দিয়া তুর্কী-সৈন্য ট্রিপোলিতে যাইতে পারিত, তবেও খুব সম্ভব ট্রিপোলি ইটালীর অধীন হইত না। গ্রে (Sir Edward Grey) ইহা বন্ধ করিয়া ইটালীর সাহায্য করিল। অনেকে সন্দেহ করে সে সময় হইতেই ইটালীর সহিত ইংল্যাণ্ডের এইরূপ কথাবার্ত্তা হয় যে, ভবিষ্যতে ইউরোপীয় যুদ্ধে ইটালী ইংল্যাণ্ডের সাহায্য করিবে।

ছলেবলে কৌশলে ইউরোপের খৃষ্টভক্ত শক্তিপুঞ্জ তুরস্কের রাজ্য প্রায় সবই হরণ করিয়াছে। নিম্নতালিকা হইতে দেখা যাইবে কবে কাহার দ্বারা কোন্ প্রদেশ তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়াছে:—

১।	হাঙ্গেরী	(১৬৮২-৯৯)	স্বাধীন
২।	গ্রীস	(১৮২৭ খৃঃ)	স্বাধীন
৩।	আলজিরিয়া	(১৮৩০)	ফরাসী

৪।	সার্ভিয়া	(১৮৩০)	স্বায়ত্তশাসন
	,,	(১৮৭৮)	Principality বা সামন্ত রাজ্য
		(১৮৮২)	স্বাধীন
৫।	মন্টিনিগ্রো	(১৮৭৮)	সামন্ত রাজ্য
		১৯১০)	স্বাধীন
৬।	বসনিয়া হার্জেগোভিনা	(১৮৭৮)	অষ্ট্রিয়া
৭।	বুলগেরিয়া	(১৮৭৮)	স্বায়ত্ত শাসন
	,,	(১৯০৮)	স্বাধীন
৮।	পূর্ব্ব রুমেলিয়া	(১৮৮৫)	বুলগেরিয়া
৯।	সাইপ্রাস দ্বীপ	(১৮৭৮)	ইংল্যাণ্ড
১০।	টুনিস	(১৮৮১)	ফরাসী
১১।	মিশর	(১৮৮২)	ইংল্যাণ্ড
১২।	ক্রীট	(১৮৯৮)	স্বায়ত্তশাসন
	,,	(১৯১৩)	গ্রীস
১৩।	ট্রিপলি	(১৯১২)	ইটালী
১৪।	মেসিডোনিয়া	(১৯১৩)	গ্রীস, বুলগেরিয়া ও সার্ভিয়া
১৫।	থ্রেস		গ্রীস, বুলগেরিয়া
১৬।	ক্রিমিয়া	(১৭৮৩)	রুষিয়া
১৭।	তুর্কিস্থান ও মধ্য এসিয়া	(১৮১৫—১৮৮০)	রুষিয়া
১৮।	ককাসাছ ও কাস্পীয়ান তীর	(১৮০০—১৮৮০)	রুষিয়া
১৯।	ওয়ালাচিয়া ও মলডেভিয়া	(১৮৩০)	রুষিয়া
২০।	এডেন, হাড্রামট ও মস্কট	(১৮৩৯)	ইংল্যাণ্ড

বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য ক্রমেই ক্ষয় পাইতেছিল। সমস্ত খৃষ্টান শক্তি মিলিয়া বহু বৎসর ধরিয়া আক্রমণের পর আক্রমণে তুরস্ককে পঙ্গু করিয়াছে।

ত্রিপোলী ও বল্কান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, নব্য তুর্কী জাতীয় জীবনের শক্তি সঞ্চারের নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। এই দুই যুদ্ধের সময় আনোয়ার পাশাই কার্য্যতঃ তুরস্কের শাসন কর্ত্তা। তিনি তুর্কী সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে অগ্রণী ছিলেন। কামাল পাশাও এই যুদ্ধের সময় নীরব ছিলেন না, তিনি বুলগেরিয়ার হস্ত হইতে আদ্রিনাপোল উদ্ধার করেন, কামাল পাশার সেনাপত্যের খ্যাতি এই সময়ে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্যারিসে রাজকার্য্যে গিয়াছিলেন, সেই সময় ফরাসী যুদ্ধনীতি ও সৈন্য চালনা বিশেষ ভাবে শিক্ষা করেন। তিনি নিজ দেশের সৈন্যদের শিক্ষা ও সংস্কারে যত্নবান হন। বল্কান যুদ্ধের কিছুদিন পরে ১৯১৪ অব্দের মহাসমর আরম্ভ হয়।

এখন দেখা যাউক যুদ্ধের সময় কি হইয়াছে, ইংল্যাণ্ড ও তুর্কীর মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল। বল্কান যুদ্ধে ও তুর্ক-ইটালীয় যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তুর্কী ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভর করিতে পারে না। ১৯০৮খ্রীঃ অব্দে তুর্কী বিপ্লবের পর তরুণ তুর্কীদল (Young Turks) আশা করিয়াছিল, তাহাদের নব জাগ্রত জাতীয়তা ইংল্যাণ্ডের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড কোন প্রকারেই তাহাদের সাহায্য

করিল না। মরোক্কো পারস্য প্রভৃতি অন্যান্য মুসলমান রাজ্যের সহিতও ইংল্যাণ্ডের ব্যবহার মোটেই ভাল ছিল না। এডেন নগরস্থ ইংরাজ সৈন্য বিদ্রোহী আরবীদের সাহায্য করিতে কখনও বিমুখ ছিল না। এই সব কারণে তুর্কীগণ ইংরাজের উপর বিশ্বাসহীন হইয়াছিল। তরুণ তুর্কীগণ সহজেই মনে করিতে পারে যে ইংল্যাণ্ড তুর্কী ও সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতিই অসদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক এবং করিতেছে, অপর দিকে তুর্কীগণ সৈন্য, শিক্ষা, দুর্গ নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য প্রকারেও জার্ম্মাণির সাহায্য পাইতেছিল। জার্ম্মাণ সম্রাট নানাভাবে মুসলমানদিগের সহিত সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুর্কীর চির শত্রু রুষিয়া ইংল্যাণ্ডের পক্ষে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া এক দলে; ইহারাই তুর্কীর ভিন্ন প্রদেশগুলি একে একে দখল করিয়াছে।

এই যুদ্ধের প্রারম্ভেও তাহারা এমন কোন আশ্বাস দিল না যে তুর্কীকে তাহারা কোন প্রকারে আক্রমণ করিবে না। রুষিয়ার অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা কনস্তান্টিনোপল দখল করে। এত দিন ইংরাজ ও ফরাসী তাহার এই ইচ্ছার প্রতিকূল ছিল, তাই সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, আজ ইংরাজ ও ফরাসী তাহার পক্ষে, কাজেই এখন যে রুষিয়া তাহার সেই চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তারপর যুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কীর "সবে ধন নীলমনি" দুই খানি যুদ্ধ জাহাজও ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করিল। এই

অবস্থায় তুরস্ক জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগদান করিল, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় হইল। বিজেতা মিত্রশক্তি তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ যে দলে দলে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কারণ কি? ভারতীয় মুসলমানগণ স্বধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে শুধু এই ভরসায় যে, ইংরাজগণ যুদ্ধের পর খেলাফত ও তুর্কীর কোন ক্ষতি করিবে না। পরাজিত জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়াকে যে ভাবে নিষ্কৃতি দিয়াছে, দুর্ব্বল তুর্কীকে কেন তাহা দেয় নাই? যে সব আদর্শ ও আশা মিত্রশক্তি যুদ্ধের সময় প্রচার করিয়াছে. তুর্কীর সহিত সন্ধির ব্যাপারে তাহার সে চিহ্নও দেখা যায় নাই। অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন প্রদেশগুলি স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, জার্ম্মেণীরও অনেক অংশ স্বাধীন হইয়াছে। এই সব স্থানের লোকদের মত অনুসারে তাহাদের শাসক ও শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পোলল্যাণ্ড, লিথুনীয়া, রুমেনীয়া, হাঙ্গেরী, জেকোশ্লোভেক, যুগোশ্লোভেক, তাহাদের মতানুসারেই নিজ নিজ শাসন ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছে। কিন্তু তুর্কীর অধীন দেশের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজ বা অন্য কোনও মিত্রশক্তি। সিরিয়ার ভাগ্য ঠিক করিবে ফ্রান্স (কারণ বহুবৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ তুর্কীর রাজ্যান্তর্গত সিরিয়া ফরাসীকে দান করিয়াছে), এজলিয়ার ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিবে ইটালী, স্মার্ণা ও থ্রেসের কর্ত্তা গ্রীস, পেলেষ্টাইন ও মেসোপোটেমিয়ার কর্ত্তা ইংল্যাণ্ড এবং সিলিসিয়া,

এনাটোলিয়া, ও কনষ্টাণ্টিনোপলের কর্ত্তা সর্ব্বজাতি-সঙ্ঘ (League of Nations) অর্থাৎ কার্য্যতঃ ইংরাজ ও ফরাসী। অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মেণীর অন্তর্গত প্রদেশগুলির শাসন ব্যবস্থা সেই সেই প্রদেশস্থ লোকের জাতি ও ভাষাগত বিচার দ্বারা ঠিক হইয়াছে; কিন্তু তুর্কীর অধীন দেশসমূহে তাহা হয় নাই। নানা ছল চাতুরীর সাহায্য লইয়া, মিত্রশক্তিরা প্রমান করিতে চেষ্টা করিতেছে যে তুর্কীর বেলায়ও সেই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। তাহারা সেই জন্য লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণে অনেক চাতুরী খেলিয়াছে। আড্রিনোপল ও স্মার্ণা গ্রীসকে দেওয়া হইয়াছিল; নীচে তাহাদের লোকসংখ্যা দেওয়া গেল। আড্রিনোপল—মুসলমান ৫,৬০০০০; গ্রীক ২,২৪০০০; স্মার্ণা—মুসলমান ১,২৪৯০০০; গ্রীক ২,৯৯০০০।

তুর্কীর বিরুদ্ধে এক অভিযোগ যে, সে তাহার খৃষ্টান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। পরাধীন জাতির উপর সকলেই অত্যাচার করে, তুর্কীও করিয়াছে। মধ্যযুগ হইতেই খৃষ্টীয় দেশসমূহে ধর্ম্মের নামে যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে, অসভ্য এসিয়াবাসী তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। ইহুদিগণ সর্ব্বত্র অত্যাচারিত হইয়া, তুর্কীর অধীনে আশ্রয় লইত। খৃষ্ট ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করিত। অনেক সত্যবাদী খৃষ্টান স্বীকার করিয়াছেন যে তুর্কীর অত্যাচার কাহিনী মিথ্যা। ইংল্যাণ্ডের ও সার্ভির দূত বলিয়াছে যে, তাহারা রাজনৈতিক কারণে তুর্কীর অত্যাচারের কথা প্রচার

করিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তুর্কীরা অত্যাচারী নহে, বরং ন্যায়-পরায়ণ ও বহুগুণসম্পন্ন। *

তুর্কী যে মোটেও অত্যাচার করে নাই, এমন কথা বলিতে চাই না। কিন্তু অন্য জাতির তুলনায় তাহার অত্যাচার তেমন মারাত্মক নহে। লুপ্ত গৌরব স্পেন ও পর্টুগালের কথা নাই বা বলিলাম—কেমন করিয়া তাহারা পোপের ও খ্রীষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া এমেরিকান লোহিতাঙ্গদিগকে হত্যা করিয়াছে সেই কথা চাপাই থাক; তারপর কেমন করিয়া ইংরাজ মিশরে ও সুডনে বন্দী সৈন্যদের ও নিরীহ প্রজাদের ১০০।২০০ নয়, ৪০০০০ হাজারকে হত্যা করিয়াছে তাহাও নাইবা তুলিলাম; কিভাবে মিত্রশক্তির অতি প্রিয় বেলজিয়াম কঙ্গোর (Congo) অধিবাসীদের সুসভ্য করিতেছে সেই কথাও নাই বলিলাম; খৃষ্ট জাতির সৌভাগ্যের একটী প্রধান কারণ অতি লজ্জাজনক দাসত্ব প্রথার অত্যাচার কাহিনীও না হয় চাপাই রহিল। ইতিহাসের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে, যাহার তুলনায় তুরস্কের এই অত্যাচার কিছুই নয়। সাম্রাজ্যবাদের

*Political interest made us paint the Turks as cruel Asiatic tyrants, incapable of European civilization. An impartial history would rather prove that the Turks are rather Europeans than Asiatics and they are not cruel tyrants but a nation loving justice and fairness, possessing qualities and virtues which deserve to be acknowledged and respected.

সঙ্গে কিছু অত্যাচার জড়িত থাকিবেই—আদিম কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্তই ইহা চলিতেছে।

এক শতাব্দীর উপর হইল, তুর্কীর খৃষ্টীয় প্রজাগণ অন্যান্য খৃষ্টীয় শক্তির সাহায্যে ও উত্তেজনায় ক্রমাগত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চেষ্টা করিতেছে, তুর্কীর চিহ্নও মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে; আর তুর্কী যদি ২।৪ হাজার লোক মারে অমনি খৃষ্টীয় জগত করুণায় অস্থির হইয়া উঠিবে। কিন্তু খৃষ্টান প্রজাগণ যখন নিঃসহায় তুর্কী প্রজাদের হত্যা করিবে তখন হইবে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই রকম সব মিথ্যা কল্পিত অভিযোগের আশ্রয় লইয়া মিত্রশক্তি তুর্কীকে ধ্বংস করিয়াছে—তাহার রাজ্য বণ্টন করিয়াছে, অবশেষে সম্রাটকে তাঁহার রাজধানীতে বন্দী করিয়া জগৎ হইতে তুরস্কের চিহ্ন লোপ করিবার চেষ্টায় ছিল।

কার্য্যতঃ তুর্কী সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছে—থ্রেস, মিশর সিরিয়া, আরব, মেসোপোটেমিয়া, পেলেষ্টাইন, সবই গিয়াছে। ইহার কোন দেশই স্বাধীন করা হয় নাই। মিত্র শক্তিরা সব ভাগ করিয়া লইয়া গিয়াছে; ইংরাজ নিয়াছে মিশর, পেলেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া, আরবদেশও সে দখল করার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ইবন সয়ুদ আসিয়া তাহার সে আশা নিষ্ফল করিয়াছে। ফ্রান্স নিয়াছে সিরিয়া; এইভাবে সকলে ভাগ করিয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কোন মত তাহারা গ্রহণ করে নাই।

মিত্র শক্তিবর্গ যখন তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে নিতেছিল, তখন এক স্বদেশপ্রেমিক বীর তুরস্কের সম্মান রক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন। আজ মুস্তাফা কামালপাশা মুষ্টিমেয় স্বদেশপ্রেমিক বীরের সাহায্যে তুরস্কের ও সমস্ত প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

গত মহাযুদ্ধে ও তুরস্ক

গত মহাযুদ্ধে তুরস্ক যে পক্ষে যোগ দিয়াছিল, সেই পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। তাই শত্রু মিত্র সকলেই জার্ম্মেণীর সহিত যোগ দেওয়ার জন্য তুরস্ককে দোষ দিয়াছে। Nothing succeeds like success'। যদি জার্ম্মেণী জয়যুক্ত হইত তবে, সকলেই তুরস্কের এই কাজ সমর্থন করিত। তুরস্কের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে কোন না কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে খুবই সমীচিন ছিল। এনভার পাশা ও তাঁহার বন্ধুরা বুঝিলেন এই মহাযুদ্ধের সময় কোন পক্ষে যোগ দিয়া, বৈদেশিক মুরুব্বীদের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। জার্ম্মেণী জয়যুক্ত হইলে, হয়ত তাহাই হইত; অথবা তুরস্ক ইংরাজের সহিত যোগ দিলেও তাই হইত। তাই মনে হয়, যুদ্ধে যোগ দেওয়া, তাহার পক্ষে অন্যায় কিছুই নয়—কোন না কোন পক্ষে তাহাকে যোগ দিতে হইতই। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন পক্ষে যোগ দিবে।

১৯১৪ অব্দের ২রা আগষ্ট জার্ম্মেণী ও তুরস্কের সহিত এক গোপন সন্ধি হয়। তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে যে কেবল অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার মধ্যে লড়াই হইলে, কেহই কোন পক্ষে যোগ দিবে না; কিন্তু যদি রুষিয়া সার্ভিয়ার পক্ষে যোগ দেয়, তবে জার্ম্মেণীকে অষ্ট্রীয়ার সহিত যোগ দিতে হইবে. সেই অবস্থায় তুরস্কও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করার পূর্ব্বের দিন (১লা আগষ্ট) জার্ম্মেণী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কাজেই এই সন্ধি অনুসারে তুরস্ক জার্ম্মেণীর পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য। কিন্তু তবুও তাহারা তিনমাস পর্য্যন্ত কিছুই করে নাই। প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হালিম পাশা আগষ্ট মাসেই মিত্রশক্তির সহিত একটা আপোষ করার চেষ্টা করেন। তিনি মিত্রশক্তিকে জানান যে তাহারা যদি তাহাদের অন্যায় অপমানসূচক দাবী-গুলি (Capitulation) সব রহিত করিয়া তুরস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার দেয়,তবে তুরস্ক জার্ম্মেণীর সহিত যোগ দিবে না। তখনও প্রধান মন্ত্রী, হালিম পাশা, টালাৎ পাশা, ও জেমাল পাশা এই মতই সমর্থন করিতেন। কিন্তু মিত্রশক্তির নিকট কোন ভরসাই না পাইয়া, অবশেষে টালাৎ ও জেমাল এনভারের মতা-বলম্বী হইয়া, জার্ম্মেণীর সহিত যোগ দিতে রাজী হইলেন। ২৯শে নভেম্বর দুইখানা তুর্ক টর্পেডো জাহাজ ওডেসা বন্দরে প্রবেশ করে এবং একখানা রুষ কামান-পোত (gun boat) জলমগ্ন করে। জার্ম্মেণীর রণতরী ডার্ডানেলিস পার হইয়া কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করে। তুরস্ক তখনও ইংরাজ বা ফরাসীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা

করে নাই। ৫ই নভেম্বর সম্মিলিত মিত্রশক্তি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

যুদ্ধে যোগ দিবার দুই বৎসর পরই, তুরস্ক বিদেশীর সব বিশেষ দাবী ও সুবিধা (Capitulations) রহিত করিয়া দিল এবং মিত্র জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রীয়াকে এবং নিরপেক্ষ শক্তিসমূহকে জানাইলে যে, ১৮৫৬ অব্দের প্যারী ও ১৮৭৮ অব্দের বার্লিন সন্ধি আর তাহারা মানিতে বাধ্য নয়। বার্লিন সন্ধির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্যারীর সন্ধিতে নির্দ্ধারিত হয় যে কৃষ্ণসাগর এখন হইতে নিরপেক্ষ (neutralised) থাকিবে অর্থাৎ কোন জাতি বিশেষের কোন অধিকার ইহাতে থাকিবে না, কোন জাতির রণপোত এই সাগরে থাকিতে বা যাইতে পারিবে না, এমন কি কৃষ্ণসাগরকূলবর্ত্তী তুরস্ক বা রুষিয়ারও নয়; কোন জাতিই এই সাগরের পারে কোন দুর্গ প্রাকারাদি তুলিতে পারিবে না; তুরস্কের স্বাধীনতা ও ঐক্য (integrity) সব শক্তিই মানিয়া লইয়া স্বীকার করিল যে কেহই তুরস্কের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। অথচ রুষিয়া এই সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিত না।

তুরস্ক সকলকে জানাইল "এই দুই সন্ধির সর্ত্ত কোন জাতিই মানে না। যেটুকু তাহাদের অনুকূল ও তুরস্কের প্রতিকূল, কেবল সেই সব সর্ত্তগুলিই তাহারা জোর করিয়া চালায়, কিন্তু যে সব সর্ত্ত তুরস্কের অনুকূল, তাহার একটাও তাহারা মানিয়া চলে না। ফরাসী, ইটালীয়, ইংরাজ বা রুষ—কেহই আমাদের

লুণ্ঠন করিতে বা আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কসুর করে নাই। অথচ তুরস্ক সরকার সর্ব্বতোভাবে তাহার দিক হইতে সব চুক্তি মানিয়া লইয়াছে। অতএব আমরা এই দুই সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত ও দাবী রহিত করিলাম।”

যুদ্ধের ফলাফল সবাই জানেন। জার্ম্মেণী ও তাহার মিত্ররা পরাজিত হইল। প্রথমে বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করিল—পরে তুরস্কও জানাইল যে রাষ্ট্রপতি উইলসনের (President Wilson) প্রস্তাবিত সন্ধি সর্ত্তের ‘১৪ দফা’ (fourteen points) * অনুসারে সেও আত্মসমর্পণ করিতে রাজী। কিন্তু মিত্র শক্তি তখনও তাহাদের এই নিবেদনে কান দিল না—কারণ তখনও সিরিয়া দখল হয় নাই। ২৬শা অক্টোবর আলেপো (Allepo) দখল করিয়া, সিরিয়া হস্তগত করিল এবং ৩১শে অক্টোবর (১৯১৮) তুরস্কের সহিত অবহার বা যুদ্ধবিরতি পত্র (armistice) সাক্ষরিত হইল।

কিন্তু যুদ্ধ বিরতির পূর্ব্বেই মিত্র শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে তুরস্কের রাজ্য ভাগ বাটরা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি উইলসনের প্রশ্নের উত্তরে মিত্র শক্তিরা তাঁহাকে জানায় যে, এই যুদ্ধে তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ইউরোপ হইতে

* উইল সনের “১৪দফার” মধ্যে তুরস্ক সম্বন্ধে ছিল—The Turkish parts of the present Ottoman Empire should be assured of secure sovereignity but the other nations now under Turkish rule should be assured security of life and antonomous development.”

তুরস্ককে বিদায় করা—কারণ সুসভ্য ইউরোপে বাসের যোগ্যতা তাহার নাই এবং তুরস্কের অধীন জাতিসমূহকে স্বাধীন করাও তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৯১৬ খৃঃ অব্দের মে মাসে মিত্র শক্তিরা নিজেদের মধ্যে একটা গোপন সন্ধি করে। তাহাতে ঠিক হয় যে আর্মেনীয়া, পূর্ব্ব এনাটোলিয়া, কনষ্টেন্টিনোপল ও ডার্ডানেলিস্—রুষিয়ার হাতে যাইবে; সিরিয়া ও মসুল ফরাসী পাইবে; মেসোপোটেমিয়া ও বাগদাদ ইংরাজের ভাগে পড়িবে। ১৯১৭ অব্দে আর এক সন্ধি করিয়া পশ্চিম এশিয়া মাইনর, স্মার্ণা ও এডালিয়া (Adalia) ইটালিকে দেওয়া হইল, পেলেষ্টাইন সর্ব্বজাতি সম্পত্তি (internationalised) হইবে এবং আরবকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা হইবে। অর্থাৎ তুরস্কের সমস্ত রাজ্যই ভাগ বাটারা করা হইল। অথচ ইংরাজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ ভারতের সাহায্য পাইবার আশায় বহুবার বলিয়াছেন যে তুরস্কের সুলতানের রাজ্য হ্রাস বা ক্ষমতা হ্রাস বা তাহার রাজ্যের কোন অংশ আত্মসাৎ করার কোন মতলব মিত্র শক্তিদের নাই। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে এই প্রকার অসত্যভাষণই শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের পরিচয়।

১৯১৭ অব্দের চুক্তিমতে ইটালীকে স্মার্ণা দেওয়া হইবে। কিন্তু যুদ্ধের পর স্মার্ণা ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলি গ্রীসকে দিবার প্রস্তাব হয়। আডালিয়া, সিলিসিয়া, ক্রুসা প্রভৃতি স্থান ইটালীকে দিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইটালী চায় একটি বন্দর—স্মার্ণার পরিবর্ত্তে অন্য একটি বন্দর না পাইলে তাহার

চলে না। তাই স্মার্ণা প্রদেশের নিকট স্কালানভাতে (Scala Nuava) একটি বন্দর স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া, সেই প্রদেশটা দাবী করিল।

উত্তর পূর্ব্বের যে প্রদেশগুলি রুষিয়ার পাইবার কথা ছিল, রুষিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ হওয়ায়, তাহা আর রুষিয়াকে দেওয়া হইবে না। রুষিয়া যতদিন অত্যাচারী জারের অধীন ছিল, ততদিনই মিত্রশক্তির বন্ধু ছিল; কিন্তু সাম্যবাদী বলশেভিক রুষিয়ার সহিত তাহাদের মিত্রতা সম্ভব নয়। জর্জিয়া, এজারবেজান ও আর্মেনিয়াকে মিত্রশক্তিরা স্বাধীন গণতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবে, ঠিক হইল—কিন্তু ককেসাসকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিতে রাজি হইল না; কারণ জারপন্থী রুষ সেনাপতি ডেনিকিন (Denikin) তখন ককেসাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাই ককেসাস সম্বন্ধে কোন মত দেওয়া ঠিক নয়। বিশেষ ডেনিকিন ও কলচাক (Koltchak) দাবী করিলেন যে তাঁহাদের জয়ের পর ভাবী জারের জন্য এই প্রদেশটি রাখিতেই হইবে। অপর দিকে, বলশেভিকগণ যদি নিতান্তই ডেনিকিন ও কলচাককে পরাজিত করিয়া, রুষিয়াতে কায়েমী অধিকার স্থাপন করে, তবে তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়ার মত ২।১টা রাষ্ট্র থাকা দরকার। তাই মিত্রশক্তি জর্জিয়া, এজারবেজান ও আর্মেনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রভাবে দাঁড় করাইতে রাজী হইল।

কনষ্টেণ্টিনোপল ও মর্ম্মরা সাগর সর্ব্বজাতি সম্পত্তি (internationlised) হইবে। আরব দেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু আরব রাজ্য লইয়া মহাগোলমাল উপস্থিত হইল। মুসলমানগণ বলে জাজুরৎ-উল-আরব (বা আরব দ্বীপ) অর্থাৎ আরব, মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া ও পেলেষ্টাইন অতি পবিত্রস্থান এবং এই সব দেশে কোন অ-মুসলমান জাতির আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। মক্কার শেরিফ হুসেন যুদ্ধের সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, মিত্রশক্তি তাঁহাকে হেজাজের রাজা (king) বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহার দুই পুত্র আমির ফৈসুল ও আমির আব্দুল্লা সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার রাজ্য দাবী করিল। অবশ্য মিত্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে (mandate) এই দুই রাজ্য থাকিবে।

ভাগ বাটারা সবই ঠিক হইল—কিন্তু ইতিমধ্যে মিত্রদের মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বেষ আরম্ভ হইল। ইটালীর গোসা হইল যে তাহার এত সাধের স্মার্ণা হাত ছাড়া হইল—কোথা হইতে গ্রীস উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল! ফরাসীর মান হইল ইংরাজ তলে তলে আমির ফৈসুলকে উস্কাইয়া দিয়া, সিরিয়াতে ফরাসী অধিকারের পরিবর্ত্তে ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। যখন প্যারী-সন্ধি-সভা এই সব বিষয় আলোচনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় গ্রীস স্মার্ণাতে একদল সৈন্য পাঠাইল। ইটালী ও ফ্রান্স এই কাজটা ঠিক পছন্দ করিল না। ৩১শে অক্টোবর প্রধান মন্ত্রী ইজ্জৎ পাশা (Izzet Pasha) মিত্র শক্তির সহিত অবহার

(armistice) করেন। এই অবহার পত্রের সর্ত্ত অনুসারে তুরস্কের সমস্ত রেল ও বন্দর বর্ত্তমানে মিত্রদের অধিকারে থাকিবে এবং কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে সুবিধা মত (strategic) স্থান সকলও তাহারা দখল করিতে পারিবে। তুরস্ক এই পত্রের কোন চুক্তিই ভঙ্গ করে নাই—কিন্তু ইংরাজ গ্রীসকে স্মার্ণা অধিকার করিতে দিয়া সেই অবহার পত্রের সর্ত্ত ভঙ্গ করিল। অথচ স্মার্ণাতে তুর্কী অধিবাসীই বেশী।

১১ই জুন (১৯১৯) তুরস্ক প্রতিনিধিদের এই সব সর্ত্ত জানান হইল। তখন তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন দামাদ ফেরিদ পাশা। দামাদ ফেরিদ পাশা সন্ধি-সভাকে জানাইলেন যে তুরস্কের যে অপরাধ, তাহা সবই নব্য তুরস্ক দলের—সেই একটা দলের ভুলের বা অপরাধের জন্য সমস্ত তুরস্ক জাতিকে এই ভাবে শাস্তি দেওয়া অন্যায়। মিত্র শক্তিবর্গ তাহাদের জানাইল যে তাহাদের কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করা হইবে না এবং তুর্কীগণ এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিবার অযোগ্য। বাস্তবিকই পরের দেশ শাসন করার একমাত্র যোগ্য পাত্র হইল শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জাতিগুলি—তাই বেচারারা দুঃসহ পরের বোঝাটা (white man's burden নিয়া বেড়াইতেছে !

ইতিমধ্যে ভারতীয় অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ হইল। বিকানিরের মহারাজা, ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুর মারফৎ ভারতের পক্ষ হইতে এই সব প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ভারতের এই প্রতিবাদ ইংল্যাণ্ড বা মিত্রগণ তেমন

গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু যখন নানাদিক হইতেই সন্ধি সর্ত্ত কাজে লাগানো অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা তাহারা চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে মিত্রশক্তি তুরস্ক সন্ধি প্রস্তাবের পুনর্বিবেচনা করিতে রাজী হইল।

জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা

তুরস্ক সরকার মুস্তাফা কামাল পাশাকে আমেসিয়ায় (Amasia) পাঠাইয়াছিল। ১৯১৯ অব্দের জুলাই মাসে তাঁহাকে কনষ্টেণ্টিনোপলে ডাকিয়া পাঠান হইল—কিন্তু তিনি সরকারের এই আদেশ মানিলেন না। রৌফ বের (Reouf Bey) সহায়তায় তিনি আনাটোলিয়াতে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেলোনিকায় কামালের জন্ম। ১৯০৮ অব্দের বিদ্রোহ ও বল্কান যুদ্ধে চেটালজা (Chatalja) দুর্গে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'ঐক্য ও উন্নতি সমিতি'র সভ্য ভাবে, তিনি কিছুদিন এনভারের সহকর্ম্মী ছিলেন—কিন্তু ক্রমে উভয়ের মধ্যে মতান্তর মনান্তরে দাঁড়ায়। তাই উপেক্ষা প্রদর্শনার্থ (in disgrace) এনভারের দল তাঁহাকে মেসোপোটেমিয়ায় পাঠায়। কিছুদিন

যাবত তিনি রাজনীতির চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া, সামরিক কার্য্য ও শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার বড় ছিল না—তিনি ছিলেন দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

যুদ্ধের পর মিত্র শক্তির বিশ্বাসঘাতকায় ও অন্যান্য জুলুমে, যখন তুরস্কের ধ্বংস প্রায় অবধারিত হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার সবচেয়ে দুঃখের কারণ হইল এই যে স্থলতান ও মন্ত্রীসভা এই ধ্বংসের পথ রোধ করিবার কোন বাধাই দিল না। ভীরু, কাপুরুষের মত তাহারা মিত্র শক্তিকে তোষামোদ করিতেই ব্যস্ত। কামালের নিকট ইহা অসহ্য বোধ হইল। তিনি ঠিক করিলেন সরকারের আওতা হইতে দূরে যাইয়া জাতীয়পন্থীদের একত্র সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন এবং মিত্রশক্তিকে বাধা দিবেন—দরকার হইলে স্থলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। নৌ-সেনাপতি রৌফ বে কামালের সহযোগী হইলেন এবং তাঁহার সহিত বহু নৌ-সেনাপতি জাতীয় দলে যোগ দিল। বিখ্যাত সেনাপতি আলি ফুয়াদ পাশাও (Ali Fuad Pasha) এই দলে যোগ দিলেন। এই তিন জন দেশ ভক্তের বহু অভিজ্ঞ অনুচরও এই দলে আসিল। ক্রমে আরও অভিজ্ঞ সেনাপতি ও রাজ-নীতি বিশারদ কামালের নেতৃত্ব মানিয়া কনষ্টেণ্টিনোপলের সর-কারের ও মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

কামাল দেশে ঘোষণা করিয়া দিল যে কনষ্টেণ্টিনোপল সরকার জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে—যাহারা দেশ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চায়, তাহারা যেন জাতীয় দলে যোগ দেয়।

কামালের তখন মাত্র দুইটি সৈন্য-বাহিনী ছিল। এই ঘোষণার পর বহু তুর্কী যুবক স্বেচ্ছাসেবকভাবে তাঁহার সৈন্যদলে যোগ দিল। সেনাপতি বেকির সামি (Bekir Sami) ১০ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। তুরস্কের জনসাধারণ কামালের এই প্রচেষ্টাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়া লইল। মিত্রশক্তির প্রস্তাবিত সন্ধি সর্ত্তে প্রায় সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কিছু করিবার উপায় তাহাদের বুদ্ধিতে ও সাহসে যোগাইতেছিল না। কামাল যখন এই অসমসাহসিক কাজ আরম্ভ করিল, তখন সকলেই বুঝিল ঠিকই হইতেছে। কামালের দলে তখনই যোগ দেওয়ার মত বেশী লোক ছিল না, কিন্তু অনেকেই কামালের সমর্থক ছিল। বাস্তবিক সকল দেশেই প্রথম বিদ্রোহ যখ আরম্ভ হয়; তখন সেই বিদ্রোহী দলে খুব বেশী লোক থাকে না, কিন্তু ক্রমেই বিদ্রোহের আগুণ সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৬ অব্দের ইষ্টার বিদ্রোহের পূর্ব্বে আইরিস বিদ্রোহীনেতা পিয়ার্স বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের আরব্ধ বিদ্রোহ দেশবাসী সাদরে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের প্রচারিত গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য দলে দলে লোক প্রাণ দিবে। মুষ্টিমেয় 'আইরিস গণতন্ত্রী-বাহিনীর' (I. R. A.) লোক পরাজিত হইল; কিন্তু ৩ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত আইরিস জাতি লড়াই করিয়া ইংরাজকে পরাজিত করিয়াছে। চীন বিদ্রোহেও তাই হইয়াছে—ভারতের বিদ্রোহীরাও আশা করিয়াছিল ১৯১৫ অব্দে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীরা দেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করিলে, ভারতের বিরাট গণদেবতা সেই

বিদ্রোহকে সমর্থন করিবে। প্রথম ধাক্কা দেওয়ার দুঃসাহস সাধারণ লোকের হয় না ; কিন্তু কেহ প্রথম কাজ আরম্ভ করিলে, তাহারা তাহাতে যোগ দিতে সদাই প্রস্তুত—এবং এই সম্ভাবনা ও আশাকে নিশ্চিততর করিবার জন্য দেশে, অশান্তি, অসন্তোষ ও শাসকদের প্রতি অবিশ্বাস প্রচার করা দরকার।

২৩শে জুলাই আর্জেরামে (Erzurum) জাতীয় দলের এক কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেস হইতে কনষ্টেন্টিনোপলস্থ মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের (High Commissioners) জানান হইল যে, জাতীয় দলের উদ্দেশ্য তুরস্কের ঐক্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখা, অমুসলমান জাতিদের আত্মকর্তৃত্ব (autonomy) দেওয়া ও অবহারের (armistice) সময় যে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল তাহাতে কোন বৈদেশিক শক্তিকে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়া। অবশ্য কোন পাশ্চাত্য জাতি যদি বাস্তবিকই তুরস্কের পুনর্গঠনে কোন সাহায্য করিতে চায়, তবে তাহারা সাদরে গ্রহণ করিবে। কয়েক মাস পরে সিভাসে (Sivas) আবার জাতীয় দলের আর এক বৈঠক হয়—তাহাতেও এই সব প্রস্তাব পাশ হইল।

জাতীয় দলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল। কামাল হইলেন সভাপতি—রৌফ বে, বেকির সামি বে, হেজা রাইফ এফান্দি ও আরও ২।৩ জন এই সভার সভ্য হইলেন। কারা বেকির কাইজিম পাশা পূর্ব্ব এনাটোলিয় জাতীয় সৈন্যের সেনাপতি হন এবং পশ্চিম এনাটোলিয় সৈন্যের সেনাপতি হইলেন আলি ফুয়াদ পাশা। কনাষ্টেন্টিনোপলের তুরস্ক সরকার দেখিল

জাতীয় দলই দেশে প্রধান হইয়া উঠিতেছে। তাই তাহারা মুস্তাফা কামাল পাশার নিকট দূত পাঠায়, যাহাতে তিনি এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। তাহাদের এই ফন্দি ব্যর্থ হইলে পর, কামাল পাশা নামেই অপর একজন সেনাপতিকে পাঠান হইল। কিন্তু তিনিও কিছুই করিতে পারিলেন না। কামাল এখন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সাম্রাজ্যের তুর্কী বাসেন্দাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর দিকে ইংরাজ ও রাজা হুসেনের উৎসাহে তুরস্ক সাম্রাজের আরব বাসেন্দাগণ নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইল।

কামালের এই প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপীয় তুরস্কেও জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফেরিদ পাশার বিরুদ্ধে জনমত বেশ প্রবল হইয়া উঠিল। সুলতান বাধ্য হইয়া দামাদের পরিবর্ত্তে আলি রিজাকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ক্রমে সিলিসিয়াতেও (Cilicia) জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল। সিরিয়ার অন্তর্গত মারাষ (Marash) জেলাতেও গোলমাল আরম্ভ হইল। ফরাসী সেনাপতি ডুঁতো (Dutieun) মারাষে একদল সৈন্য পাঠাইলেন—তুর্কী ও আরব বাহিনী তাহাদের আক্রমণ করিল। বহুকষ্টে নূতন একদল সৈন্য যাইয়া তুর্ক সৈন্যদের হাত হইতে ফরাসী বাহিনীকে উদ্ধার করিল, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ফরাসীরা মারাষ সহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। ঠিক এই সময় উর্ফা (Urfa) সহরের ফরাসী বাহিনীও তুর্ক সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হইল—তুর্কগণ উর্ফা অবরোধ করিল

এবং কিছুদিন পরেই ফরাসীরা তুর্কদের হাতে নগর ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পথে আবার তুর্কগণের আক্রমণে এই ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল। এদিকে এইণ্টাবের (Aintab) আমেরিকানগণও তুর্কদের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

এই সময়েই (১৯২০ ফেব্রুয়ারী) তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মিত্রশক্তিদের জানাইলেন যে, মিত্রশক্তিরা যেভাবে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে ও যেভাবে তাহারা সন্ধির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে দেরী করিতেছে, তাহাতেই জাতীয় দল আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার ফলে মিত্রপক্ষের ও তুরস্কের উভয়েরই ক্ষতি হইতেছে। মিত্রপক্ষও বুঝিল, নিজেদের মধ্যে ভাগবাটারার সুব্যবস্থা না হওয়ায় প্রায় দেড় বৎসর অপেক্ষা করা অন্যায়। অথচ অবহারের সর্ত্ত অনুসারে, তুরস্কের সব বন্দর ও রেল লাইন মিত্রপক্ষের হাত রহিয়াছে। মিত্রপক্ষের আহ্বানে তুর্কী প্রতিনিধি একবার প্যারী যাইয়া ফিরিয়া অসিয়াছেন। ইহাতেও তুর্কগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছে—কারণ জাতীয় পক্ষে ইহা অপমান।

ফেব্রুয়ারী মাসেই আবার বৈঠকে তুর্কী সন্ধি সম্বন্ধে অলোচনা আরম্ভ হইল। ইংরাজ বলিল কনষ্টেন্টিনোপল হইতে তুর্কীকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। কিন্তু ফরাসী ইহাতে আপত্তি করিল। কিছুদিন পরে ইংরাজ-মন্ত্রীসভার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাহারা বুঝিল, তুরস্ককে বেশী ঘাটাইলে

তুরস্কের পক্ষে বলশেভিকদের সহিত মিত্রতা করা সম্ভব এবং সেই অবস্থায় ইংরাজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের বিপদ নিতান্ত অসম্ভব নয়। * ইংরাজগণ তুরস্ক সরকারকে জানাইল যে তুরস্ক সরকার যদি সুবোধ বালকের মত চলে তবে, কনষ্টেণ্টিনোপল তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইবে না। কিন্তু এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া, হঠাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইংরাজের নৌ-বাহিনী কনষ্টেণ্টিনোপলে গেল। কনষ্টেণ্টিনোপল, পেরা ও স্কুটারীর (Skutary) রাস্তায় ইংরাজ সৈন্যরা দলে দলে কাওয়াজ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে বিলাতে ও আমেরিকায় বড় বড় ধর্ম্মযাজকগণ, রাজনৈতিকগণ এবং এমন কি শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক-গণও (Socialists) কনষ্টেণ্টিনোপল হইতে তুর্কীকে তাড়াইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল।† তাহাদের ইচ্ছা কনষ্টেণ্টিনোপলকে সর্ব্বজাতি সঙ্ঘের হাতে দিয়া তুরস্কের সুলতানকে এসিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়; কারণ মুসলমান শাস্ত্রে এমন নিয়ম নাই যে খলিফাকে কনষ্টেণ্টিনোপলেই থাকিতে হইবে। তাহারা ইহাও বলিল, তুর্কীগণ প্রায় পাঁচ

* Mr. Winston Churchill said :—
"New forces are now rising in Asia Minor and if Bolshevism and Turkish Nationalism should unite, the outlook would be a serious one for Great Britain."
—The Turks and Europe, P. 150.

† Bishop of London, Bishop of New York, Arch-Bishop of Canterbury, Lord Robert Cecil, J. H. Thomas, Lord Bryce, Prof. Oman, Dr Burrowo (Principal King's College) Mr. Hyndman (Socialist), President Wilson.

শত বৎসর এই নগরের উপর অত্যাচার করিয়াছে; তাহাদের মত দুর্ব্বল ও দুষ্ট লোকের হাতে এই নগর থাকিলে ঐ দিককার আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মীমাংসা কখনও হইবে না।

অবহারের পর ইংল্যাণ্ড "ঐক্য ও উন্নতি সমিতির" বহু সভ্যদের নির্ব্বাসিত করে। এনভার ও টালাৎ বার্লিনে পলাইয়া যান। সন্ধি সভায় ইংরাজ দূত প্রস্তাব করিল যে, war criminal ভাবে জার্ম্মেণীর নিকট এই দুইজনকে দাবী করা হউক। কিন্তু জার্ম্মেণী এই দাবী গ্রাহ্য করিবে না বুঝিয়া সন্ধি সভা ইহা অনুমোদন করিল না। অথচ অবহারের সময় এমন কোন সর্ত্ত করা হয় নাই যে ইহাদের বিচার হইবে। দামাদ ফেরিদ ১৩০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে; ইংরাজেরা তাহাদের মধ্যে ৫৪ জনকে মাল্টাতে নির্ব্বাসিত করিল—তাহার মধ্যে একজন ছিলেন সেখ-উল-ইস্‌লাম হাইরি এফেন্দি। যে সব সেনাপতিরা যুদ্ধের সময় ইংরাজদের পরাজিত করিয়াছিল, ইংরাজ এইবার তাহাদের বাগে পাইয়া প্রতিশোধ তুলিতে লাগিল।

১৬ই মার্চ্চ মিত্রশক্তি তুরস্কের সরকারী অফিসগুলি সব দখল করিল। মিত্রশক্তিদের নামে এই সব হইলেও,কার্য্যতঃ ইংরাজরাই সব করিল। কনষ্টেন্টিনোপলের সমস্ত মিত্রশক্তির সেনাপতি ছিলেন একজন ফরাসী সেনাপতি। তিনিই যুদ্ধের সময় বুলগার ও তুরস্ক বাহিনীকে পরাজিত করেন। অথচ এখন তাহারই অধীন ইংরাজ সেনানী মিল্‌নে (Milne) আজ তাঁহাকে উপেক্ষা

করিয়া মিত্র সৈন্যের ভার লইয়া তুরস্ক সরকারী অফিসগুলি দখল করিল। বুলগেরিয়ার পরাজয়ের পর ইংরাজ দাবী করিল যে কনষ্টেন্টিনোপলের দিকে যে সৈন্য যাইবে তাহার সেনাপতি হইবে ইংরাজ। ফরাসী ইহাতে আপত্তি না করিয়া, সেনাপতি মিল্‌নেকে ঐ বাহিনীর ভার দিল। ফরাসী সেনাপতি যদিও নামে ইউরোপীয় তুরস্কে মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি মিল্‌নের অধীন হইলেন। ফরাসীদের তখন এমন সাধ্য ছিল না যে ইংরাজের বিরাগ উৎপাদন করে; তাই এই অপমানও সহ্য করিয়াছিল। এখনও ফ্রান্স ও ইটালী ইংরাজ সেনাপতি মিল্‌নের এই কাজ ঠিক পছন্দ করিল না; কিন্তু বাধা দিবার মত ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। মিল্‌নে একদল তুরস্ক সেনাপতিকে বন্দী করিলেন। তুরস্ক প্রতিনিধি-সভার বৈঠকের সময়, সেই সভাগৃহ হইতে কয়েকজন সদস্যকেও ইংরাজরা বন্দী করিল। কার্য্যতঃ প্রতিনিধি-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী জেমাল, জেভাদ ও মহম্মদ পাশাকে অপমানিত ও বন্দী করা হইল। ইংরাজ সৈন্যরা তাঁহাদের হারেমে ঢুকিয়া, বাড়ীর মহিলাদের নানা প্রকার ভয় দেখাইল। রাত্রির পোষাকে হাতকড়ি দিয়া এই সব ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের জেলে পাঠান হইল। ইহাদের অপরাধ, ইংরাজ মনে করিল ইঁহারা স্বদেশভক্ত এবং তাই হয়ত ইংরাজের কার্য্যে বাধা দিবেন। তুর্কী পত্রিকাগুলি হাত করিবার জন্য এইবার ইংরাজের চেষ্টা আরম্ভ হইল। কতক সে প্রলোভনে বশ করিল, কতক ভয় দেখাইয়া বশ করিল;

যাহারা কোন প্রকারেই বশ হইল না তাহাদের পরিচালককে বন্দী করিল। কনষ্টেণ্টিনোপলে 'ইংরাজের মিত্র সঙ্ঘ' (Club of Friends of England) স্থাপিত হইল। ইংরাজ দূত এই সঙ্ঘে অর্থ সাহায্য করিয়া ইহার মারফত তুরস্কে ইংরাজের সুখ্যাতি প্রচার করাইতে লাগিল।

ইংরাজরা ক্রমে নৌ, সমর,ডাক, বিচার, পুলিশ, জেল বিভাগ —এক কথায় সমস্ত তুরস্ক সরকার নিজের হাতে লইল। কনষ্টেণ্টিনোপল দখল করার পরদিনই মিল্‌নে প্রধান মন্ত্রী সলি পাশাকে (Salih Pasba) পদত্যাগ করিতে বলিল—কারণ তাহার মতে প্রধান মন্ত্রীর উপর প্রতিনিধি সভার বিশ্বাস নাই। সলি পাশা প্রথমে রাজী হইলেন না। মিল্‌নে তাঁহাকে জানাইল যে, যদি কোন মন্ত্রী নিজ বিভাগীয় অফিসে যায়, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। জেলাম প্রভৃতির প্রতি সুসভ্য ইংরাজ সেনাপতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহার আজ্ঞার প্রতিকূলে চলার অর্থ জাতির ভাগ্যে আরও অপমান ডাকিয়া আনা। তাই অবশেষে জেলাম পদত্যাগ করিলেন। আবার দাবাদ ফেরিদ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু ইংরাজের এই সব বর্ব্বর আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিনিধি-সভা স্থগিত রহিল। নানা স্থান হইতে তুরস্ক দেশসেবকগণ ইটালী ও ফ্রান্সের নিকটও তীব্র প্রতিবাদ করিল।

তুরস্কে কেহই ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিত না। মন্ত্রী ও সুলতান দুইই দুর্ব্বল ও অপদার্থ ; ইংরাজকে

প্রতিরোধ করার তত ইচ্ছাও এদের ছিল না। এরা বরং ইংরাজ হইতে কামালকেই তুরস্কের বড় শত্রু মনে করিত। দেশী সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই ইংরাজের বশ,—যে ২।১ খানা কাগজ বশ হয় নাই, তাহারাও স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিত না। এমন কি ফরাসী বা ইটালীয় পত্রিকার মতামত উদ্ধৃত করার স্বাধীনতাও ইহাদের ছিল না। একটা ফরাসী কাগজে বাইবেলের কয়েকটা উক্তি তুলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। কিন্তু তুরস্ক কাগজগুলিকে সেই বাইবেলের উক্তিগুলিও উদ্ধৃত করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার একটি উক্তি এই—In that day shall there be a high way out of Egypt to Assyria and the Assyrians shall come into Egypt and the Egyptian into Assyria and the Egyptians shall serve with the Assyrians"—(chap xix of Assiah). ইংরাজরা ভয় করিল এই উক্তি হইতে তুর্কীগণ মিশরবাসীদের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইতে পারে। খৃষ্টান ইংরাজ পররাজ্য লুণ্ঠনের জন্য বাইবেলকেও অপাঠ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কাজেই আমাদের দেশে যে ইংরাজ ভারতীয় যুবকদের পক্ষে গীতাকে অপাঠ্য মনে করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্থলিপ্সা মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকেও অতিক্রম করিয়া যায়। তাই বোধ হয় অধ্যাপক মার্শেল তাহার অর্থনীতির গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে economic instinct মানব মনের অন্যতম আদিম বৃত্তি।

সেভ্রে সন্ধি সর্ত্ত

১৯১৬ অব্দের গোপন চুক্তি অনুসারে মসুল ও সিলিসিয়া ফরাসীর ভাগ্যে পড়িবে। ফরাসী চেম্বারে এম, ব্রায়েঁ (Briand) বলিয়াছিলেন, "সিরিয়া ও সিলিসিয়ার অধিবাসীদের একান্ত ইচ্ছা আমরা তাহাদের অভিভাবক হই। তাই লড়াই শেষ হইবার পূর্ব্বে এই দুই প্রদেশ আমরা পাইব এই চুক্তি হয়। অবশ্য মসুল ও সিলিসিয়াতে আমাদের স্বার্থও আছে। মসুলের তেল ও সিলিসিয়ার তুলা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। কিন্তু আজ ইংরাজ আমির ফৈসুলকে দাঁড় করাইয়া মসুল দাবী করিতেছে।" বর্ত্তমান জগতে তৈল হইল যান্ত্রিক-সভ্যতার (industrial civilisation) প্রধান উপকরণ। ব্যবসায়, বাণিজ্য, রণপোত, বাণিজ্যপোত, আকাশপোত, বিলাস—এই সবই

কামাল পাশা।

নির্ভর করে খনিজ তৈলের উপর। তাই মসুলের প্রতি ইংরাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়া খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই আমির ফৈসুলের নামে ইংরাজরা মসুল দাবী করিল। ফরাসীরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল। এদিকে গ্রীসকে স্মার্ণা দেওয়ায়, ইটালীও অসন্তুষ্ট হইল। এই সব গোলমালের কোন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুরস্কের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হইতে পারে না। অথচ সন্ধি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত, মিত্র-শক্তির সৈন্যবাহিনী তুরস্কের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া অল্পে অল্পে তাহার জীবনী শক্তিটুকু চুষিয়া খাইতেছিল।

সুচতুর ইংরাজ রাষ্ট্রপতি উইলসনকে হাত করিল। কনষ্টেন্টি-নোপল হইতে তুরস্ককে নির্ব্বাসিত করা ও তাহার রাজ্য ভাগ বাটারা করা সম্বন্ধে উইলসন ইংরাজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ হইতেও এক কাঠি উপরে উঠিলেন। অপর দিকে তুরস্ক সরকারকে হাত করার জন্যও ইংরাজ সচেষ্ট হইল। ইংরাজের পক্ষে চার্চ্চিল ও তুরস্কের পক্ষে দামাদ ফেরিদ—এক চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই চুক্তি অনুসারে ঠিক হইল যে, সুলতান ইংরাজের তাবেদার হইয়া থাকিবেন এবং তুরস্ক, মর্ম্মরা সাগর ও কনষ্টেন্টিনোপলে ইংরাজের আধিপত্য থাকিবে; সুলতান কনষ্টেন্টিনোপলেই থাকি-বেন, এবং খলিফা ভাবে সমস্ত মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুও থাকিবেন। তিনি সিরিয়া, ইরাক ও অন্যত্র ইংরাজের কর্ত্তৃত্ব ও শাসন সমর্থন করিবেন, স্বাধীন কুর্দিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দিবেন না এবং মিশর ও সাইপ্রাসের উপর তাহার সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করি-

বেন। অর্থাৎ ধর্ম্মগুরু খলিফার অনুমোদন ও ফতোয়ার দ্বারা, ইংরাজ সমস্ত মুসলমান জগতে এবং বিশেষ ভাবে ভারতে ও তুরস্ক রাজ্যে নিজ কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া কনষ্টেণ্টিনোপলে থাকিতে এবং সুলতান ও খলিফা উপাধি ধারণ করিতে অনুমতি দিবে। দামাদ ও সুলতান মহম্মদ ইংরাজের পায়ে নিজেদের দেশ ও জাতিকে বিসর্জ্জন দিলেন; কারণ তাঁহারা উভয়েই জানিতেন যে কামাল ও তাঁহার জাতীয় দল জয়যুক্ত হইলে, তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পদে থাকিতে পারিবেন না। তাই দেশ-শত্রু ইংরাজই হইল তাহাদের বন্ধু।

নূতন মন্ত্রী-সভা এইবার কামালের পিছনে লাগিল। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করার ক্ষমতা এই ভীরু কাপুরুষদের ছিল না। নূতন সেখ-উল-ইসলাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কামালের দলকে অভিসম্পাত দিল এবং ইহাও জানাইল যে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করা। প্রধান মন্ত্রী দামাদ ঘোষণা করিলেন যে কামাল ও তাহার সহকর্ম্মীরা দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করিতেছেন। কামালকে হাতে না পাইয়া অগত্যা তাহারা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, নূতন প্রভু ইংরাজের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিল। হায় স্বার্থ, তোমার মোহে মানুষ কতখানি অ-মানুষ হইতে পারে!

ইংরাজের মনস্তুষ্টির জন্য তুরস্ক সরকার কামালের বিরুদ্ধে যে সব ফতোয়া প্রচার করিল, কামাল তাহাতে মোটেও

বিচলিত হইলেন না। কামাল কনষ্টেন্টিনোপলের তুরস্ক সরকারকে জানাইলেন যে, তাহাদের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতে রাজী নন ; কারণ বর্ত্তমান তুরস্ক সরকারের কোন স্বাধীন সত্তা নাই। কামাল এঙ্গোরাতে প্রতিনিধি সভার এক বৈঠক আহ্বান করিলেন। এই সভার যে সব সভ্য কনষ্টেণ্টিনোপল হইতে পালাইয়া আসিতে পারিল, তাহাদের লইয়া এবং বাকি সভ্যদের নির্ব্বাচিত করিয়া আঙ্গোরায় এই সভার বৈঠক হইল। সমস্ত প্রদেশ হইতে সভ্যরা যোগ দিল। এই সভা হইতে এক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল। কামাল পাশা রাষ্ট্রপতি হইলেন। এঙ্গোরা সরকার ঘোষণা করিল যে কোন কর্ম্মচারীই কনষ্টেণ্টিনোপল সরকারের লিখিত কোন চিঠিই খুলিতে পারিবে না; কেহ তাহাদের কোন আজ্ঞা বা আদেশ পালন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কামাল পাশা এম, মিলারেণ্ডের নিকট চিঠি লিখিয়া প্রস্তাবিত সন্ধি সর্ত্তের প্রতিবাদ করিলেন এবং তুরস্কের জাতীয় আন্দোলনের অবস্থা জানাইয়া, নিজেদের দাবীও তাহাকে জানাইলেন।

৬ই মে কনষ্টেণ্টিনোপল হইতে তুরস্ক প্রতিনিধিরা সন্ধি সর্ত্ত শুনিবার জন্য প্যারী গেল। মিত্র-শক্তিই সব ঠিক করিয়াছে —তুর্ক প্রতিনিধিরা কেবল যাইয়া অবনত মস্তকে দণ্ডাজ্ঞা লইয়া আসিবে। এই সন্ধি অনুসারে সমস্ত পূর্ব্ব-থ্রেস গ্রীসকে দেওয়া হইল। সমস্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর ও ভূতপূর্ব্ব রাজধানী আদ্রিনোপলও গ্রীসের হাতে গেল। কনষ্টেন্টিনোপল

ও নিকটবর্ত্তী সামান্য কতটুকু স্থান মাত্র তুরস্কের রহিল—তাহাও নামে। কারণ, এই স্থানটুকু এক আন্তর্জ্জাতিক সভার শাসনাধীনে থাকিবে; সেই সভায় গ্রীস, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়ারও প্রতিনিধি থাকিবে, কিন্তু তুরস্কের কোন প্রতিনিধিই থাকিবে না! অথচ আদ্রিনোপলে, ৩৬০৪০০ জন তুর্কী, ২২৪৬৮০ জন গ্রীক ও ১৯৮৮৮ জন আর্মেনিয়ান, পূর্ব্ব-থ্রেসে ৬৭৩০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ৪৫৫০০০ জন মুসলমান (১৯১৪ অব্দের সেন্সাস্ অনুসারে)। গ্রীক হইতে মুসলমান অধিবাসী অনেক বেশী থাকা সত্ত্বেও মিত্রশক্তি এই প্রদেশটা গ্রীসকে দিল। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মেণীর সহিত সন্ধি করার সময় লোক সংখ্যা অনুসারেই দেশের বিভাগ হইয়াছে। বিলাতে ভারতীয় খিলাফৎ প্রতিনিধিদের (deputation) উত্তরে লয়েড জর্জ বলিয়াছিলেন যে, এই সেন্সাস্ বিশ্বাসযোগ্য নয়; তা' ছাড়া গত বল্কান যুদ্ধের সময় তুর্কীগণ থ্রেস হইতে ১লক্ষ গ্রীককে আনাটোলিয়াতে নির্ব্বাসিত করে এবং আরও ১লক্ষ গ্রীককে গ্রীক রাজ্যে তাড়াইয়া দেয়। ইংরাজ মন্ত্রীর হিসাবে, আনাটোলিয়ার ১লক্ষ গ্রীক থ্রেসের গ্রীকদের সহিত ধরা হইল, কিন্তু আনাটোলিয়ার লোক সংখ্যা হিসাব করিবার সময়, সেখানেও এই ১ লক্ষ গ্রীককে হিসাবে ধরা হইয়াছে। ছোটকালে একটা গল্প শুনিতাম,—এক কুমীরের আটটি বাচ্চাকে সে শৃগালের নিকট পড়িতে দিয়াছিল। কয়েক মাস পরে, কুমীর শিবরাম পণ্ডিতের গর্ত্তের মুখে ছেলেদের দেখিতে আসিল। শিবরাম পণ্ডিত ইতিমধ্যে ৭টি বাচ্চাকে

উদরস্থ করিয়াছে; তাই অগত্যা হিসাব দিবার সময় অবশিষ্ট একটি বাচ্চাকেই আটবার দেখাইয়া কুমীরকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার বাচ্চারা খুব ভালই আছে। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী প্রায় সেই রকম হিসাবই দিলেন। তারপর বাস্তবিকই গ্রীকদের থ্রেস হইতে নির্ব্বাসিত করা সম্বন্ধেও সঠিক প্রমাণ কিছু নাই। তুর্কীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অনাচারের বহু অভিযোগ মিত্র-শক্তিরা উপস্থিত করিয়াছিল। তুর্কীগণ একাধিকবার তাহাদের বলিল, এক নিরপেক্ষ আন্তর্জ্জাতিক অনুসন্ধান-সমিতি বসাইয়া এই সব অভিযোগের অনুসন্ধান করা হউক—যদি এই সব সত্য প্রমানিত হয়, তবে তাহারা ইহার শাস্তি গ্রহণ করিতে রাজী আছে। কিন্তু মিত্র-শক্তিরা তাহা করিতে সাহস পাইল না। তাই স্বতঃই মনে হয় যে, এই সব অভিযোগ মিথ্যা ও কল্পিত।

অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে, তুরস্ক কখনও তাহার প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার করে নাই। তুরস্ক তাহার অধীন খৃষ্টান প্রজাদের উপর প্রথম বিশেষ কোন অত্যাচার করে নাই। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিসমূহের আদর্শে, প্ররোচনায় ও সাহায্যে বল্কান দেশসমূহের লোকেরা সর্ব্বপ্রথম তুর্কীদের হত্যা করিতে আরম্ভ করে এবং পরে তুরস্কও প্রতিশোধ লইতে পশ্চাদপদ হয় নাই। গ্রীকগণই প্রথমে তুর্কীদের হত্যা করে। এই সম্পর্কে 'The Western Question in Greece and Turkey' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"The introduction of the western formula (of nationalism) among the people (Near Easterners) has therefore resulted in massacre. It (the formula of nationalism) has been applied more and more savagely as it has exacted its toll of suffering and exasperation. The Greek War of Independence, which was perhaps the first movement in this region produced by a conscious application of the western national idea, occasioned massacres of the Turks throughout the Morea and of the Greeks at Aivate and Khios......In the north-eastern provinces of Turkey, the massacre of Armenians by Moslems has been endemic since 1895 ; in Mecedonia the mutual massacre of Greeks, Bulgars Serbs and Albanians, since about 1899 ; and after the Balkan wars the plague of racial warfare spread with the stream of Moslem refugees from Macedonia to Thrace and Western Anatolia. In the latter country, a Greek and Turkish population, which had lived there side by side, on the whole peaceably, for at least five centuries even during the wars between Greece and Turkey in 1821-9 and 1897, have both been seized by homicidal national hatred."—P. 16-17.

এই গ্রন্থেই অন্যত্র লেখা আছে :—"Within a few hours of the landing (at Smyrna of Greek troops), the troops committed a bad massacre in the city; within a few days, they (the Greeks) advanced into the interior; and a new and devastating war of aggression against Turkey began in her only unravaged provinces." এবং গ্রীকদের এই সব অনাচার ও অত্যাচারের পুরস্কার স্বরূপ, "In the sixteenth month of this war the powers gave Greece a five years' administrative mandate in the Smyrna zone, with the possibility of subsequent annexation."—P. 35 of 'The Western Question in Greece & Turkey.'

এই সব হইতে বেশ পরিষ্কারই বুঝা যায়, তুর্কীগণ যতটা অত্যাচার গ্রীকদের উপর করিয়াছে, অন্ততঃ তাহার সমান অত্যাচার গ্রীকগণই প্রথমে তুর্কীদের উপর করিয়াছে।

অন্যের দেশ শাসন করিতে হইলে, সব জাতিই বিদেশী প্রজাদের উপর অত্যাচার করে। ইংরাজ, ফরাসী, রুষ, ইটালীয় কেহই এই গ্লানি হইতে অব্যাহতি পায় নাই—এবং তুরস্কও হয়ত পায় নাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, অন্য সব খৃষ্টান জাতিয়দের তুলনায় তুরস্কের অপরাধ বেশী নয়। বরং তুরস্কের খৃষ্টান প্রজারা বরাবরই পাশ্চাত্য খৃষ্টান জাতিদের সাহায্যে ও প্ররোচনায় তুরস্ককে জ্বালাতন করিয়াছে। ঠিক ঐ রকম

অবস্থায় ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিগুলি নিজ নিজ শাসনাধীন দেশসমূহে যে অত্যাচার করিয়া থাকে, তুরস্ক তাহার চেয়ে বেশী করে নাই বরং কমই করিয়াছে।

প্রস্তাবিত সন্ধি অনুসারে এশিয়া মাইনর, মেসোপোটেমিয়া ও আরব সম্বন্ধে পূর্ব্বের সর্ত্তই সব রহিল—capitulations বা বিদেশীর নিকট স্বাধিকার বিসর্জ্জন করার ব্যবস্থাও বহাল থাকিল। স্মার্ণা গ্রীকদের অধিকারে যাইবে—আরবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এডালিয়া ইটালীর হইবে, সিরিয়া, মারাস, আভানা প্রভৃতি ফরাসীর হইবে, মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক (পারস্য হইতে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া পর্য্যন্ত) ইংরাজের হইবে। প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের অধীনে ইহুদীদের জন্য এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্মার্ণা সম্বন্ধেই জাতীয় দলের বিশেষ আপত্তি—ফরাসীদের হিসাবে সেখানে শতকরা ৭৮ জন লোক তুর্কী এবং শতকরা ১৫ জন লোক গ্রীক। অথচ স্মার্ণা গ্রীকদের দেওয়া হইল।

এইখানে ২।৪টা কথা বলা দরকার। তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগ বাটারা সম্বন্ধে মিত্রশক্তিরা সুবিধা মত নানা জাতির সহিত নানা প্রকার সন্ধি করিয়াছে। ইটালীকে মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগ দিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে ইংল্যাণ্ড,ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অনুসারে ইটালীকে এডালিয়া প্রদেশ অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম এনাটোলিয়া দিবার অঙ্গীকার করা হয়। এই সন্ধি অনু-সারে ফ্রান্স পাইবে সিরিয়া ও সিলিসিয়া এবং ইংল্যাণ্ড পাইবে

মেসোপোটেমিয়া। কিন্তু রুষিয়ার বিপ্লবের পর মিত্র-শক্তিদের মনে এক আশঙ্কা জন্মে যে, রুষিয়া হয়ত জার্ম্মাণীর সহিত পৃথক সন্ধি করিতে পারে। তাই রুষিয়াকে তুষ্ট করার জন্য কনষ্টেণ্টি-নোপল ও মর্ম্মরা সাগরের উভয় তীর, পারস্যের রুষ প্রভাবিত প্রদেশ (sphere of influence) এবং উত্তর-পূর্ব্ব তুরস্কে (অর্থাৎ আর্ম্মেনিয়া, ট্রিবিজণ্ড প্রভৃতি) রুষিয়ার পূর্ণ অধিকার মিত্ররা মানিয়া লইতে স্বীকার করিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবীদের বিদ্রোহী করিবার উদ্দেশ্যে মক্কার শরিফ হুসেনকে আশা দেওয়া হইল যে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও আরবে স্বাধীন আরব রাজ্য স্থাপন করা হইবে। গ্রীসকে হাত করার জন্য বলা হইল যে, তাহাকে স্মার্ণা (দক্ষিণ-পশ্চিম এনাটোলিয়ার অন্তর্গত) ও ইজীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেওয়া হইবে। তুরস্কের অধীন আর্ম্মেনিয়ান-দের আশা দিয়াছিল যে, আর্ম্মেনিয়াতে স্বাধীন আর্ম্মেনিয়ান রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে এবং এই ভরসায় তাহারা মিত্র-শক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়া, আর্মেনিয়ানরা তুর্কী সেনাদের হাতে অশেষ অত্যাচার ভোগ করিতেছিল।

পরের রাজ্য এইভাবে দান করিতে ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিরা কখনও কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু তুরস্কের এই ভাগ বাটারার গোলমাল উপস্থিত হইল। কারণ একই প্রদেশ হয়ত দুই বা ততোধিক জাতিকে দান করা হইয়াছে এবং এই সব সন্ধিই গোপন। ইংরাজ ও ফরাসী সব সন্ধিতেই ছিল; কিন্তু তাহারা ইটালীকে যে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা

রুষিয়া জানিত না; আবার রুষিয়ার কথা ইটালী জানিত না। আরবীগণ ও গ্রীকগণ বা আর্ম্মেনিয়ানগণ কেহই জানিত না যে, একই প্রদেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির সহিত ইংরাজ ও ফরাসী একই ভাবে চুক্তি করিয়াছে। কিন্তু হাটে হাড়ি ভাঙ্গিল বলশেভিকগণ। পূর্ব্বতন রুষ সরকারের সহিত যে সব গোপন সন্ধি হইয়াছিল, বলশেভিকগণ তাহা সব প্রকাশ করিয়া দিল। আরবী ও ইটালীয়গণ ইহাতে বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইল। পরে ইটালীর সহিত ভিন্ন সন্ধি করিয়া তাহারা ইটালীকে সন্তুষ্ট করিল। অবহার বা যুদ্ধ বিরতির পর আরবীগণ মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পনা করিতে লাগিল। সেভ্রে সন্ধি পত্রে কোন আরবী প্রতিনিধি স্বাক্ষর করে নাই। স্থানে স্থানে আরব অসন্তোষ যখন সশস্ত্র বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, তখন ইংরাজরা মেসোপোটেমিয়ায় একটি বাহ্যতঃ স্বাধীন আরব রাজ্য খাড়া করিল। *

তুর্কী মুখপাত্রদের তরফ হইতে, তেফিক পাশা (Tewfik Pasha) দামাদকে টেলিগ্রাম করিয়া সন্ধির সর্ত্ত জানাইলেন।

* "In Mesopotamia.........British troops had remained in occupation and many small risings of the Arab population and one big rising in 1920, had been put down. But the mandatory power had since set a single Arab goverment for the whole country and was rapidly reducing its garrisons"—*P.* 55 of 'Western Question in Greece and Turkey.'

ইংরাজের অনুবর্ত্তী মন্ত্রীসভা ও পত্রিকা সম্পাদকরাও এই সর্ত্তের প্রতিবাদ করিল। 'পেয়াম সাবহ্' (Peyam Sabah) কাগজে দুঃখ সূচক কালো লাইনের ঘেরা দিয়া এই সন্ধি সর্ত্ত ছাপা হইল। এই কাগজে লেখা হইল, "অন্ধ, কালা ও খোঁড়া হইয়া বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। এই ভাবে জাতির ও দেশের প্রতি অপমান আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।" অথচ এই কাগজ ইংরাজ-বিদ্বেষী ছিল না, বরং অনেকটা ইংরাজ-সমর্থকই ছিল। এলেমদার (Alemdar) নামে আর একখানা ইংরাজের সমর্থক কাগজ লিখিল, "যদি সন্ধির সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে এই সন্ধি পত্রে দস্তখত করার মত লোক পাওয়া যাইবে না।" 'পেয়াম সাবহ্' কাগজ আবার লিখিল, "আমাদের নিকট তিনটি পথ মাত্র খোলা আছে,—(১) মিত্র শক্তির দয়া ভিক্ষা করিয়া সন্ধি সর্ত্ত বদলান, (২) বর্ত্তমানে সন্ধি সর্ত্ত দস্তখত করিয়া ভবিষ্যতে সুযোগ মত ইহার বদল করা। কিন্তু এই সন্ধি পত্রে দস্তখত করিবে কে? (৩) অহিংস প্রতিরোধ (Passive resistance) দ্বারা সন্ধি সর্ত্তে বাধা দেওয়া, কারণ সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষমতা আমাদের নাই। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই সন্ধি সর্ত্তে আপত্তি করিল। পূর্ব্ব-থ্রেস, স্মার্ণা ও কনষ্টেণ্টিনোপল লইয়াই তাহাদের বিশেষ আপত্তি—আরব, ইরাক, সিরিয়া বা প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে জাতীয় দলও বিশেষ কিছু বলে না। তাহারা চায় যে বিশেষ ভাবে তুর্কী অধ্যুষিত প্রদেশগুলি তুর্কী সরকারের হাতেই থাকিবে এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্যান্য

দেশগুলিকে স্বাধীন করা সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে, ইরাক, আরব, সিরিয়া বা প্যালেষ্টাইন কোনটাই বাস্তবিক স্বাধীন হইবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের একটা মিথ্যা ভড়ং দেখাইয়া, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হইল সন্ধির উদ্দশ্য।

থে্সের তুর্কী ও বুলগারগণ এই সন্ধির ভয়ানক বিরুদ্ধে। তুর্কী সেনানী কর্ণেল জাফের টায়ার (Colonel Tayar) পূর্ব্ব হইতেই জাতীয়দলের পরিপোষক ছিলেন। থে্স গ্রীকদের হাতে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই জাফের মিত্রশক্তিদের বাধা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এনাটোলিয়াতে কামাল যাহা করিয়াছিলেন, থে্সে জাফের ঠিক তাহাই করিলেন। জাফের জাতিতে আলবেনিয়ান। সিলিসিয়া বা শ্লেসউগের মত থে্সকেও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (self determination) দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন; অথবা থে্সকে স্বায়ত্ত শাসন দিলেও তিনি রাজী ছিলেন।

নানা স্থানে সভা করিয়া ও বক্তৃতা দিয়া, জাফের থে্সবাসীদের স্বাধীনতার জন্য উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। বুলগার ও নব্য তুর্কীগণ, পশ্চিম থে্সে স্বায়ত্ত শাসন ঘোষণা করিল। আড্রিনোপলে জাফের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদের লইয়া, এক সুশিক্ষিত সৈন্য-বাহিনী গঠন করিলেন। তিনি গ্রীক দখলের বিরুদ্ধে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

অপরদিকে, সন্ধিসর্ত্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজের প্ররোচনায় দামাদ, আঞ্জুভর পাশা নামক একজন সেনাপতিকে কামালের বিরুদ্ধে পাঠান। আঞ্জুভর কামালের নিকট পরাজিত হইয়া, কনষ্টেন্টিনোপলে পলাইয়া যায়। এই জয়ের ফলে মর্ম্মরা সাগরের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্তই কামালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্ম্মরার পশ্চিম তীর জাফের ও তাঁহার সৈন্যদের অধিকারে। ইংরাজের গোলাম তুরস্ক সরকার জাতীয়দলের নেতাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল।—কামাল, আলিফুয়াদ পাশা, আহমেদ রুস্তম বে, ডাঃ আদ্নান বে ও তাঁহার স্ত্রী হালিডে এ দিদ হামুমের বিরুদ্ধে দেশ-দ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। কিন্তু মিত্রশক্তি এখন পরিষ্কারই বুঝিল যে দেশে কনষ্টেন্টি-নোপল-সরকারের কোন অধিকারই নাই—তুরস্কের প্রকৃত মালিক কামাল ও জাতীয়দল। বহু চেষ্টা করিয়াও মিত্র-শক্তি এবং দামাদ তাহাদের বশ করিতে পারে নাই। ইংল্যাণ্ডের ইচ্ছা যে ফ্রান্স ও ইটালীও তাহাদের সহিত গ্রীসকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে; কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালী তাহাতে রাজী নয়। কারণ প্রস্তাবিত সন্ধিতে ইংল্যাণ্ডের সুবিধাই বেশী এবং তৎপরেই গ্রীসের। পরের জন্য অর্থ ও জনবল ব্যয় করার ইচ্ছা তাহাদের মোটেও নাই।

সুলতান এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। প্রায় তিন হাজার লোক এই সভায় উপস্থিত হইল। কনষ্টেন্টিনোপলে তখন জাতীয়দলের লোক প্রায়ই ছিল না—কাজেই সভায় প্রায়

সবই ইংরাজের পরিপোষক লোক গেল। কিন্তু তবুও তাহারা সকলেই এই প্রস্তাবিত সন্ধির প্রতিবাদ করিল। এই সভার বিবরণ ও প্রস্তাব মিত্র-শক্তির প্রতিনিধিকে (High Commissoner) পাঠান হইল। জাতীয় দলের ও মন্ত্রীদের দাবীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই ;—মতভেদ হইল উপায় সম্বন্ধে। তাহ সন্ধি সর্ত্তের খবর পাওয়ার পর, দামাদ ও কামালের মধ্যে বিবাদ কিছু কমিয়াছিল। তাই দুই দলের মধ্যে একটা মিটমাটের প্রস্তাবও হইল। ইংরাজেরাও কামালের নিকট সন্ধি প্রস্তাব লইয়া দূত পাঠাইল, কিন্তু কামাল ইংরাজ দূতের সহিত কোন প্রকার আলোচনা করিতেই রাজী হইলেন না।

কামাল ক্রমেই জয়যুক্ত ও প্রবল হইতে লাগিলেন। কনষ্টেন্টিনোপলের সৈন্যরা তাঁহার নিকট বরাবরই পরাজিত হইতে লাগিল। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি সাবধান ছিলেন,—তিনি কখনও সুলতানের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না। তিনি জানিতেন —এখনই হঠাৎ সুলতান খলিফাকে অস্বীকার করিলে জাতীয়দলের তুর্কীগণও হয়ত ক্ষেপিতে পারে। তাই তিনি জুম্মা নমাজে সুলতানের নাম ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন বর্ত্তমানে সুলতানের কোন স্বাধীন কর্ম্মশক্তি নাই, তাঁহার এখনকার সব আদেশই ইংরাজের বা মিত্র-শক্তিদের আদেশ মনে করিয়া, তাহা অমান্য করাই উচিত। মিত্র-শক্তির বন্ধুত্ব হইতে সুলতানকে উদ্ধার করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিলেন। দামাদ ও তখনকার সেখ-উল-ইসলাম জাতীয় দলকে ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া

প্রমানিত করিতে চান, তাই কামাল আরও বিশেষভাবে রমজানের রোজা পালিবার জন্য সকলকে আদেশ দিলেন। মোটের উপর ধর্ম্ম-বাতিকগ্রস্তদের মনে কোন প্রকার আঘাত যাহাতে না লাগে সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এই সময় ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সলিপাশা আনাটোলিয়াতে পালাইয়া যান এবং জাতীয় দলে যোগ দেন। ৩০শে মে তুর্কী জাতীয়দলের সহিত ফরাসীদের ২০ দিনের জন্য একটা অবহার হয়। ইটালীয়গণ এডালিয়ার অন্তর্গত কোনিয়া হইতে পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে এবং ফরাসীদেরও সিলিসিয়া হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফরাসীরা তাহা না করায় ১৭ই জুন কামাল অবহার প্রত্যাহার করিলেন। জাতীয় দলের সহিত ফরাসী সৈন্যের ছোট খাট খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অথচ তুরস্কে এইভাবে ফ্রান্সের অর্থ ও লোকবল নষ্ট করার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনমত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কেবল সিরিয়াতে নিজেদের কার্য্য ও সৈন্য আবদ্ধ রাখাই তাহারা সমীচিন মনে করিল।

সন্ধি পত্রে শীঘ্র শীঘ্রই স্বাক্ষর দিবার জন্য, সন্ধি মহাসভা তুরস্ক প্রতিনিধিদের চাপ দিতে লাগিল। কনষ্টেন্টিনোপলেও, ইংরাজ সেনাপতি তুরস্ক সরকারকে চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু যে সব প্রদেশ সম্বন্ধে গোলমাল, তাহার অনেক অংশ তখনও কামালের হাতে। কামাল মার্ম্মোরা সাগরের পূর্ব্বতীর ও দ্বীপগুলি সবই দখল করিয়াছে—কেবল মাত্র ইসমিড (Ismid)

ইংরাজ সৈন্যের হাতে ছিল। ১৬ই জুন জাতীয় দল ইসমিডের ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করিল। একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী (officer) বন্দী হইল এবং ৩০ জন ভারতীয় সিপাই হত হইল। জাতীয় দল ইসমিডের রেল লাইন ভাঙ্গিয়া দিল। এই সময় জাতীয় দলের সহিত বলশেভিকদের বেশ একটু বন্ধুত্ব পাকিয়া উঠিল—কারণ মিত্র-শক্তি উভয়েরই সমান শত্রু। মিত্র পক্ষ বুঝিল, এই অন্যায় সন্ধি চালাইবার জন্য জেদ করার ফলে, শুধু তুরস্কে নয়, সমস্ত নিকট ও মধ্য প্রাচ্য খণ্ডেই তাহাদের সুনামের হানি হইয়াছে। পারশ্য ও ইংরাজের চেয়ে বলশেভিক রুষিয়াকেই বেশী বিশ্বাস করিতেছে, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, বোখারা, খিব, কোথাও ইংরাজকে কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই ইংরাজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জও বুঝিলেন সন্ধিসর্ত্ত বদলান দরকার। এমন সময় তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী দামাদ প্যারীতে সন্ধিসভার নিকট গেলেন। কিন্তু গ্রীসের মন্ত্রী ভেনিজেলস (Venezelos) ইহাতে আপত্তি করিলেন ;—তিনি বলিলেন, যদি থ্রেস ও স্মার্ণা গ্রীস না পায়, তবে বিতাড়িত রাজা কনষ্টেণ্টাইনের দল গ্রীসে আবার প্রবল হইবে এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কনষ্টেণ্টাইনকে আবার সিংহাসনে বসাইতে হইবে।

কিন্তু নানাদিক হইতেই এই প্রস্তাবিত সন্ধির প্রতিকূল ঘটনা ঘটিতে লাগিল। গ্রীসের পক্ষে স্মার্ণা ও থ্রেস দখল করা ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইরাকে আরবীগণই ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল,সিরিয়াও এই সন্ধির সর্ত্তে আপত্তি করিল। ইটালী

এই সব ব্যাপারে মোটেও নিজকে জড়াইতে চাহে না—আর্মে-নিয়ার ভার নিতে কেহই রাজী নয়—আমেরিকা বলিল, ইহাতে মনরো বিধির (Monroe doctrine) * ব্যতিক্রম হইবে, ফরাসী বলিল, এই জন্য তাহার 'মাথা ব্যথা পড়ে নাই' ; ইংরাজ বলিল, তাহার ভারই তাহার পক্ষে বহন করা দুর্ব্বহ হইয়াছে ; আসল কথা, দরিদ্র আর্মেনিয়ার ভার গ্রহণ করিয়া, কেহই 'নিরামিশ' পরোপকার করিতে রাজী নয়—মসুলের মত ২।১টা তেলের খনি পাইলে সবাই রাজী হইত।

যখন মিত্র-শক্তির মধ্যে সর্ত্ত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, তখন মার্মোরাসাগর তীরে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছিল—ক্রমে ডার্ডানেলিসের পারে মাত্র কয়েক বর্গমাইল জায়গা ইংরাজের হাতে রহিল। ইংরাজ ও তুরস্কের সরকারী বাহিনী ক্রমেই জাতীয় বাহিনীর নিকট পরাজিত হইতে লাগিল। ইংরাজ নৌ-বহর মাল্টা হইতে ইজিয় সমুদ্রে আসিয়া জাতীয় দলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে

* বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক (President) মনরো আমেরিকার রাজনীতি সম্বন্ধে এই নিয়ম করেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন অংশে কোন ইউরোপীয় শক্তি হাত দিতে পারিবে না এবং আমেরিকাও কোন ইউরোপীয় ব্যাপারে হাত দিবে না। এই নিয়মের প্রথম ব্যতিক্রম হয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগ দেওয়াতে। এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত না করিলে, দক্ষিণ আমেরিকার অনেক রাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তি সমূহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইত। ইউরোপীয়দের এই প্রকার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়াই, তিনি আন্তর্জ্জাতিক মহলে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন।

লাগিল। গ্রীক মন্ত্রী ভেনিজেলস লণ্ডনে যাইয়া লয়েড জর্জ্জকে ভজাইতে লাগিলেন। তিনি লয়েড জর্জ্জকে বুঝাইলেন যে, গ্রীস ও ইংল্যাণ্ড একত্র হইয়া সহজেই কামালকে জব্দ করিতে পারিবে। মিত্র-শক্তি যদি এসিয়া মাইনরে গ্রীসকে পূর্ণ কর্ম্মাধিকার দেয়, তবে ৯০০০০ হাজার গ্রীক সৈন্য ও ইংরাজ রণতরীর সাহায্যে কামালকে পরাজিত করা খুবই সহজ হইবে। চতুর ভেনিজেলস বিখ্যাত ধনী জাহারফের (Sir Basil Zaharaff) সাহায্য লইলেন। পার্লামেণ্টের গত নির্ব্বাচনে জাহারফ লয়েড জর্জকে বহু সাহায্য করিয়াছে; তাই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করা লয়েড জর্জ্জের পক্ষে কঠিন। * সন্ধি সভার বোলোন বৈঠকে (Boulogne Conference) যখন এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল, তখন ইটালী পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ করিল। ফ্রান্স বলিল যে, সে নিজে এই সম্বন্ধে কিছু করিবে না। ইংরাজের অনুরোধে সকলেই এসিয়া মাইনরে গ্রীসকে পূর্ণ কর্ম্মাধিকার দিল;—গ্রীকদের স্মার্ণা দখল করাতেই তুরস্কের জাতীয় আন্দোলন এত প্রবল হয়; তাহারাই যদি এখন এই আন্দোলন দমন করিতে পারে, কাহারও আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন আর কেহই নিজে কিছু করিতে রাজী হইল

* "So it has been said with reason that M Venizelos' eloquence and Sir Basil Zaharoff's wealth have done Turkey the greatest harm, for they have influenced Mr. Loyd George and the English public opinion against her."—The Turks & Europe; Page 234.

না। ফ্রান্সের বিখ্যাত মার্শেল ফস্ বলিলেন, ৩।৪ লক্ষ সৈন্যের কমে জাতীয় দলকে দমন করা সম্ভব নয়।

সন্ধি-সভার এই অনুমতি পাইয়া, গ্রীক সৈন্য স্মার্ণাও মার্মোরা সাগরের তীরে জাতীয় দলকে নানাস্থানে আক্রমণ করিল—জাতীয় দল প্রায় সর্ব্বত্রই পরাজিত হইল। ইংরাজগণ সৈন্য দিয়া ও অন্যভাবে গ্রীকদের সাহায্য করিতে লাগিল। ইংরাজের জল ও স্থল সৈন্য গ্রীক বাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করিল। সব চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে ইংরাজ বাহিনীর মধ্যে ভারতীয় সিপাহীই ছিল বেশী। যাহারা নিজেরা গোলাম, তাহারাই অতি সহজে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে সম্মত হয়—কারণ স্বাধীনতার মর্ম্ম তাহারা বুঝে না।

গ্রীক সৈন্য ব্রুসা (Brusa) দখল করিল, ইংরাজ নৌ-বহর মুদিয়ানা (Mudiana) দখল করিল। ইংরাজ ও গ্রীক মিলিয়া মুদিয়ানার রেল ষ্টেশন লুট করিল। এই রেল লাইন ফরাসীদের হাতে ছিল। ফরাসী মেনেজারের গৃহের উপর ইহারা কামান দাগাইতে ক্রুটি করিল না। এইবার গ্রীকগণ খুবই আশা করিতেছিল, আদ্রিনোপল ও থ্রেস জয় এখন সহজেই সম্পন্ন হইবে। ইংরাজ সেনাপতি মিলনেও গ্রীকদের এই বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভোসফারাসের উভয় তীরের তুর্কীদের তিনি নিরস্ত্র করিলেন। কনষ্টান্টিনোপলে সমস্ত তুর্কী সৈন্য ও সোনাণীকে ইংরাজ সৈন্যাবাসে ডাকিয়া আনা হইল—উদ্দেশ্য যাহাতে কেহ কোন অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিতে না পারে। আলেম-

ভাগে ইংরাজ সেনাপতিও তুর্কী সরকারী সৈন্যদের নিরস্ত্র করিল। একটি বাহিনী (division) ভিন্ন কনষ্টেন্টিনোপলের সরকারী সৈন্যদল সব বিদায় দেওয়া হইল। ইংরাজের ক্ষমতায় যতটা সম্ভব তুর্কী জাতিকে নিরস্ত্র করিল—যাহাতে থে্স জয়ে কেহ বাধা দিতে না পারে।

নিজেদের অবস্থা সুবিধা জনক দেখিয়া মিত্র-শক্তিগণ জেদ করিতে লাগিল, অবিলম্বে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তুরস্ক প্রতিনিধিরা এক জবাব দিল। তাহারা লিখিল, "মিত্রশক্তিরা যদি তুরস্ককে বাঁচিতে দিতে চায়, তবে তাঁহাকে বাঁচিবার সুযোগ দিক; আর যদি তাহাকে মারিতে চায়, তবে মিত্রশক্তিরাই মারুক, তুরস্কের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ পত্রে যেন তাহাই দস্তখত করিতে বাধ্য না করে।" প্রতিনিধিরা অন্য সব সর্ত্ত স্বীকার করিল, তাহারা থে্স, কনষ্টেন্টি-নোপল, মার্ম্মরা সাগর ও উহার তীর এবং স্মার্ণা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিল।

মিত্র-শক্তিরা যে উত্তর দিল, তাহাতে তুরস্কের প্রায় সব অনুরোধই অগ্রাহ্য করিল এবং যুদ্ধে জার্ম্মেণীর পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য বেশ কটু ২।৪ টা কথাও শুনাইল;—যাহাতে ভবিষ্যতে জগতের সভ্যতার ও উন্নতির বিরুদ্ধে তুর্কীগণ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে না পারে, সেই জন্য কনষ্টেন্টিনোপল ও মর্ম্মোরা সাগরে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করা দরকার। মিত্র-শক্তিরা ইহাও বলিল যে আর্ম্মেণীয়ান ও গ্রীকদের উপর তুরস্ক যে রকম

অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে তুরস্কের হাতে আর কোন দেশ শাসনের ভার দেওয়া অন্যায়। বিশ্বের ও অত্যাচারিত জাতিদের কল্যাণেই ইংরাজ ও তাহার মিত্ররা এই সব করিতেছে—কি দয়া! অথচ ঠিক এই সময়ই পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে! বিদেশীদের উপর অত্যাচার করিতে যে কোন পাশ্চাত্য জাতি তুর্কীদের চেয়ে কম, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে না। আমেরিকার আদিম অধিবাসী, নিগ্রো, মাওলি, অষ্ট্রেলিয়া ও টাসমেনিয়ার আদিম অধিবাসী, ভারত, চীন, পারস্য, প্রভৃতি জাতি ও দেশের ইতিহাস পাশ্চাত্য সভ্যতার দুরপনেয় কলঙ্ক।

যা'ক, মিত্র শক্তিরা দয়া করিয়া, তুর্কীদের দুইটি অনুরোধ রক্ষা করিল। (১) কনষ্টেণ্টিনোপলের আন্তর্জাতিক বৈঠকে, বুলগেরিয়ার মত তুরস্কেরও একজন প্রতিনিধি থাকিতে পারিবে এবং (২) ১৬০০ টনের উপর সমস্ত জাহাজ মিত্রদের হাতে ছাড়িয়া দিবার সর্ত্ত রহিত করা হইল। পরিশেষে মিত্র পক্ষ তুর্কী সরকারকে জানাইল যে যদি তুরস্ক সন্ধি পত্রে দস্তখত করিতে রাজি না হয়, অথবা যদি তুর্কী সরকার কামালকে পরাজিত করিয়া এনাটোলিয়াতে নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, অথবা সন্ধি সর্ত্ত কার্য্যে পরিণত করিতে না পারে, তবে মিত্রপক্ষ সন্ধিসর্ত্ত আবশ্যক মত বদলাইতে পারিবে এবং তুরস্ককে চিরকালের জন্য ইউরোপ হইতে বিতারিত করিবে। অর্থাৎ কামাল ও জাতীয় দলকে নিজেরা দমন করিতে না পারিয়া, মিত্র পক্ষ সেই ভার দুর্ব্বল পঙ্গু তুরস্ক সরকারের উপর দিল এবং ইহা

করিতে না পারিলে কি শাস্তির বিধান করা হইবে, তাহারও একটু আভাস দিল। মিত্রশক্তি ইহাও জানিত যে তুরস্ক সরকারের পক্ষে কামালকে পরাজিত করা সম্ভব নয়—তাই ইউরোপ হইতে তুরস্ককে তাড়াইবার একটা সুযোগ রহিয়া গেল, দরকার মত এই অছিলায় যখন খুসী তাহাকে তাহার ঘর হইতে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিবে। ১০ দিনের মধ্যে তুরস্কের উত্তর দাবী করা হইল।

ইতিমধ্যে গ্রীকগণ ইংরাজ নৌ-বাহিনীর সাহায্যে থ্রেস আক্রমণ করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য মাঝে রেল লাইন বন্ধ করিয়া আদ্রিনোপল ও কনষ্টেন্টিনোপলের চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়; ইহা প্রতিরোধ করিতে থ্রেসের সেনাপতি জাফের টায়ার রাজধানী হইতে কোন সাহায্যই পাইবে না। ২০শে জুলাই গ্রীকগণ আদ্রিনোপল আক্রমণ করিল। জাফের তখন সহরে ছিলেন না। ৪ দিন পরে নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিল। ১২০০০ হাজার তুর্ক কিছুতেই গ্রীক শাসনে থাকিতে রাজী হইল না; তাই তাহারা বুলগেরিয়ায় চলিয়া গেল।

ঠিক এই সময় (২২শে জুলাই) কনষ্টেন্টিনোপলে সুলতানের আহ্বানে এক সভা বসিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী প্যারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ৫৫ জন লোক উপস্থিত হইল। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, এই অবস্থায় সন্ধিতে স্বাক্ষর করা ভিন্ন উপায় নাই। সেনাপতি ফুয়াদ ও রিজাপাশা ভিন্ন আর সবাই মন্ত্রীকে সমর্থন করিল। সন্ধিতে স্বাক্ষর করাই ঠিক হইল। প্রধান মন্ত্রী

জাফের টায়ারকে লিখিলেন,আপনার স্বদেশ প্রেমের খুবই প্রশংসা করি, কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধ করার অর্থ তুরস্কের সর্ব্বনাশ করা ; আপনি দয়া করিয়া গ্রীসের হাতে থ্রেস অবিলম্বে ছাড়িয়া দিন।”

ইহার মধ্যে আবার ইজিয় সমুদ্রের ১২টী দ্বীপ লইয়া ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে গোলমাল হয়। এইজন্য তুরস্ক প্রতিনিধিগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধি স্বাক্ষর করিতে যাইয়া ৩।৪ বার ফিরিয়া আসেন। অবশেষে ১০ই আগষ্ট সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সেভ্রেতে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সাথে আরও ৭টা সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল :—

(১) থ্রেস সম্বন্ধে, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে।

(২) ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর এসিয়া মাইনরে অর্থনৈতিক কর্ত্তৃত্বের স্থান ও সীমা নির্দ্দেশ (Economic sphere of influence)

(৩) ইজিয় সমুদ্রের ১২টী দ্বীপ গ্রীসকে দেওয়া সম্বন্ধে ইটালী ও গ্রীসের মধ্যে।

(৪) নব আর্ম্মেণীয় গণতন্ত্রের সংখ্যায় কম জাতিদের (minorities) সম্বন্ধে মিত্র শক্তিদের সহিত আর্মেনিয়ার।

(৫) ঐ রকম এক সন্ধি গ্রীসের সহিত মিত্র-শক্তিদের।

(৬) ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশ ও নূতন রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে ইটালীর সহিত মিত্র-শক্তিদের।

(৭) মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে।

তুরস্ক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। পরদিন সমস্ত তুরস্কে যেন একটা বিষাদের ছায়া কে লেপিয়ে দিল। তুরস্ক পত্রিকাগুলি 'শোকসংখ্যা' বাহির করিয়া দেশবাসীদের জানাইয়া দিল যে, সমস্ত জাতির পক্ষে আজ শোকের দিন। রাজধানীর সমস্ত আমোদ প্রমোদ, থিয়েটার বন্ধ হইল—জনসাধারণ মসজিদে যাইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিল। জাতির যত রাগ যাইয়া পড়িল সেই হতভাগ্যদের উপর, যাহারা দেশের এই মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করিয়া আসিল। এক বিখ্যাত ফরাসী লেখক এই সন্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমাদের প্রাচ্য নীতির মধ্যে ইহার চেয়ে বেশী মূর্খতার পরিচায়ক আর কোন কাজই হয় নাই।" ("The silliest of all the silly blunders of our Eastern policy.")

গ্রীকগণ ও জাতীয় দল

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল। "তুর্কীগণ কেবলমাত্র নরকে গেলেই নিজের প্রভু হয়, তাহার পূর্ব্বে নয়" * কিন্তু মুস্তাফা কামালপাশা পাশ্চাত্য জাতিদের দেখাইলেন যে তুর্কীগণ ইহ জগতেও নিজের প্রভু হইতে পারে। অবহার পত্রের সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া যখন মিত্র-শক্তিরা, বিশেষতঃ ইংরাজ ও তাহার অনুগৃহীত গ্রীকগণ, তুরস্ককে নাগপাশে বন্ধন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল, তখন এই মহাপুরুষই তাহাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে তুরস্ককে রক্ষা করেন। এনভারের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া, মিত্রগণ তাহাকে প্রথম প্রথম মোটেও

* "Where is the Turk his own master ?"

—"In Hell."

সন্দেহের চোখে দেখিত না। তুর্কী বাহিনীর পরিদর্শক (Inspector General) করিয়া, মিত্রগণই তাঁহাকে এনাটোলিয়াতে পাঠায়। কামাল এনাটোলিয়াতে যাইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, মিত্রশক্তিদের নির্দ্দেশে গ্রীক বাহিনী স্মার্ণা দখল করে।

পূর্ব্বে যুদ্ধের প্রারম্ভে ইটালীকে আশা দেওয়া হইয়াছিল যে, দক্ষিণ পশ্চিম এনাটোলিয়া ইটালীকে দেওয়া হইবে। কিন্তু পরে আবার উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত স্মার্ণা বিভাগ গ্রীসকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল—তখন ইটালী যাহাতে গোঁসা না হয়, সেই জন্য তাহাকে আদ্রিয়াটিক উপসাগর কূলের আশা দেওয়া হইল। প্যারী বৈঠকে যখন ইটালী দেখিল যে ট্রিষ্ট বা ফিউম (Trist and Fueme) কিছুই তাহার পাইবার আশা নাই, তখন সে এডালিয়া নগর দখল করিয়া, ক্রমে এসিয়া মাইনরের সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দখল করিতে লাগিল। ইটালীয় বাহিনী ক্রমে স্মার্ণার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, মিত্রশক্তিরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ঠিক করিল একদল গ্রীক বাহিনীকে স্মার্ণা দখল করিতে পাঠাইবে। ইংরাজগণ এই বিষয়ে অগ্রণী। তুরস্ক সরকারকে জানান হইল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একদল মিত্র সৈন্য স্মার্ণা দখল করিবে। স্মার্ণাতে যে মিত্র-শক্তির প্রতিনিধি ছিলেন, উপরের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি স্মার্ণার মুষ্টিমেয় তুর্কী সৈন্যদের নিরস্ত্র করিল। তাহাকে খবর পাঠান হইল যে একদল মিত্র-সৈন্য স্মার্ণা দখল করিতে যাইতেছে। স্মার্ণার তুর্কীগণ গুজব শুনিল যে একদল

গ্রীক সৈন্য আসিতেছে। পুনঃ পুনঃ খোঁজ লইয়াও তাহারা সঠিক জানিতে পারিল না যে গ্রীক সৈন্য আসিবে কিনা। মিত্র-শক্তির প্রতিনিধি তাহাদের শুধু বলিল যে মিত্র বাহিনী আসিবে। এই ভাবে মিত্রগণ তুর্কীদের ধাপ্পা দিতে লাগিল। ২৪শে এপ্রিল (১৯১৯) ইংরাজ নৌ-সেনানী কেলথর্পের (Admiral Calthorpe) অধীনে মিত্র নৌবহর গ্রীক সৈন্যদের স্মার্ণা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিল। গ্রীকদের স্মার্ণা পাঠাইতে ইংরাজেরই গরজ ছিল বেশী এবং সে-ই এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিল। গ্রীকগণ যে কতটা পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করিতে পারিবে, মিত্র শক্তিরা তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিল না। অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহারে গ্রীকগণ বুঝিল, যতটা স্থান গায়ের জোরে দখল করিতে পারে, ততটাই লাভ।

গ্রীক সৈন্য নগরে যাইয়াই অত্যাচার আরম্ভ করিল। গ্রীক সৈন্য যাইবার পূর্ব্বে, স্মার্ণার তুর্কী সৈন্যদের নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছু কিছু নিরস্ত্র সৈন্য তখনও স্মার্ণার সৈন্যবাসে ছিল। সে দিন গ্রীক সৈন্য তুর্কী সৈন্যবাসের সম্মুখ দিয়া কাওয়াজ করিয়া যাইতেছিল। এমন সময় কে গ্রীক বাহিনীর উপর একটা গুলি ছাড়ে; কিন্তু সেই গুলি কাহারও গায় লাগে নাই। গ্রীক সৈন্যগণ এমনি একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল। সমবেত নিরীহ অ-সামরিক (civilian) জনতার উপর গ্রীকগণ গুলি ছুড়িতে লাগিল। সৈন্যবাসের উপর এমনভাবে গুলি পড়িতে লাগিল যে আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ শ্বেত পতাকা দেখানও তাহাদের

পক্ষে কষ্ট হইল। নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য আত্মসমর্পন করিল। বন্দী তুর্ক সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র ও বর্ব্বর ব্যবহার করা হইল। রাস্তায় সার দিয়া তাহাদের দাঁড় করান হইল; তারপর তাহাদের আদেশ দিল, মাথার উপর হাত উঁচু করিয়া তুলিয়া "গ্রীসের জয়" বা "ভেনুজেলাসের * জয়" বলিয়া তাহাদের চীৎকার করিতে হইবে। এবং গ্রীক সৈন্যগণ থামিতে না বলা পর্য্যন্তই এইভাবে চীৎকার করিতে হইবে। এই অবস্থায় তাহাদিগকে সমুদ্রের ধার দিয়া কাওয়াজ করান হইতে লাগিল। যে কেহ এদিক ওদিক হইতেছিল, তাহাকেই গ্রীকগণ সঙ্গিনের খোঁচায় মারিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিতে লাগিল। দুই দিন পর্য্যন্ত গ্রীকগণ এই প্রকার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালাইতে লাগিল। তুর্কী-টুপি মাথায় কোন লোক দেখিলেই, তাহারা আক্রমণ করিত। স্মার্ণার বাহিরে ৬।৭ মাইলের মধ্যে সব গ্রামই গ্রীকদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। স্মার্ণাবাসী অ-সামরিক গ্রীকগণও লুঠ ও হত্যায় যোগ দিল।

তাহাদের ভূতপূর্ব্ব প্রজা গ্রীকগণ আসিয়া যে ওসমানি তুর্কীদের আদিভূমির কোন অংশ দখল করিবে, ইহা তাহাদের নিকট অসহ্য। তারপর যখন গ্রীকগণ এমনি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন তুর্কীগণ আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। অথচ গ্রীকদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। সমস্ত

---

* তুরস্কের পরম শত্রু গ্রীসের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী।

এনাটোলিয়াতে তখন মাত্র ২০,০০০ হাজার তুর্কী সৈন্য ছিল—তাহাও মিত্র-শক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আওতায়ই ছিল। যুদ্ধ করার অস্ত্রশস্ত্র প্রায় কিছুই তাহাদের ছিল না। একটা নিষ্ফল ক্রোধের জ্বালায়, সমস্ত তুর্কীজাতি জ্বলিতে লাগিল। সেই সময় মুস্তাফা কামাল পাশা এনাটোলিয়াতে আসেন।

কামাল পাশা পরাজিত জাতির প্রাণে এক নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার করিলেন। তাঁহার পতাকা তলে দলে দলে তুর্কীরা আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইসুফ কামাল (Yusuf Kamal), ডাঃ আন্দান বে (Dr. Andan Bey) ও তাহার স্ত্রী হালিদে হানুম (Halide Hanum) বিশেষ ভাবেই জাতীয় কার্য্যের সহায়তা করিলেন। ইসুফ ও আন্দান শিক্ষিত ও সাধারণের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। হালিদে হানুম তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি একজন ঔপন্যাসিক এবং সার্ব্ব-তুরাণী আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন।

এনাটোলিয়ার সমস্ত তুর্কীগণই এই নব আন্দোলনের পক্ষে ছিল। "Western Questions in Greece and Turkey"র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "In 1921 I only met or heard of a half-a-dozen of Turks who were anything else (than nationalist)—"১৯২১ অব্দে সমস্ত তুরস্কে জাতীয়তা-বিরোধী মাত্র ৬টি লোকের সন্ধান পাইয়াছি।' এই ছয় জন লোকের নাম ও তিনি দিয়াছেন:—(১) তুরস্ক সুলতানের জামাতা

ইংরাজের অনুগৃহীত তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফেরিদ পাশা (২) স্মার্ণার ধারের এক বণিক (৩) সুলতান স্বয়ং ও অপর তিনজন। অনেকটা মিত্র-শক্তি ও গ্রীকদের অনাচারে ও কতকটা কামাল পাশার গুণে, সমস্ত তুর্কজাতি জাতীয় আন্দোলনের পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু ইংরাজের পৃষ্টপোষিত গ্রীকদের বিরুদ্ধে তুর্কীগণ কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহারা ক্রমেই হারিতে লাগিল। কিন্তু তবুও জাতীয় দলের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটুট রহিল। পরিবর্ত্তী নির্ব্বাচনে মিত্র শক্তির মত ও ইচ্ছার প্রতিকূলেও দেশবাসীরা জাতীয়-দলের লোককেই নির্ব্বাচিত করিল। কিন্তু ইংরাজ এই অপমান সহ্য করিল না। ইংরাজের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এই সব সভ্যরা কনষ্টেন্টিনোপল এঙ্গোরাতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কনষ্টেন্টিনোপলে থাকা কালীন তাঁহারা একটা জাতীয় দাবী-পত্র প্রচার করেন। এনাটোলিয়াতে আসিয়া সিভাস ও এর্জ্‌রাম বৈঠকে জাতীয় দল যে সিদ্ধান্ত করে, এই দাবী পত্রেও প্রায় তাহাই ছিল। তুর্কীগণ যতই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল, গ্রীকদের অত্যাচার ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রীকগণ যে কি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে। ১৯২১ অব্দের মে ও এপ্রিল মাসে গ্রীকগণ য়ালাভা (Yalava) জেলার গ্রামগুলি প্রায় উচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। গ্রামের নামগুলি উল্লেখ করিলাম না; কিন্তু ১নং ২নং করিয়া এক একটা গ্রামের বিবরণ দিলাম।

গ্রাম	গৃহসংখ্যা	কতটা আগুণে পোড়ান হইয়াছে
১	৪০০	সব
২	১০০	অর্দ্ধেক
৩	৫০/৬০	সব
৪	—	সব
৫	৪০	সব
৬	৫০/৬০	সব
৭	৬০	সব

....

....

অর্থাৎ এই ভাবে বহু গ্রামের সব লোককেই গৃহহীন করিয়া গ্রীকগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার নমুনা দেখাইল।

আখিসার (Akhissar) জেলার ১২টি গ্রাম অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও হত্যার দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। সোঘানদরে (Soghendere) জেলার প্রয় ৩০ খানা গ্রাম, আইদিন জেলার ১৪ খানা গ্রাম এবং আরও বহু জেলার বহু গ্রাম ইংরাজের পৃষ্ঠপোষিত গ্রীকগণ এই ভাবে ধ্বংস করিয়াছিল। অবশ্য গ্রীকদের এই সব নৃশংস অত্যাচারের পর, তুর্কীগণ এনাটোলিয়ার গ্রীক অধিবাসীদের উপর প্রতিশোধ লইতে কসুর করে নাই। গ্রীক ও তুর্কীর রক্তে এনাটোলিয়া রঞ্জিত হইয়া গেল—সেই রক্ত-উর্ব্বরিত এনাটোলিয়াতেই নূতন তুর্কীজাতির জন্ম হইল।

স্মার্ণায় গ্রীক শাসনের প্রকৃষ্ট নমুনা দেখা যায় নিম্নের দুইটি ঘটনা হইতে। স্মার্ণাতে সুলতানিয়া নামে একটা বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে বহু তুর্কী ছাত্র পড়িত এবং প্রায় সব ছাত্রই বিনা বেতনে পড়িত। এই বিদ্যালয়টি সাধারণের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু পরে তুর্কী সরকার বছর ৪০,০০০পাউণ্ড সাহায্য করিত। গ্রীকগণ বলিল এটা সরকারী সম্পত্তি এবং সোভ্রে সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে সরকারের সমস্ত সম্পত্তিই তাহারা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। এই অজুহাতে তাহারা এই বিদ্যালয়টি ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেখানে গ্রীক বিচারালয় করিল। তুর্কীগণ বলিল,—প্রথমতঃ এটা সরকারী সম্পত্তি নয়, দ্বিতীয়তঃ সাভ্রে সন্ধি এখনও স্বাক্ষরিত হইয়া পাকা (ratified) হয় নাই ; তৃতীয়তঃ সাভ্রে সন্ধির অপর সর্ত্ত অনুসারে তাহারা স্মার্ণাতে স্থানীয় প্রতিনিধি সভা (Local Parliament) ও অন্যান্য যে সব সুবিধা পাইতে পারে। তাহা গ্রীকরা দিতেছে না, অথচ নিজেদের বুঝটা ষোল আনার উপরে বিশ আনা বুঝিয়া লইতেছে। গ্রীকগণ আরও নানা বাজে কথা বলিয়া শেষে বলিল, তোমরা অন্য বাড়ী ঠিক কর, আমরা এই বাড়ী দখল করিলাম এবং এর ভাড়া দিব। যুদ্ধের ফলে স্মার্ণাতে এত বড় বাড়ী একটাও ছিল না, তাহা গ্রীকগণ বেশ ভাল রকমই জানিত। ভূতপূর্ব্ব তুর্কী শাসনকর্ত্তা তুর্কী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রসূতি চিকিৎসালয়ের (maternity hospital) জন্য দুইটা বড় বাড়ী তুলিতেছিল, সেই দুইটা বাড়ীও গ্রীকগণ দখল
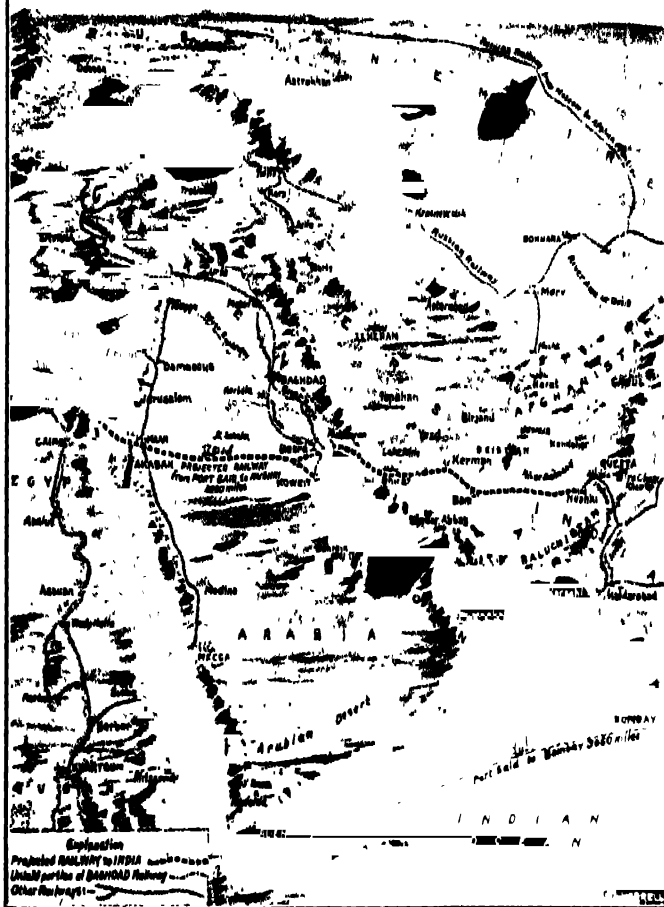
করিয়া সেখানে গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিল। গ্রীকগণ ইহাও বলিল—স্মার্ণা যখন তুরস্ক হইতে বিচ্ছিন্নই হইল, তখন আর তুর্কী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া কি হইবে! তোমাদের পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে স্মার্ণা বা এথেন্সের গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পার।

দ্বিতীয় ঘটনা হয় একটি তুর্কী হাসপাতাল লইয়া। এই চিকিৎসালয় সাধারণের চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; ইহার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ৭০০০ পাউণ্ড। এই আয় হইতে এই চিকিৎসালয়ের সব খরচ চলিত। ইহাতে ৪০০ রোগীর বিছানা ছিল। গ্রীকগণ এই চিকিৎসালয় ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের হাতে নিল। কিছুদিন পরই ৪০০ রোগীর স্থানে মাত্র ৮০ এবং আরও কিছু দিন পরে মাত্র ৪০টি রোগী তাহারা রাখিত; সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ তাহারা আত্মসাৎ করিত। কিন্তু পরে তাহারা একদম হাসপাতাল উঠাইয়াই দিল এবং সমস্ত সম্পত্তি (সাধারণের দান) বাজেয়াপ্ত করিল। ঠিক সেই সময়ই বোধ হয়, তুর্কীদের পক্ষে এই চিকিৎসালয়টীর সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল। গৃহ-দাহ ও লুণ্ঠনের ফলে দেশবাসীর আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। তার উপর কু-আহার, অল্পাহার ও গ্রীক সৈন্যদের অত্যাচারে রুগ্ন ও পীড়িতের সংখ্যাও সাধারণ সময় হইতে অনেক বেশী ছিল। তাই 'Red Crescent Society' অস্থায়ী ভাবে একটা চিকিৎসালয় খুলিল; সেখানে কেবল বাহিরের রোগীর (out-door patient) চিকিৎসা হইত; ভিতরে রোগীদের রাখার

ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারে নাই। স্থানীয় চাঁদা ও দানের উপরই এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি নির্ভর করিত।

গ্রীকগণ বুঝিল যে গায়ের জোরে দখল করিলেও জগতের নিকট দেওয়ার মত একটা কৈফিয়ৎ থাকা উচিত। তাই তাহারা দলে দলে তুর্কীদের নির্ব্বাসিত করিতে লাগিল ;—মান্যসা (Manysa), নিফ (Nif), কসাবা (Kasaba) প্রভৃতি বহু জেলার তুর্কীগণ দলে দলে নির্ব্বাসিত হইল।* তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে নির্ব্বাসন করিয়া গ্রীক হইতে তুর্কী অধিবাসীর সংখ্যা কমান এবং নিরাপদে দেশ শাসন করা। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য তাহারা বিশেষ ভাবে শিক্ষিতদেরই নির্ব্বাসিত করিত, নেতাদের নির্ব্বাসন দিলে সাধারণ লোকদের বশকরা ও শাসনকরা বেশী কষ্ট নয়। নির্ব্বাসিতদের উপর যে কত অত্যাচার হইত, তাহার হিসাব পাওয়া কঠিন। নির্ব্বাসনের পথে রক্ষীরা অনেককে হয়ত হত্যা করিত ; অনেকের মৃতদেহ নানাস্থানে পাওয়া যাইত এবং অনেকের কোন খবরই পাওয়া যাইত না। গ্রীকগণ তুর্কী রমণী ও ইসলাম ধর্ম্মেরও অপমান করিতে পশ্চাদপদ হইত না।

অবশ্য ইহার পর জাতীয় দল ও তাহাদের অধিকৃত দেশ হইতে গ্রীকদের নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কিন্তু তাহারা হতভাগ্য

* On the Greek side, I have information of deporting from the districts of Manyasa, Nif, Kasaba, Salyhly, Akhissar, Alashehir, Kula, Ūshaq, Torbaly, Bandyr, Tire, Odemish, Aidin, Nazylly—in fact from all over the interior of the occupied territory.

নির্ব্বাসিতদের উপর এত অত্যাচার করে নাই; গির্জার উপর বা খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর তাহারা কোন অত্যাচার করে নাই। জাতীয়তার নামে তাহারা পশুত্বকে প্রশ্রয় দেয় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই গ্রীকগণ ও বল্কানগণ নিজ নিজ রাজ্য হইতে তুর্কদের নির্ব্বাসন দিতে আরম্ভ করে। ১৯১২ অব্দের বল্কান যুদ্ধের পর ইহা আরও বৃদ্ধি পায়। গ্রীস, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, এলবেনিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে বহু তুর্কী ছিল। আজ এইসব দেশ প্রায় তুর্কীশূন্য হইয়াছে। বল্কান যুদ্ধের সময় খৃষ্টানগণ অল্প সংখ্যক মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে।* এই সব অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ। তুর্কীগণ অবশেষে তাই করিতেছিল। এই সব গৃহহীন নির্ব্বাসিতদের ব্যবস্থা করার জন্য তুরস্ক সরকারের একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী ও একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল (Ministry of Refugees)। এই বিভাগের সাহায্য ছাড়া সাধারণের তরফ হইতেও সাহায্যের ব্যবস্থা হইত; অনেকে পথে মারা যাইত; অনেকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিত। তবুও ১৯১৩-১৯২০ পর্য্যন্ত এই 'নির্ব্বাসিতের মন্ত্রী'র হাত দিয়া ৪১৩৯২২ জন নির্ব্বাসিতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

* As the Turkish forces fell back, the Christian population rose against the Moslem minorities in the invaded provinces. Villages were looted and burnt wholesale; there was also murder and violation".—Western Questions in Greece and Turkey—P. 138.

যুদ্ধের সময় ও পরে গ্রীক, আর্ম্মেনীয়ান ও রুষের অত্যাচারে বহু লক্ষ তুর্কী গৃহহীন হইয়াছে। এক মাত্র ১৯১৬-১৮ অব্দের মধ্যে রুষিয়ার অত্যাচারে প্রায় ৯ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। অবশ্য তুর্কীগণও গ্রীক এবং আর্মেণিয়ানদের নির্ব্বাসিত করিয়াছে। সিলিসিয়ার আর্মেণিয়ানগণ ফরাসীর উৎসাহে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (১৯২০)। কিন্তু ফরাসীগণ যখন তুর্কীদের সহিত সন্ধি করিল, তখন তুর্কীগণ আর্মেণিয়ানদের দলে দলে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিল। তিন লক্ষের বেশী আর্মেণিয়ান সিলিসিয়া হইতে ইরিভানে (Erivan) পালাইয়া যায়।

বর্ত্তমান স্বদেশীকতার একটা প্রধান অবলম্বন হইল—এক-জাতিত্ব। নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত বল্কানগণ দেখিল তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে বহু বিজাতীয় তুর্কী মুসলমান আছে। তাই তাহারা যে করিয়া হউক মুসলমানদের তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইল। অবশেষে অত্যাচার ও নির্ব্বাসনের ফলে সমস্ত বল্কান আজ প্রায় তুর্কী-শূন্য হইয়াছে। এঙ্গোরার তুর্কীগণও দেখিল একটি শক্তিমান জাতি গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এনাটোলিয়ায় গ্রীকগণ এক প্রধান অন্তরায়। এনাটোলিয়ার চেয়ে গ্রীস উহাদের প্রিয়, তুর্কী প্রতিবেশীর চেয়ে সাগরের ওপারের অজ্ঞাত গ্রীকগণ তাহাদের বেশী আপনার। এই প্রকার লোক লইয়া একটা জাতি গঠন করা অসম্ভব। তাই তাহারাও আজ এনাটোলিয়াকে আর্মেণিয়ান ও গ্রীক শূন্য করিতেছে। আজ

এনাটোলিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে তুর্ক-ভূমি বলা যায়—তাই আশা হয় এবার তুর্কীগণ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জগত সমাজে মাথা উচু করিয়া দাড়াইতে পারিবে।

গ্রীকগণ যখন স্মার্ণা দখল করিল, তখন এনাটোলিয়ার তুর্কীগণ প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত ছিল। কামাল যাইয়াই একটা জাতীয় তুর্কী সৈন্য বাহিনী সংগ্রহও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এত বড় একটা কাজ একদিনে হয় না। তাই প্রথম প্রথম গ্রীকগণ প্রায় বিনা বাধায় নগরের পর নগর দখল ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সেভ্রে সন্ধি অনুসারে যে বিভাগটুকু তাহার প্রাপ্য, সে তার চেয়ে অনেক বেশী স্থান দখল করিল। কার্য্যতঃ স্মার্ণার উত্তরে সাগর তীরের প্রায় সবই গ্রীসের দখলে গেল। তখনও জাতীয় দল প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

১৯১৯ অব্দের মে মাস হইতে ১৯২০ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত গ্রীক আক্রমণের এক পর্য্যায় গেল। সন্ধিসভা গ্রীকদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া দেয় নাই—গ্রীকগণও যতটা সম্ভব দেশ দখল ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহার পর জাতীয় দল একটু একটু করিয়া মাথা তুলিতে লাগিল। ইংরাজগণ দেখিল হয় ইস্মিদ (Ismid) উপদ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিতে হয়, নতুবা তুর্কী জাতীয় দলের নিকট পরাজিত হইতে হয়। ফরাসীরাও দেখিল সিলিসিয়াতে তুর্কী জাতীয় দলের সহিত পারিয়া উঠা কঠিন। অথচ পরাজয় স্বীকারও আত্মসম্মানের হানিকর। তাই

তাহারা, বিশেষতঃ ইংরাজরা প্রকাশ্য ভাবেই গ্রীকদের সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে লাগিল। চুক্তি হইল—যাহাতে জাতীয় দল ইস্‌মিদের দিকে না যাইতে পারে, গ্রীকগণ সেই ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার বিনিময়ে তাহারা পূর্ব্ব-থ্রেসও দখল করার অনুমতি পাইল;—গ্রীকগণ স্মার্ণার পূর্ব্বেও অগ্রসর হইতে পারিবে।

এই অনুমতি পাওয়া মাত্রই চারিটি গ্রীক বাহিনী চারদিকে ধাবিত হইল। একটি বাহিনী মান্থসা হইতে উত্তরে মর্ম্মোরা সাগরের দিকে চলিল। অপর দল পূর্ব্ব দিকে উষাক (Ushak) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তৃতীয় দল দক্ষিণ হইতে মিয়েন্দার নদীর উত্তর তীর বাহিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিল। চতুর্থ দল জল পথে ইসমিদে গেল। তুর্কীগণ তখনও বাধা দিবার মত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাই গ্রীক বাহিনীকে তাহারা বাধা দিতে পারিল না।

কিন্তু এমন ভাবে আর বেশীদিন চলিল না। জাতীয় দলের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল—অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করার মত পর্য্যাপ্ত অস্ত্র তাহাদের ছিল না। অবহার সর্ত্ত অনুসারে প্রায় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই তুর্কীগণ মিত্র-শক্তির হাতে সমর্পন করিয়াছিল। তাহার অনেকটা গেলি-পলিতে মিত্রশক্তিরা রাখিয়াছিল। জাতীয় দল হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল। সিলি-সিয়াতে ফরাসীদের আক্রমণ করিয়া, তুর্কীগণ তাহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ফরাসীগণ অগত্যা সিলিসিয়ার

আর্মেণিয়ানদের উত্তেজিত, প্রলুব্ধ ও সশস্ত্র করিয়া, তাহাদের দ্বারা তুর্কী জাতীয় দলকে বাধা দেওয়াইতে লাগিল। এই সব আর্মেণিয়ান বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র তুর্কীদের হাতে পড়ে। উত্তরে আর্মেণিয়ার আর্মেণিয়ানদের দিয়া তুর্কী জাতীয় দল ও বলশেভিকদের বাধা দেওয়াইবার জন্য, ইংরাজগণ আর্মেণিয়ানদের জন্য অনেক অস্ত্র শস্ত্র পাঠায়। এসব অস্ত্র শস্ত্রেরও অনেকটা জাতীয় দল হস্তগত করে। এই সব উপায়ে কতকটা অস্ত্র শস্ত্র তাহাদের হাতে আসিল।

পরাধীন জাতির পক্ষে আজকালকার উপযোগা অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। সশস্ত্র বিদ্রোহ করার মত অস্ত্র পাওয়ার মাত্র দুটি পথই তাহার নিকট খোলা আছে।— (১) যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে, তাহারই অস্ত্রশস্ত্র কোন উপায়ে হাত করা। ঠিক তুরস্কের জাতীয় দল যেমন করিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডে ড্যান ব্রিনও (Dan Breen) এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। (২) কোন বৈদেশিক যুদ্ধের সময়, বা পরে শাসক জাতির শত্রুর নিকট হইতে অস্ত্র সাহায্য পাওয়া। আমেরিকার বিদ্রোহের সময়, বিদ্রোহীরা ফ্রান্স ও স্পেনের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছে। বুয়ার যুদ্ধের সময় বুয়ারগণও এই ভাবে অনেক সাহায্য পাইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় রোজার কেসমেণ্ট আইরিশ বিদ্রোহীদের জন্য জার্ম্মেণী হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন; ভারতীয় বিদ্রোহীরাও

জার্ম্মেণীর সাহায্য পাইয়াছিল। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ড বা ভারতবর্ষ কেহই জার্ম্মেণীর প্রেরিত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কাজে লাগাইতে পারে নাই। এই ভাবে শাসক জাতির শত্রু পক্ষ হইতে অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া আজকালকার দিনে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য প্রথম পথও যে খুব সহজ তা নয়। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে হইলে অস্ত্র সংগ্রেহের এই দুই পথই আছে।

গ্রীক ও তুর্কীদের সহিত প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ হয়। ইনওনু (Inonu) ক্ষেত্র। উত্তরে ব্রুসা (Brusa) হইতে ও দক্ষিণে উষাকে (Ushaq) হইতে গ্রীক বাহিনী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উত্তর বাহিনী অতি কষ্টে এস্কিসেহির (Eskisehir) ও দক্ষিণ বাহিনী কর হিস্‌সার (Kara Hissar) দখল করিল। ১৯২১ অব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে ইনওনুর যুদ্ধে জাতীয়দল গ্রীকদের পরাজিত করিয়া এস্কিসেহির ও করা হিস্‌সার পুনরায় দখল করিল। গ্রীকগণ ভীষণ ভাবে পরাজিত হইয়া, অতি কষ্টে পলায়ন করিতে পারিল। তাহাদের বহু লোক মারা যায়। কিন্তু এই পরাজয়ের পর, গ্রীকগণ ইংরাজের সাহায্যে আবার তুর্কীদের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইল। আবার ইনওনুতে যুদ্ধ হয়। এবার তুর্কীগণ পরাজিত হয়।

গ্রীকগণ জয়ী হইল—কিন্তু ফয়দা হইল না কিছুই। বিদেশে গ্রীক মুদ্রার (Drachma) দাম কমিয়া গেল। দেশের লোক

এই অফুরন্ত লড়াইতে হয়রাণ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আড়াই বৎসর যুদ্ধের পর ও তুর্কীদের ধ্বংস করা বা দমন করার কোন পন্থাই দেখা গেল না। সমস্ত তুর্কীজাতি যেন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও এই যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত। বন্দী তুর্কী সৈনিক ও সেনানীদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াও গ্রীকগণ বুঝিল, এই জাতিকে একটা বা দশটা যুদ্ধে পরাজিত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাকে শাসন ও দমন করা সহজ নয়। বন্দীরা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বলিল, শেষ তুর্কীটি পর্য্যন্ত গ্রীকদের বাধা দিবে।

এদিকে ফরাসীরা দেখিল, ইংরাজের স্বার্থের জন্য কেন তাহারা অনর্থক তুরস্কের সহিত লড়িয়া মরে। জার্ম্মেণ যুদ্ধের ফলে জাতীয় ঋণ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়াছে—ব্যবসায় বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, প্রায় অর্দ্ধেক দেশ ধ্বংস হইয়াছে, সবল সুস্থ পুরুষের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার পরও আবার যুদ্ধ চালাইবার অর্থ জাতির পক্ষে আত্মঘাতী হওয়া। তাই ইসুফ কামাল পাশার সহিত ফরাসী দূত ফ্রাঙ্কলিন-বুলও (Franklin Bouillon) একটা মিটমাটের কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ফরাসীরা সিলিসিয়ার উপর সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া তুর্কীদের সহিত সন্ধি করিল—অর্থাৎ ফরাসীরা কার্য্যতঃ এঙ্গোরা সরকারকে মানিয়া লইল। ইটালী পূর্ব্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফরাসী ও ইটালী এখন হইতে তুরস্ককে কিছু কিছু সাহায্যও করিতে লাগিল। এঙ্গোরা সরকার বলশেভিকদের সহিতও একটা আপোষ করিল।

এইবার গ্রীকগণ বুঝিল ব্যাপার সহজ হইবে না। তুর্কী বাহিনীর নিকট গ্রীকগণ ক্রমেই পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা স্মার্ণা হইতেও বিতাড়িত হইল। স্মার্ণা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় গ্রীকগণ স্মার্ণার উপর আর এক দফা অত্যাচার করিয়া গেল। ইংরাজের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তুর্কী জাতীয় দল এনাটোলিয়াতে স্বাধীন ও স্বপ্রধান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। তাহারা প্রথমেই Capitulations বা বিদেশীর বিশেষ সুবিধাগুলি রহিত করিয়া নিজেদের প্রকৃত স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

কামাল ও তুর্কী জাতীয়তা

মুসলমান ধর্ম্মের শিক্ষায় সর্ব্বদেশের মুসলমানগণ নিজদিগকে এক জাতির লোক বলিয়া মনে করে। একদেশবাসী মুসলমান সেই দেশবাসী অ-মুসলমানের চেয়ে অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট অপর কোন এক দেশের মুসলমানকে বেশী আপনার বলিয়া মনে করে। বিধর্ম্মীর সহিত কোন মুসলমানের যুদ্ধ হইলে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য নিজ ধর্ম্মাবলম্বীকে সাহায্য করা, মুসলমানের সহিত মুসলমানের যুদ্ধ করা অন্যায়—ইহাই হইল ইসলামের শিক্ষা। মুসলমানের নিকট সকল দেশের চেয়ে জজুরৎ-উল-আরব প্রিয়তর, এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে খলিফাই সবচেয়ে মান্য। *

---

* খেলাফৎ ডেপুটেশনে বিলাতে যাইয়া, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জকে মহম্মদ আলি বলিয়াছিলেন, "No population and no territory could be so dear to the Muslims as the Arabs and Arabia."

—"The Turks and Europe."—P. 323

তাই দেশগত স্বাজাত্যবোধ (territorial patriotism) তাহাদের মধ্যে কম। মুসলমানদের খলিফা-প্রীতি ও আরব-প্রীতি কার্য্যতঃ দেশাতীত স্বাজাত্যবোধেরই (Extra-territorial patriotism) রূপান্তর।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও দেশাতীত স্বাজাত্য বোধের পরিবর্ত্তে দেশগত স্বাজাত্য বোধ (territorial patriotism); ধর্ম্মগত জাতীয়তাবোধের (religious nationalism) পরিবর্ত্তে গোষ্ঠিগত জাতীয়তাবোধ (Ethnological nationalism) প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও বহু মুসলমান পীর বা মৌলানা মনে করেন, ভারতের দেশগত স্বাজাত্য বোধে ভারতীয় মুসলমানদের যোগ দেওয়া অন্যায় ও আত্মঘাতক। কিন্তু আশার কথা এই যে ক্রমেই এই ভাবটা দূর হইতেছে।

তুরস্কে গোষ্ঠিগত স্বাজাত্যবোধের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সার্ব্ব-তুরাণীয় (Pan-Turanism) আন্দোলনে। যখন সার্ব্ব-ইসলামবাদ (Pan Islamism) ও সার্ব্ব-স্লাভবাদের (Pan-Slavism) চাপে পড়িয়া তুরস্কের জাতীয় শক্তি ক্রমেই ক্ষয়িত হইতেছিল, তখন নব্য তুর্কী-সমাজ বুঝিল যে সার্ব্ব-ইসলাম রাজ্যের স্বপ্ন ও ধর্ম্ম-উন্মাদনা (Fanaticism) পরিহার করিয়া গোষ্ঠিগত স্বাজাত্যবোধ (ethnological nationalism) না জাগাইতে পারিলে সার্ব্ব-স্লাভবাদের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। তাই তাহারা সার্ব্ব-তুরাণীয় আন্দোলন আরম্ভ

করিল। তুর্কী, মোগল, মাঞ্চু, মেগিয়ার, ফিন, সেমোয়েড (Samoyeds) ও তুঙ্গারেস (Tungares) এই সব জাতি তুরাণীয় গোষ্ঠির (stock) অন্তর্গত। এই আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ইয়ুসুফ আহচোরা ওগ্লো (Youssouf Ahtchara Oglow) ও আহম্মদ আগেয়েফ (Ahmed Ageyeff)। ১৯১৮ অব্দে অবহারের পর ইংরাজরা আহম্মদকে বন্দী করিয়া মাল্টাতে নির্ব্বাসিত করে।

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কীজাতি বুঝিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শ গ্রহণ না করিলে, বর্ত্তমানে জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে পারা অসম্ভব। জাতীয় জাগরণের প্রথম উচ্ছ্বাসে নব্য তুর্কীদলের নেতারা সার্ব্ব-ইসলামবাদের আদর্শ ও ইসলামের অতীত মহিমা প্রচার করিতে থাকেন। ক্রমে কোমল বে, শিনাসী এফাণ্ডি ও সাদুল্লাপাশা প্রভৃতি নেতারা বুঝিলেন ইসলামের দোহাই দিয়া তুর্কীকে জাগাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ইসলামের অতীত গৌরবে তুর্কীদের কোন অংশই নাই—এবং তুর্কীদের দিগ্বিজয় ও অতীত গৌরব, অনেকটা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে। আরবীয়দের জয় করিতে যাইয়া তাহারা আরবীয়দের নিকট এক হিসাবে পরাজিত হইল। তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করার অর্থ হইল যে আরবীয়দের নিকট তুর্কী জাতি নিজেকে ছোট করিয়া দিল। তাই আরবীয় মুসলমানরা তুর্কী মুসলমানদের একটু অবজ্ঞার চোখে দেখিতে লাগিল।

তাই কেমল, সাদুল্লা প্রভৃতি নেতারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইসলাম প্রভাব বর্জ্জন করিয়া গোষ্ঠিগত স্বাজাত্যবোধ জাগাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই নূতন দলের চেষ্টা হইল, তুর্কী সমাজ হইতে বিদেশী অর্থাৎ আরবী ও পারশিক প্রভাব বর্জ্জন করা। তাঁহাদের চেষ্টায় তুর্কী ভাষা আরবী ও পারশিক প্রভাব এড়াইয়া অনেকটা সহজ হইল।

এই সময় সুলতান আবদুল মেদজদের মৃত্যুর পর আব্‌দুল আজিজ (১৮৬১-১৮৭৬) তুরস্কের সুলতান হন। কিন্তু তাঁহার শাসনে তুরস্কের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮৭৬ অব্দে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

সুলতান আব্দুল আজিজ তুরাণীয়বাদের বিরুদ্ধে তাঁহার রাজদণ্ড ধারণ করেন। এই আন্দোলনের নেতারা প্যারীতে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে মুস্তাফা ফজিল পাশা নামে এক মিশরীয়ের নেতৃত্বে 'নব্যতুর্কী' দল গঠন করিলেন। ক্রমেই এই বিদ্রোহীদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। ১৮৭৬ অব্দে মিধৎপাশার নায়কত্বে নব্য তুর্কীদল বিদ্রোহ করিয়া, সুলতান মুরাদকে সিংহাসনচ্যুত করে। নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল, মিধৎপাশা প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তুরস্কের ভাগ্য গগন সুপ্রসন্ন মনে হইল। কিন্তু ১৮৭৭ অব্দে সুলতান আবদুল হামিদ নূতন ব্যবস্থা সব বদলাইয়া ফেলিলেন—মিধৎপাশাকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। প্রকাশ্যে সব আন্দোলন বন্ধ হইল—

নব্য তুর্কীদল গুপ্ত ষড়যন্ত্র সমিতি স্থাপন করিয়া সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। প্যারী, কাইরো, প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্রোহীদের পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। কাইরো হইতে প্রকাশিত 'তুর্ক' পত্রিকাই সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল। এই সব পত্রিকার লেখকগণ প্রায় সকলেই ছদ্ম নামে প্রবন্ধ লিখিতেন।

কিন্তু কেমাল বে ও সাহুল্লাপাশাই সাহিত্যের দিকে অগ্রণী ছিলেন। ইসলাম প্রভাব এড়াইয়া ও বর্ত্তমান কালোপযোগী পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া তুরস্কে জাতীয় জীবনের পত্তন করার তাঁহারাই পথ প্রদর্শক। ইঁহারা একান্তভাবেই দেশকে ও তুর্কীজাতিকে ভালবাসিতেন। ইঁহারা একদিকে যেমন কর্ম্মী ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, অপরদিকে ইঁহারা ছিলেন সাহিত্যিক ও কবি। স্থলতান আব্‌দুল হামিদের অনাচার ও অত্যাচারে সাহুল্লা পাশা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলেন; তাই তিনি আত্মহত্যা করেন।

দেশের মঙ্গল চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া, তিনি আত্মহত্যা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই মৃত্যু বৃথা গেল না। নব্যতুর্কীদল তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শে ক্রমেই ইসলাম প্রভাব এড়াইয়া জাতীয় ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তাই আজ তুর্কীগণ জাতির নামে, জাতির উন্নতির পরিপন্থী স্থলতান ও খলিফা পদ রহিত করিতে পারিয়াছে। আজ তুর্কীগণ জোর গলায় বলিতে পারে, 'আমরা প্রথমে তুর্কী এবং পরে ধর্ম্মে মুসলমান'। বাস্তবিক, ধর্ম্ম হইল

ব্যক্তিগত, জাতীয় সমস্যার সহিত ধর্ম্মকে মিশাইয়া ফেলার ফলে জাতীয়তা ও ধর্ম্ম উভয়কেই পঙ্গু করা হয়।

সার্ব্ব-তুরাণীয় আন্দোলনের আর একটা কারণও আছে। ১৮৭৭ অব্দের পর হইতে, রুষিয়া তাহার অধীন মধ্য এসিয়ার তুর্কীদের ধর্ম্মে, আচারে, জাতিতে—সর্ব্বতোভাবে রুষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে একদিকে চলিল অত্যাচার, অপর দিকে চলিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার। স্বগোষ্ঠির এতগুলি লোকের প্রতি এই প্রকার ব্যবহারে, তুরস্কের তুর্কীগণের মনে একটা বেদনা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। সার্ব্ব-তুরাণীয় আন্দোলনের ফলে বিদেশের তুর্কীদেরও নিজেদের সহিত টানিয়া রাখিবার একটা উপায় হইতে পারে, এই আশাও তাহারা করিল।

আজ তুর্কীগণ খলিফা পদ রহিত করিয়া দিয়া, ইসলামের বন্ধন হইতে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করিয়াছে। সমাজে, আচারে, পোষাকে, সাহিত্যে সব দিকেই আজ সে প্রাচীন প্রাক-ইসলাম তুরাণীয় জীবনে ফিরিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানের তুর্কী কবি জিয়া গোক আল্প (Zia Gok Alp) আটিলা, জেঙ্গিজ-খান এবং ওগুজ খানের (Oghuz khan) দিগ্বিজয়ের কাহিনী শুনাইতেছে। জিয়া গোক আল্পের একখানা পুস্তকের নামে 'কিজিল এল্মা' (Kizil Elma) অর্থাৎ 'রাঙা আঁতা'। তিনি সার্ব্ব-তুরাণীয় আন্দোলনের ঋষি এবং তুর্কীদের জাতীয় কবি। এঙ্গোরার জাতীয় সম্মিলনী নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁহার নাম

অনুমোদন করিয়াছে। ইংরাজগণ তাঁহাকেও মাল্টাতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল।

সমাজের দিকেও তাহারা ইসলাম প্রভাব বর্জ্জন করিতেছে। ইসলাম সমাজের একটা প্রধান বিশেষত্ব হইল নারীর অবগুণ্ঠন প্রথা। তুর্কী সমাজ তাহা বর্জ্জন করিয়াছে। আজ দলে দলে তুর্কী নারী ইসলামের অবরোধ ও হারেমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া, দেশের ও রাষ্ট্রের কার্য্যে যোগ দিতেছে। আজ বিশ্ব-বিত্তালয়ে, ডাক্তারী বিদ্যালয়ে, সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, চাকুরীতে দেশ সেবায় সর্ব্বত্রই তুর্কী রমণীগণ আছে। ওয়াসিংটন আন্তর্জাতিক স্ত্রী সভায় (International Women's Congress) তুর্কীর প্রতিনিধিও গিয়াছিল। জাতীয় সংগ্রামে হালিদে এদিদ হানুম (Halide Edid Hanum) বরাবরই কামালের সঙ্গিনী ছিলেন এবং ইংরাজের ইঙ্গিতে দামাদের সরকার কামালের সহিত তাঁহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। আজ তুর্কী রমণীগণ পুরুষের সহিত সমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছে। 'জাতীয় সম্মিলনী' ঠিক করিয়াছে, পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকিতে পারিবে না; তালাক ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও তুর্কী রমণীগণ পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দাবী পাইয়াছে। তুর্কী রমণীদের পরিচালিত বিত্তালয় ও অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠান (যথা—অনাথ আশ্রম, আতুর আশ্রম) তাহাদের যোগ্যতারই পরিচয় দিতেছে।

পোষাক পরিচ্ছদেও তাহারা ইসলাম প্রভাব বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণের পর যে টুপি ইহারা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তাহা বন্ধ করিয়া, প্রাক-ইসলামী তুর্কী সমাজের ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজের টুপির প্রচলন করিতেছে।

আজ তুরস্ক সর্ব্বপ্রকারে আরবী ও পারশিক প্রভাব এড়াইয়া নিজের বিশিষ্ট সত্ত্বাকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর তুর্কী সমাজ বুঝিল যে, এক রাষ্ট্রের মধ্যে খলিফা ও রাষ্ট্রনায়ক—দুই শক্তি থাকিলে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও কর্ম্ম-শক্তি কমিয়া যায়। তাই এঙ্গোরার 'জাতীয় সম্মিলনী' খলিফা-পদ রহিত করিয়া দেয়। ভারতের খলিফা পদ রহিত করিলে পর খিলাফৎ কমিটি প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিল; উত্তরে কামাল পাশা তাহাদের জানাইয়াছিলেন,—

"তুরস্ক গণতন্ত্রের মধ্যে খলিফা থাকিলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে ঐক্য থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রই খলিফা—তাই খলিফা পদ রহিত করিয়া দিয়াছি। খলিফাপদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ইসলাম জগতকে এক শাসনাধীনে আনা—তাহা ত' হয়ই নাই; বরং ইহার ফলে বিভিন্ন মুসলমান দেশের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজেরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠা দরকার।"

কামালের এই উত্তর হইতেই তাঁহার ও নব্যতুর্কী সমাজের আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে। এতদিন তুরস্ক আরবের অনুকরণ করিয়াই চলিয়াছে। তাহার কোন বিশিষ্ট সভ্যতা সে গড়িয়া

তুলিতে পারে নাই। আরবীয় সভ্যতার ভারে তাহার নিজের প্রাক-ইসলাম যুগের সভ্যতা চাপা পড়িয়াছিল। পারশ্য সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা খাটে। মুসলমান পারশ্য আর তাহার প্রাচীন গৌরবের অধিকারী হইতে পারে নাই। সাইরাস ও ডেরিয়াসের জাতি আরবের অনুকরণ করিয়াই এই ১২ শত বৎসর কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেও তাহার নিজের কোন বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িতে পারে নাই। মিশর সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে। ইসলামের শিক্ষার গুণে বা দোষে সর্ব্বদেশের মুসলমানই যেন এক ছাঁচে গড়িয়া উঠে। একমাত্র স্পেনের মূর ও ভারতের মোগলগদের সম্বন্ধে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। খ্রীষ্টান জগতে যেমন আদর্শ, রাষ্ট্র পদ্ধতি, সাহিত্যের ধারা, দর্শন, কলা, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখা যায়, ইসলাম জগতে তাহা বিশেষ নাই। সবদেশের মুসলমানই যেন একই সভ্যতা ও আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, বৈচিত্র্য বিশেষ নাই।

নব্য তুর্কী এই প্রভাব এড়াইয়া এইবার নিজের বিশিষ্ট সত্ত্বা ও সভ্যতার ধারাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে উদগ্রীব হইয়াছে। স্বাধীনতা বা জাতীয়তার সার্থকতাই এইখানে। জগতে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র থাকার ফলে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন রকম ধারা পাইতেছি। যে স্বাধীন জাতি একটা বিশেষ সভ্যতার ধারা গড়িতে না পারে, তাহার স্বাধীনতার মূল্য খুবই কম—অন্ততঃ জগতের অন্যান্য জাতির পক্ষে।

তুরস্ক আজ ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্ম (state religion) হিসাবে দেখে না—ধর্ম ও রাষ্ট্র যে আলাদা, এটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আজ সে রাষ্ট্র-ধর্ম হিসাবে কোন কিছু স্বীকার করিতে রাজী নয়। যত সব ওয়াকফ্ (Wakf) বা ধর্ম্ম-সম্পত্তি ছিল তাহা আজ রহিত করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উলেমা বা হোজারা (ধর্ম্ম-গুরু) যে সব বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত, তাহাও আজ রহিত করা হইয়াছে; মাদ্রাসা বা ধর্ম্ম-বিদ্যালয় রহিত করিয়া secular বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। ধর্ম্মাচরণেও আধুনিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মসজিদে আধুনিক শিক্ষা-সম্পন্ন ইমাম নিযুক্ত, বাদ্যযন্ত্র প্রচলন, আরবীর পরিবর্ত্তে তুর্কী ভাষায় নমাজ পড়ানো, জুতা লইয়া যাহাতে মসজিদে বসিতে পারে তেমন আসনের ব্যবস্থা—এই সবই আজ আইনের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে প্রচলিত ইসলামী বিশ্বাস ও বিধি ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া এই সব নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোরাণের রাষ্ট্রানুমোদিত (authorised) এক তুর্কী অনুবাদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

নব্য তুর্কী বহু বছর পূর্ব্বে ইসলাম আচার ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে, এতদিন পর আজ তাহা তুরস্কে সফল হইয়াছে। প্রথম হইতেই তাহাদের আদর্শ ছিল তুর্কী জাতি ও রাষ্ট্রকে নিরীশ্বরবাদের উপর গড়িয়া তোলা। গত মহাযুদ্ধের সময় এনভার পাশা তুর্কী সৈনিকদের মধ্যে তুরাণীয় জাতির

প্রাক-ইসলামীয় আচার ও বিশ্বাস প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি সফল হন নাই। কিন্তু সামরিক বলে জয়ী হইয়া, আজ কামাল পাশা সমস্ত জাতিকে ও রাষ্ট্রকে সেই আদর্শে গড়িতেছেন। বহু বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামাও করিয়াছে, কিন্তু কামাল কিছুতেই বিচলিত হন নাই। নির্ম্মম হস্তে তিনি এই সব বাধা বিঘ্ন, দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন করিয়াছেন।

কামালের নেতৃত্বে তুর্কী সাহিত্যেও এক যুগান্তর আরম্ভ হইল। সাহিত্যের কথায় প্রথমই মনে পড়ে, আরবী হরপ লোপ করিয়া, রোমান (অর্থাৎ ইংরাজী) হরপ প্রচলনের কথা। সমস্ত তুর্কী সাহিত্যকে একটা নূতন বর্ণমালায় নূতন করিয়া লেখা যে কি কঠিন, তাহা সহজেই বোধগম্য। বাধ্যতামূলক আইন করিয়া, বিদ্যালয়ে ও সাহিত্যে এই নূতন বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত হইতেছে; কেবল এই নূতন বর্ণমালায় তুর্কীভাষায় লেখা ও পড়া শিক্ষা দিবার জন্যই নগরে নগরে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে; কামাল নিজেও এই বিদ্যালয়ে যোগ দিয়া সাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে জিয়াগোক আল্প, আব্‌দুল হক হামিদ বে, টেভিক ফিক্রেট বে, মহম্মদ আকিফ বে, ফারুক নাফিজ বে, এক্রেম বে, নৌরী বে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জিয়াগক আল্পের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইসলামী প্রভাব বর্জ্জন করিয়া একদিকে প্রাক-ইসলামী এবং অপরদিকে

আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার লেখায় বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবদুল হক হামিদ কাব্যের ভিতর দিয়া নব্যতুর্কীর অন্তরের বাণী প্রচার করেন। ফিক্রেট বে এবং আকিফ বেও নামকরা কবি। আকিফ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। নাফিজ বে কাব্য ও নাটকের আশ্রয়ে আধুনিকতার বাণী প্রচার করিতেছেন। এক্রেম বে ও নৌরী বে উপন্যাসের আশ্রয়ে নব্য তুর্কীর অন্তর-কথা প্রচার করিতেছেন।

স্বর্গীয়া নিখিয়ার হানুম লেখিকা হিসাবে বিখ্যাত। কিন্তু হালিদে এদিদ হানুমের নাম লেখিকাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পূর্ব্বে জাতীয় জীবন গঠন প্রসঙ্গে এই প্রতিভাময়ী মহিলার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রে ও জাতীয় জীবনে তিনি কামালের দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করিয়াছেন। সাহিত্যেও তিনি নূতন জাতীয়তা প্রচার করিতেছেন। হালিদে হানুম নব্য-তুর্কী রমণীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন। আজ আর পর্দ্দা ও বোরখা তুর্কী রমণীদিগকে পঙ্গু এবং দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে পারে না। আজ শত শত তুর্কী রমণী তুর্কী বাহিনীতে সেনানীর কাজ করিতেছেন।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিকতার প্রভাব সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। পুরাতন মুসলমানী আইনকানুন রহিত করিয়া, বর্ত্তমানের উপযোগী আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইটালী, গ্রীস, জার্ম্মাণী ফ্রান্স, সুজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের আইন অনুসরণ করিয়া,

কামাল তুরস্কের নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড, গ্রীস, ইটালী ও ফ্রান্স একযোগে ও পৃথক ভাবে তুরস্কের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছে এবং গত মহাযুদ্ধের সময় ও পরে তুরস্ককে প্রায় মানচিত্র হইতে লোপ করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু কামাল তবুও তাহাদের ভালটা অনুকরণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। সুলতানের আমলের ঋণ অনেকটা পরিশোধ করা হইয়াছে এবং এখনও সে চেষ্টা বিশেষ ভাবে হইতেছে। দেশের সুপ্ত ধন-সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য কামালাপশা সদাই যত্নবান। ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা প্রভৃতির জন্য দরকার মত বিদেশীর সাহায্য লওয়া হয়; কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন বিদেশীকে কোন প্রকার বিশেষ সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয় না। তুর্কীদের মধ্যে যাহাতে ব্যবসায়িক স্পৃহা জাগে, তাহার প্রতি সদাই কামালের দৃষ্টি আছে। খনি হইতে ১৯২০ অব্দে তুরস্ক মাত্র ১ লক্ষ তুর্কী পাউণ্ডের খাজনা পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই খাজনা ১১৮৬০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। কয়লা, তামা প্রভৃতি খনির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তুরস্কের বর্ত্তমান রাজস্ব ২০৭, ১৭৫, ১৯৯ তুর্কী পাউণ্ড।

রাষ্ট্র শাসনেও বর্ত্তমানের প্রভাব ক্রমেই প্রবল হইতেছে। পূর্ণ গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করাই কামালের উদ্দেশ্য এবং সবদিকেই সেই চেষ্টা চলিতেছে।

তুর্কী রাষ্ট্রের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে অক্টোবর তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন, ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা নভেম্বর পুনর্নির্ব্বাচিত হন।

১৯২৩ অব্দে নবেম্বর মাসে Grand National Assembly কর্ত্তৃক বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। Grand National Assembly প্রত্যেক ৪ বৎসরের জন্য গঠিত হয় এবং তাহার নামেই, তাহার ন্যস্ত অধিকারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী-মণ্ডলীর সহযোগে রাজ্য শাসন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের জন্ম Assemblyর কাছে দায়ী।

সব দিকেই আজ তুরস্ক নূতনকে বরণ করিয়া লইতেছে। আজ আর সে ধর্ম্মগত স্বাজাত্যবোধের মোহে অচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে রাজী নয়, আজ তাহার আদর্শ হইল গোষ্ঠিগত বা দেশগত স্বাজাত্যবোধ—তাহার দেশ ও জাতিকে বড় করাই আজ নব্যতুর্কী সমাজের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। এতদিন তুরস্ক আরবী সভ্যতার অনুকরণ করিয়া নিজের জাতীয় বিশেষত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ কামালের নেতৃত্বে যে ভাবে তুরস্ক ইউরোপীয় প্রথা ও সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে, এটাও কি তাহার জাতীয় বিকাশের পরিপন্থী হইবে না? এ আশঙ্কা করা খুবই স্বাভাবিক। ঠিক তিন শতাব্দী পূর্ব্বে পিটার রাষিয়ায় এমনি ভাবে

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরগাছা আমদানী করিয়াছিলেন। সে 'পরধর্ম্মের' চাপে রাষিয়ার অন্তরাত্মা প্রায় মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ লেনিন ও ষ্টেলিনের নেতৃত্বে রাষিয়া আবার তাহার প্রাচ্য আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। তুরস্কের পক্ষেও কি এই 'পরধর্ম্ম' সত্যই একদিন ভয়াবহ হইয়া উঠিবে না?

এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। সে আশঙ্কা যে নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভরসা আছে, কামাল তেমন ভাবে জাতিকে চালাইবেন না। আজ তুরস্ক বিজয়ী—আজ সে স্ব-প্রতিষ্ঠ। Inferiority complex বা একটা দৈন্যের ভাব লইয়া আজ সে কোন কিছু গ্রহণ করিতেছে না। পিটার যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষিয়াতে প্রচলিত করেন,বা তুরস্ক যখন আরবী সভ্যতা সমাজে গ্রহণ করে, তখন ঐ দুই জাতির মনে কোন প্রকার জাতীয় সত্ত্বাবোধই ছিল না; কাজেই ঐ দুই জাতিই বিদেশী সভ্যতার নিকট একেবারে আত্মসমর্পন করিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শে একটা প্রবল ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে—তিন শতাব্দী পূর্ব্বের পাশ্চাত্য সভ্যতায় বা আরবী সভ্যতায় তাহা ছিল না। একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মসমর্পন করার পক্ষে ইহাও একটা বাধা। আরবী বা যে কোন মুসলমান বীর বা মহাপুরুষকে তুর্কীরা নিজেদের বলিয়া গৌরব বোধ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বীরদের সম্বন্ধে তেমন মনোভাবের আশঙ্কা নাই। বরং এখন

সার্ব্ব-তুরাণীয়বাদ ও দেশগত জাতীয়তাবাদের প্রভাবে তুর্কী নিজেদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতেছে। তাই মনে হয় তুরস্ক এবার আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে। অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, এঙ্গোরাতে বর্ত্তমানের উপযোগী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র রেল লাইন খুলিয়া যাতায়াতের সুবিধা করা হইতেছে, নূতন বন্দর ও ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ব্যবসা বানিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। একটা জাতিকে জাতীয়তার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যাহা কিছু দরকার, তাহা সবই করা হইতেছে। এশিয়ার পশ্চিমতম দেশ, ইউরোপ বিজয়ী তুরস্ক আবার পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিষয় নির্ঘণ্ট

ই

উ

এ

ও

ক

খ

চ

প্ফ

ভ